বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

চিত্রকর

চিত্রকর

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

অরুণা প্রকাশনী : ৭ যুগলকিশোর দাস লেন : কলকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৮৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ
আষাঢ় ১৩৮৭
তৃতীয় মুদ্রণ
ভাদ্র ১৩৮৮
প্রকাশিকা
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট
গ্রন্থকার-অংকিত স্কেচ অবলম্বনে
সত্যজিৎ রায়
মুদ্রক
জগন্নাথ পান
শান্তিনাথ প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৬
বাঁধিয়েছেন
ভারতী বাইণ্ডিং সেনটার
৬/১ রমানাথ কবিরাজ লেন
কলকাতা ১২

আঠার টাকা

উৎসর্গ

আমার সহধর্মিণী

শ্রীমতী লীলা মুখোপাধ্যায়-কে

লেখকের অন্য গ্রন্থ

চিত্রকথা

সূচিপত্র
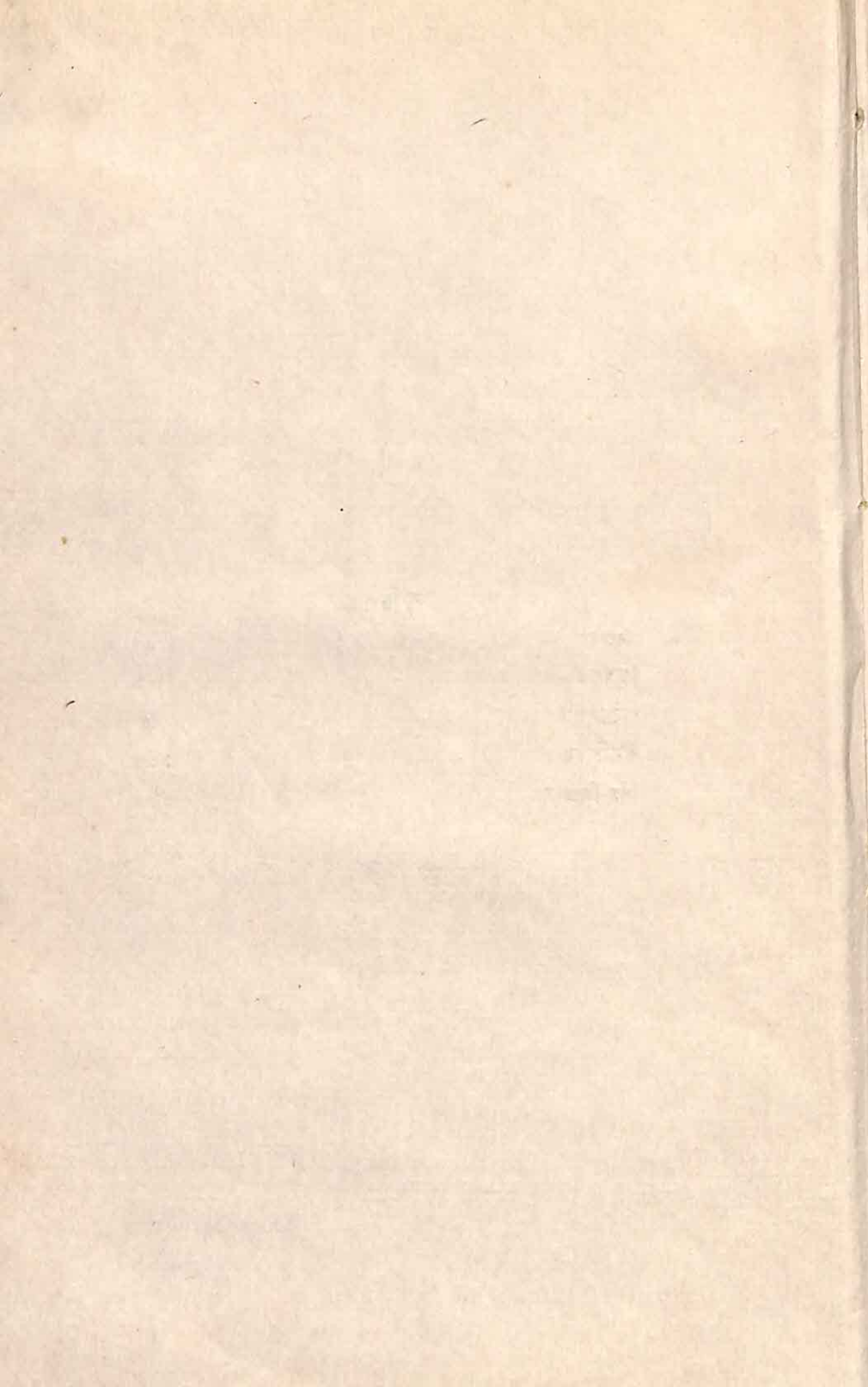
নিবেদন

মানুষ যতই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে ততই তার মনে পড়ে অতীতের কথা। অর্থাৎ স্মৃতির জগতে মানুষ খুঁজে বেড়ায় নিজেকে। আমিও সেইরকম নিজেকে খুঁজে বেড়াই। এইভাবেই দেখা দেয় বার্ধক্যের নিঃসঙ্গতা। বার্ধক্যের এই নিঃসঙ্গ অবস্থার মধ্যে জীবনের নূতন মূল্যবোধ জন্মায়। বৃদ্ধের জীবনের এই অভিজ্ঞতা যুবকের কাছে প্রায় সময়ই অর্থহীন। এরই নাম কালের ব্যবধান।

জন্মেছি ১৯০৪ সালে, আর আজ ১৯৭৯ সাল। এই দীর্ঘ জীবনে ঘটনা ঘটে গেছে অনেক। কিন্তু সেইসব ঘটনা খুব অল্পই জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। যে সমস্ত মানুষ বা যেসব ঘটনা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে তারাই হল আত্মকথার সত্যকার উপাদান। আর অবশিষ্ট কেবল তথ্যপঞ্জি। প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে আমার এই কাহিনী তথ্যপঞ্জি নয়। জীবনের যে অংশটুকু ভালোভাবে চিনেছি, সেই অংশের কথাই আমি বলতে বসেছি। বলতে দ্বিধা নেই যে চিত্রকর্ম করেই আমি জীবন কাটিয়েছি। সাহিত্যচর্চা শুরু করেছি অনেক পরে।

জীবনের অভিজ্ঞতা প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র। তবু কতকগুলো সাধারণ অভিজ্ঞতা থাকে, যার সাহায্যে একে অন্যকে বুঝি। দৈবক্রমে আমার জীবনে এমন একটি অভিজ্ঞতা ঘটেছে যার তুলনা সহজে পাওয়া যায় না।

আলোর জগৎ থেকে অন্ধকার জগতে প্রবেশ ক'রে আমার শিল্পীজীবনের এক নূতন অধ্যায় শুরু হয়েছে। আমার এই অভিজ্ঞতার কথা এই পুস্তকের প্রধান উপাদান।

'কত্তামশাই', 'শিল্প-জিজ্ঞাসা' ও 'চিত্রকর' রচনাগুলি যখন এক্ষণ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সে সময়ে ভাষার ত্রুটি-বিচ্যুতি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংশোধন ক'রে দিয়েছেন নির্মাল্য আচার্য মহাশয়। আজ যে এই রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে চলেছে সেজন্যও আমি তাঁর কাছে ঋণী। তিনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি

১ নভেম্বর ১৯৭৮

॥ রবীন্দ্রপুরস্কার (১৯৮১) ও ভারতীয় ভাষা পরিষদের

শ্রেষ্ঠ বাংলা গ্রন্থ (১৯৭৯-৮০) পুরস্কার প্রাপ্ত ॥
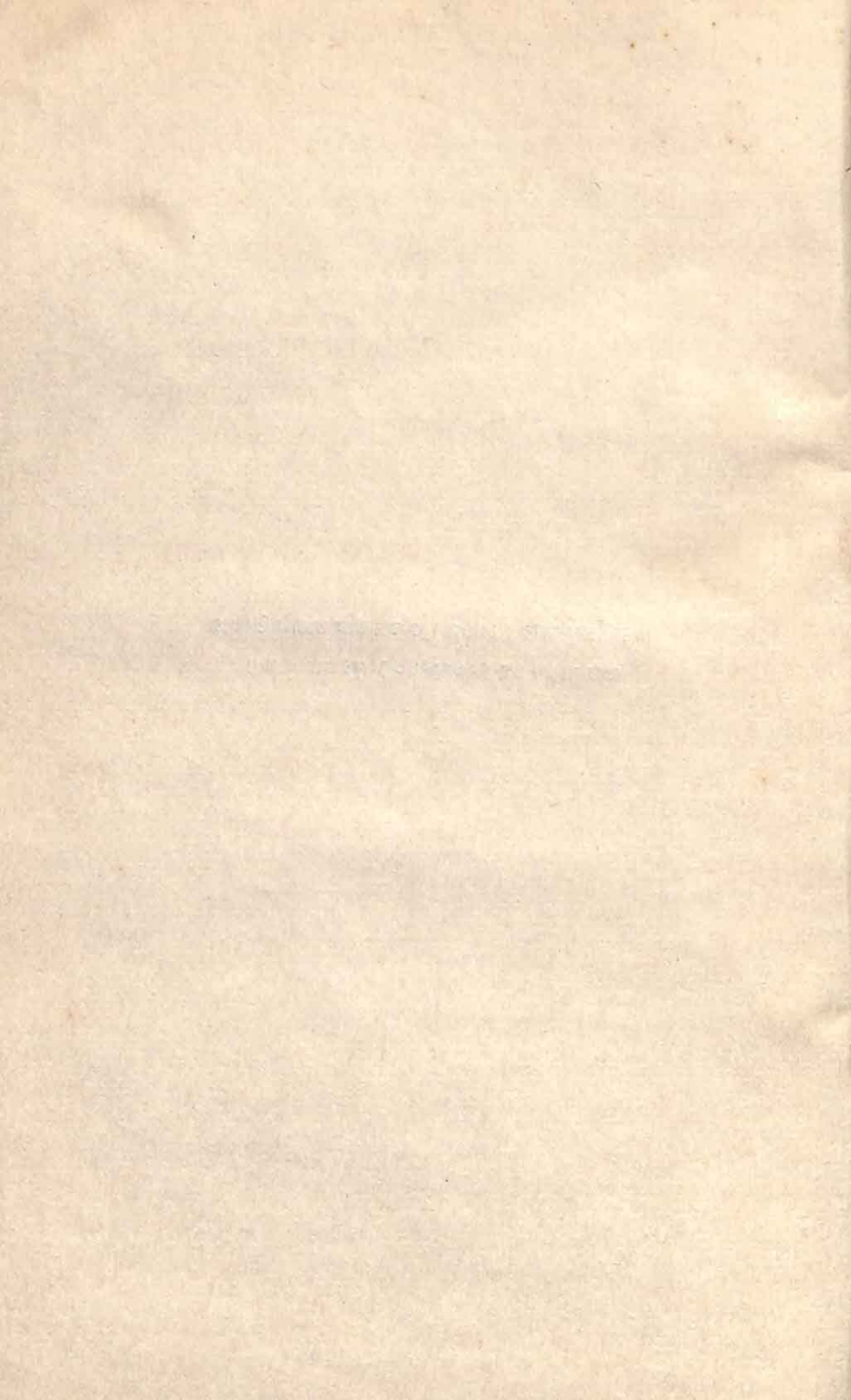
চিত্রকর

স্মৃতির ধূসর আলোতে নিজের শৈশবকে দেখছি। বেলা দুপুর, মস্ত একখানা সেকেলে পালঙ্কের ওপর শুয়ে আছি, মা পাশে বসে। তিনি প্রশ্ন করেন, 'ভাত খাবি ?' আমি বলি, 'হ্যাঁ, ভাত খাব।' ঘরের পাশেই রান্নাঘর, ঘুঁটের ধোঁয়ার গন্ধ নাকে পাচ্ছি। অল্পক্ষণ পরেই মা ঘরে এসে একখানা ছোট থালা এবং ছোট একটি মাটির ভাঁড় রেখে আমাকে তুলে নিয়ে সেই থালার সামনে বসালেন। মাটির ভাঁড় থেকে ভাত ঢাললেন থালাতে, বললেন, 'বোস্ আসছি।' মাগুর মাছের ঝোল নিয়ে মা যখন ঘরে ঢুকলেন, তখন আমার ভাত খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

মা বললেন, 'কি কাণ্ড! এরই মধ্যে সব ভাত খেয়ে ফেললি ? মাছের ঝোল খাবি কি দিয়ে ?' যাই হোক, মাগুর মাছের ঝোল, কাঁচকলা অবশিষ্ট ভাতের সঙ্গে মেখে তিনি আমার মুখে পুরে দিলেন এবং মুখ মুছিয়ে সন্তর্পণে আবার আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। বাইরে শুনছি মায়ের গলা, 'যাক্, যাবার আগে ছেলের ভাত খাওয়ার ইচ্ছে মিটিয়ে দিলাম।' আর একজনের গলা শোনা যাচ্ছে, 'ডাক্তার তো সকালে বলেই গেছে, ছেলে তো মরা-বাঁচার বাইরে, সাধ মিটিয়ে দেওয়াই ভাল।'

আজও মনে হয়, সেইদিন যেন আমি প্রথম মাকে জেনেছি। এর আগে মায়ের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ছিল, কিছুই আজ আমার মনে নেই।

বিকেলবেলায় বাবা বাড়ি ঢুকে সোজা আমার ঘরে এলেন। বিছানায় বসে নাড়ি দেখলেন, কপাল দেখলেন, পেটে টোকা দিলেন, বললেন, 'এখন তো ভালই দেখছি।' তারপর উঠে বাইরে যেতে যেতে বললেন, 'সকালে ডাক্তার ওরকম অকল্যাণকর কথা বলে গেলেন কেন ?'

কয়দিন পরে বাড়িতে মহা হুলস্থূল, বাবা জোরে জোরে বলে চলেছেন, 'মরণাপন্ন ছেলেকে ভাত খাইয়ে দিলে ? কিরকম আক্কেল তোমাদের ?' বাবা বাইরে বকাঝকা করছেন, মা নিঃশব্দে এসে আবার আমার বিছানার পাশে বসলেন, তাঁর মুখে কোনো কথা নেই। আসল কথা, আমার যে সাংঘাতিক অসুখ করেছিল এবং জীবনের আশা ছিল না, একথা অবশ্য আমি কিছু পরেই জেনেছি। এবং ভাত খেয়েই যে আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছি একথা বাবাও একসময় স্বীকার করলেন।

কলকাতার ছোট বাড়ি, ভিজে উঠোন, চৌবাচ্চা, সকালবেলা রক ধোয়া হয়েছে, তরিতরকারির ঝুড়ি, মাছের থলে, ভাঁড়ার ঘরের সামনে বঁটিতে তরকারি কোটা হচ্ছে। আমি তারই মধ্যে ঘোরাফেরা করি। কুসুম ঝি কেবলই বলে, 'ব্যামো থেকে উঠেছো, শুধু পায়ে ভিজে মাটিতে ঘুরে বেড়িও না, ঘরে যাও।' ভাঁড়ার ঘরে অনেক

হাঁড়ি-কলসি-জালা—সেখানে আমি সহজে ঢুকি না আরশোলার ভয়ে। চৌবাচ্চার কাছে যেতে ভয় কেঁচো-কেন্নোর। ছাতের ওপর দাদাদের পড়বার ঘর। আমার ডাক্তার দাদার ঘরের এখানে-সেখানে মানুষের হাড়, দেওয়ালে টাঙানো কেশব সেনের ছবি, জানলার ধারে বড় একখানা আয়না। এঘরে ঢুকতে আমার ভয় করে না। কিন্তু সন্ধেবেলা রাস্তার আলো জ্বললে বাইরে নারকেল গাছের পাতার ছায়া আয়নার ওপর যখন দুলতে থাকে তখন আর আমি সেঘরে দাঁড়াতে পারি না। দিনের বেলা একতলার কেঁচো-কেন্নো আর আরশোলা, আর সন্ধেবেলা ওপর তলায় নারকেল গাছের ছায়া—এইরকম ঘরে ও রকে ভয় জমাট হয়ে থাকত এবং আমার শৈশবের অনেকগুলো দিন জড়সড় ক'রে রেখেছিল।

আকাশে বিরাট ধূমকেতু উঠেছে। প্রত্যেক বাড়ির ছাতে ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-জোয়ান জমা হয়েছে ধূমকেতু দেখতে। ভয় এবং বিস্ময় মিলে কি প্রচণ্ড শক্তির সৃষ্টি হয় তার প্রথম পরিচয় আমি পেলাম আকাশে ধূমকেতু দেখে। বাবা, দাদা সকলেই জিজ্ঞাসা করেন, 'তোর কিসের ভয় ?' বলতে পারি নি কিসের ভয়, কিন্তু ধূমকেতুর দিক থেকে চোখও ফেরাতে পারি নি। ছেলেবয়সের আরো অনেক কথা মনে পড়ছে, কিন্তু কোনটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও কোনটা অপরের কাছে ধার করা, আজ তা অনুসন্ধান করা অসম্ভব!

ছেলেবয়সের বিশেষ একটি দিন আমার মনে পড়ে। দুপুরবেলা ওপরের ঘরে আমি একাগ্র মনে দাদাদের একখানি ইংরেজি খাতা থেকে নকল করছি। অক্ষরগুলো উঁচুনিচু, তাই সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু ছিল। T G J L অক্ষরগুলো কিরকম উঁচুনিচু হয়ে চলেছে আর তার নিচে গোল ইঞ্জিনের চাকার মতো হরফ এবং তারই ওপর এখানে সেখানে ফোঁটা। এই লেখা নিয়ে নিচে এসে মাকে দেখালাম। মা ভারি খুশি। স্কুল কলেজের পর দাদারা বাড়ি ফিরতেই মা উৎসাহ ক'রে আমার লেখা ভাইদের দেখালেন, বললেন, 'ছাখ, ঠিক তোদের মতো ইংরেজি লিখেছে।' গুরুজনেরা কিন্তু খুশি হলেন না। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মূর্খ, তাই এরকম ক'রে লিখেছে।' গুরুজনদের কথা ব্যর্থ হবার নয়, তাই তাঁরা যা বলেছিলেন তাই ঘটেছে। আমি ওই রকম উঁচুনিচু লাইন আর ফোঁটা সাজিয়েই ৭৩ বছর বয়স কাটালাম।

শৈশবের যে অংশ ঝাপসা আলোয় ঢাকা সেই অংশের আরো দু-চার কথা মনে পড়ে। আমাদের বাড়ির আর এক অংশে যাঁরা থাকতেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের

বাড়ির ছিল যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা। যেন এবাড়ি-ওবাড়ি মিলে একখানা বাড়ি। এই বাড়িতেই প্রথম আমি হারমোনিয়াম দেখলাম আর শুনলাম হরেনবাবুর ক্ল্যারিওনেট বাজনা। বিকেলবেলা আমি অনেক সময় বৈঠকখানার ঘরে তাঁর খাটের ওপর বসতাম আর একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম ক্ল্যারিওনেটের বাক্স খোলা হল। কালো রঙের টুকরো অংশ নিয়ে তৈরি হল বাঁশি, রুপালি ঝলমলে নানারকমের সাজ সেই বাঁশির গায়ে। তারপর শুরু হতো হরেনবাবুর বাঁশি বাজানো। ঘরের বাইরে অনেকখানি খোলা জমি। সেইখানে পাড়ার জোয়ান ছেলেরা মুগুর ঘোরাতো, ডন-বৈঠক করত। সেদিকে আমি কোনোদিন পা বাড়াই নি। আর হরেনবাবুকেও কোনোদিন সেদিকে যেতে দেখি নি। হরেনবাবুর খাটের তলায় একজোড়া চক-চকে বার্নিশ করা পাম-শু জুতো, জুতোর ওপরে চওড়া ফিতে বাঁধা, যেন ডানা মেলা প্রজাপতি। কালো জুতো, কালো বাঁশি, কালো চামড়ায় ঢাকা হরেনবাবু—কেবল বাঁশির বাক্সের ভেতরটা টকটকে লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা। এছাড়া সে ঘরে আর কোনো রং ছিল না। জুতোর দিকে বারে বারে আমার নজর পড়ত, ভারি ইচ্ছে হতো একবার তুলে দেখি, কিন্তু সাহস হতো না।

বাড়ি বদল হয়েছে, নতুন পাড়ায় এসেছি। নতুন বাড়িতে আসার আগে পর্যন্ত পরিবারের সকলকে আলাদা ক'রে দেখি নি বলেই মনে হয়। কেবল কর্মব্যস্ত কতকগুলি নরনারী—ঠিক আলাদা ক'রে কাউকে আমার মনে পড়ে না। জিনিসপত্র কি ছিল বাড়িতে তারও ঠিক ছাপ আমার মনে নেই। কিন্তু নতুন বাড়িতে এসে প্রত্যেকের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি সচেতন হলাম। রবিবার সকালে হুইল লাগানো ছিপ হাতে মাছ ধরার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে মেথি ভাজার গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে বড়দা বেরিয়ে যাচ্ছেন। আমি জানতাম ওই থলেতে আছে কেঁচো, বোলতার ডিম, ভাত, ভাজা মেথি, বড়শি, ফাত্‌না ইত্যাদি। বাবা অন্যদিন আপিসে যান। রবিবার ঘরে বসে তালপাখাতে রঙিন কাপড়ের ঝালর সেলাই করেন। মনে পড়ে ঘরের ভেতর, বারান্দায় দেওয়ালে ঝোলানো আলনা, তাতে কাপড় ঝুলছে নানা রঙের। ঘরের দেওয়ালে কাঁচ বাঁধানো ছবি, বাক্সপেটরা, টেবিল, গোটানো মাদুর দেওয়ালের কোণে দাঁড় করানো।

সকাল থেকে ফেরিওয়ালা ডেকে যায়। গলির উল্টোদিক থেকে আসে কাঁসি বাজাতে বাজাতে বাসনওয়ালা। কাঁসির শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই চুড়িওয়ালার হাঁক শোনা যায়, মেয়েরা চুড়িওয়ালার কাছ থেকে চুড়ি পরে। কত রঙের চুড়ি,
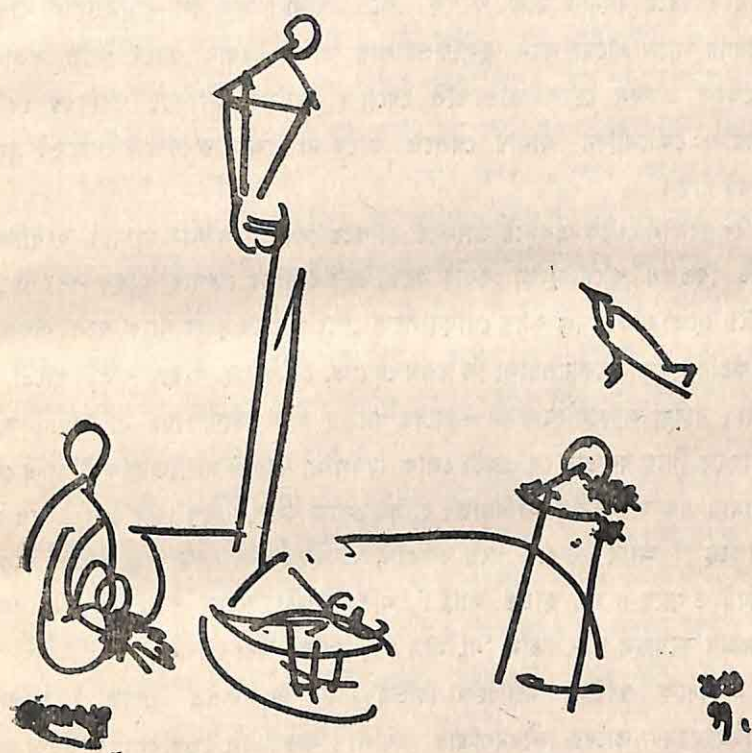
বেলোয়ারি চূড়ি—রেশমি চুড়ি। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে চুড়ির রং দেখি। নানা হাতে রঙিন চুড়ি ওঠে। দুপুর এইভাবেই আমার কাটে। তিনটে বাজে, নাপতেনি আসে মেয়েদের আলতা পরাতে। সেই সঙ্গেই শোনা যায় গলির মোড়ে ক্ষীরের লেডিকেনি। চারটে বেজে যায়, স্কুল-কলেজ-অফিস থেকে দাদা বাবা ভাইরা ফিরে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে ধোপানি। তার কাজ সকালে কাপড় নিয়ে গিয়ে বিকেলে সাবান দিয়ে বিনা-ইস্ত্রিতে কাপড় কেচে আনা। সন্ধেবেলা ঘুঘনিওয়ালা যায়। তারপর আসে গ্রীষ্মের দিনে কুলফিওয়ালার ডাক। দৈবাৎ চোখে পড়ে সকাল-বিকেলে একদল ছেলে ডাণ্ডাগুলি খেলে। আমিও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, তারাও কোনোদিন আমায় খেলতে ডাকে না। আমার দেখতে দেখতেই সময় কেটে যায়।

শৈশবকাল থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবার অভ্যাস আমার হয়েছিল। মুচি কিরকম ক'রে জুতো সেলাই করে, তার লোহার তেপায়া যন্ত্রের ওপর উপুড় ক'রে জুতো ঢুকিয়ে কি ক'রে গোড়ালিতে পেরেক মারে মুচির পাশে বসে একমনে দেখতাম। কোন ফেরিওয়ালা কি রকম দেখতে, সে কাপড় পরেছে কতটা খাটো, না লম্বা; বাবুরা অফিসে চলেছেন—তাঁদের গায়ের জামা ডোরাকাটা, না সাদা; আর বাড়িতে গিয়ে বলতাম যে একটা লোক দেখলাম, তার জামা ডোরাকাটা। এ যেন আমার এক অভাবনীয় আবিষ্কার! বাড়ির লোক বলল, 'দেখে আয় তো বাইরে কে ডাকছে?' আমি ভেতরে গিয়ে বলতাম, 'একটা লোক, সবুজ পাড় কাপড়, একটা কোট ও গায়ে চাদর, হাতে লাঠি।' অভিভাবকরা অধৈর্য হয়ে বলতেন, 'নাম জিজ্ঞেস করেছিস?' বলতাম, 'না, নাম তো জিজ্ঞেস করা হয় নি!'

একদিকে গুরুজন, অন্যদিকে বিচিত্র মানুষ ও বিচিত্র তাদের সাজসজ্জা। বিভিন্নরকমের তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী। কুসুম ঝি দুপুরবেলা দাওয়ায় বসে ঠোঙা তৈরি করে। তার কাছে আমি বসি, ঠোঙা তৈরি করি। কাগজ ভাঁজ করি, আঠা দিয়ে পরিষ্কার ক'রে জুড়তে পারি। কুসুম প্রশংসা ক'রে বলে, 'তোমার হাত খুব পরিষ্কার, ঠোঙা খুব সুন্দর হয়েছে।'

ক্রমে মেয়েদের চুড়ি পরা দেখবার আগ্রহ কমে গেল, আমার কাজ হল ঠোঙা তৈরি করা। কুসুম বলে, 'এই ঠোঙা বেচে যে পয়সা হবে তা দিয়ে তীর্থ করতে যাব, আর তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।' মনে নতুন উদ্বেগ দেখা দিল। বাড়ির জিনিসপত্র এলেই ছুটে দেখতে যাই যে ঠোঙা আমার হাতের তৈরি কিনা। প্রথম

যখন আমার ছবি একজিবিশনে টাঙানো হয়েছিল তখনো আমি একই রকম উৎসাহ নিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম আমার ছবি।

বিকেলবেলা দোতলার ছাতের উপর যাই, আলসেতে নানারকমের চুন-বালি চটে যাওয়া ফাটল ও গর্ত, ঘুলঘুলি দেখি। কারণ তখনো সমবয়সী সঙ্গী কাউকে পাই নি। মোটকথা শৈশবে ও বালকবয়সের অনেকগুলো দিন আমার কেটেছিল সঙ্গীহীন—না ছিল সঙ্গী, না ছিল খেলা।

অন্দরমহলেই আমার জীবন কাটছে। ইংরেজি বাংলা শেখা শুরু হয়েছে। বই পেলেই পড়বার চেষ্টা করি এবং বাড়ির সকলে বলেন, অত পড়তে হবে না। যে বয়সে অভিভাবকরা লেখাপড়ায় মন দেবার জন্য ছেলেদের শাসন করেন, ঠিক সেই বয়সে আমাকে পড়াশুনা করতে নিষেধ করার কারণ বুঝলাম অল্পদিনের মধ্যে। একদিন সকালে বাবা আমাকে নিয়ে মেডিক্যাল কলেজে গিয়েছিলেন চোখ দেখাতে। সেকালের বিখ্যাত চোখের ডাক্তার মেনার্ড সাহেব আমার চোখ দেখলেন অন্ধকার ঘরে নিয়ে। বেরিয়ে এসে বাবার হাতে একখানা কাগজ দিলেন। বাড়িতে এসে বাবা মতামত জানালেন। লেখাপড়া করলে ছেলের চোখ যেটুকু আছে, সেটুকুও থাকবে না। তবে স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি করতে পারলে কিছু লাভ হতে পারে, কিন্তু চোখের ডাক্তারের দ্বারা কিছু হবে না।

এবার চশমা করাবার পালা। চৌরঙ্গিতে 'ওয়াল্টার বুশনেল' তখন বিখ্যাত চশমার দোকান। বাবা সেইখানে আমাকে নিয়ে গেলেন চশমা করাতে। রুপোলি ফ্রেমে বাঁধা পুরু কাঁচের চশমা নাকের ওপর চড়িয়ে চৌরঙ্গির রাস্তায় নেমে বাবা আমাকে সাইন-বোর্ড দেখান, ফুটপাথের অপরদিকে ক'জন লোক চলেছে গুণতে বলেন, আর বলেন, 'তবে চশমা নিয়ে তুই ভালই দেখছিস?' আমি বলি, 'হ্যাঁ, ভালই দেখছি।'

ডাক্তার দেখানো হল, চশমা হল—এবার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নানা ব্যবস্থা শুরু হল। সে সময়ের বিখ্যাত কবিরাজের কাছ থেকে বাবা নিয়ে এলেন খাদ্যতালিকা। গুগ্‌লির ঝোল, মেটে, ছোট মাছ ইত্যাদি হল আমার নিত্য আহার্য, সর্বশরীরে তেল মাখা হল আমার নিত্য কর্তব্য এবং সুযোগমতো ভোরবেলা গড়ের মাঠে দাদার সঙ্গে যেতে হল লাল সূর্যোদয় দেখতে।

স্কুলে ভর্তি হতে হবে, তারই পরামর্শ চলেছে। স্কুলে ভর্তিও হয়েছিলাম। কিন্তু সে এতই অল্পদিনের জন্য যে কলকাতার স্কুল-জীবনের কোনো ছাপ আমার মনে ধরে

নি। তবে সংস্কৃত স্কুলের ড্রইং মাস্টার চুনীবাবু এবং মর্টন স্কুলের ড্রইং মাস্টারের কথা বলতে হয়—কারণ এঁরাই হলেন আমার আদি গুরু।

সংস্কৃত কলেজের স্কুল-বিভাগে ভর্তি হওয়ার প্রথম দিনই চুনীবাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। বেগুনি বালাপোশ গায়ে চুনীবাবু বসে থাকতেন, মুখে কোনো কথা নেই, বেশ ফর্সা চেহারা। কপালের দু'দিকের পেশি সব সময়ই উঁচু, মনে হয় যেন দাঁতে দাঁত দিয়ে তিনি কথা আগলাচ্ছেন। ছেলেরা স্কেল ফেলে লাইন দিচ্ছে, কম্পাস দিয়ে গোল করছে। যদি কোনো ছেলে গোলের ভিতরে ফুল করার চেষ্টা করত তাহলে তিনি উত্তেজিত হয়ে টেবিলের ওপর সশব্দে কয়েকটা চাপড় দিতেন ও দৃঢ়কণ্ঠে বলতেন, 'যা বলেছি তাই কর, আগে স্কেল কম্পাস চালাতে শেখ।'

সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে মর্টন স্কুলে এসে যে ড্রইং মাস্টারকে পেয়েছিলাম তিনি বেশ সদাশয় ব্যক্তি। চেয়ারে বসে প্রথমে তিনি বলতেন, 'দেখি তোমাদের পেন্সিল, প্রথমে পেন্সিল কাটতে শেখ।' তারপর পকেট থেকে ছুরি বের ক'রে পেন্সিল কাটা শেখাতেন তিনি। ভিনাস পেন্সিল এবং বিজ্ঞাপনে যেরকম ছবি থাকে, সেরকম নিখুঁতভাবে তিনি পেন্সিল কেটে দিতেন। পেন্সিল কাটা শেষ হতো আর ড্রইং ক্লাসের সময়ও পেরিয়ে যেত।

প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে কতকগুলো ছায়া ঘুরে বেড়ায়—মৃত্যুর ছায়া, রোগ-শোকের ছায়া, অপমান-লাঞ্ছনার ছায়া ইত্যাদি নানা ছায়া সদা সাথীর মতো সর্বদা আমাদের অনুসরণ করছে। আমি জন্মেছিলাম সামনে লম্বা অনিশ্চিতের ছায়া নিয়ে। এই ছায়ায় আমাদের পরিবারের সকলের মন আচ্ছন্ন হয়ে ছিল অনেকদিন পর্যন্ত। সকলেরই চিন্তা কি হবে এই ছেলের! মা বলেছিলেন, 'ও নিজের ভাত কাপড় ক'রে খাবে, তোদের কোনো চিন্তা নেই।' ডাক্তার বলছে ছেলে অন্ধ হয়ে যাবে, মোটা চশমা চোখেও ইস্কুলে যার স্থান হচ্ছে না তার কি হবে? 'করে খাবে'—এ হল মা'র মনের আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু এ ইচ্ছা যুক্তিতে টেকে কি ক'রে? আমিও ধীরে ধীরে চিন্তা করতে শুরু করেছি—কি হবে? স্কুলে যাওয়ার ইচ্ছে আছে কিন্তু স্কুলে স্থান হয় না। আমি স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা কোনোদিন দিই নি। এই থেকেই বুঝতে পারি, আমি কোনো স্কুলেই বেশিদিন

টিকি নি। এই অবস্থায় এক ঝলক আলো এসে পড়ল আমার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ওপর। এই আলোর সন্ধান পেয়েছিলাম আমার দাদা বিজনবিহারীর সাহায্যে।

হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রিটের সংযোগ-স্থলে ফুটপাটের ওপর রেলিং ঘেরা কেষ্টদাস পালের দাঁড়ানো মর্মরমূর্তি আজও বোধহয় অদৃশ্য হয় নি। এইখানেই প্রথম আমি চিত্রপ্রদর্শনী দেখি আমার দাদা বিজনবিহারীর পাশে দাঁড়িয়ে। বিকেলবেলা একজন ভদ্রলোক এই রেলিং-এর ওপর ফ্রেমে-বাঁধা ছোট ছোট অয়েল পেন্টিং সাজাতেন। সবই ছিল ভূ-দৃশ্য। দাম পাঁচ থেকে পঁচিশ টাকা। দাদা ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক ছবির সামনে গিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে দেখতেন এবং ভদ্রলোককে নানা প্রশ্ন করতেন। যতদূর মনে পড়ে অয়েল পেন্টিং কি ক'রে আঁকতে হয় সে কথাই তিনি আর্টিস্টকে জিজ্ঞাসা করতেন। মাঝে মাঝে ছবি বিক্রিও হতো। তারপর একসময় ছবি ও শিল্পী অদৃশ্য হলেন, পরিবর্তে রেলিং-এর ওপর দেখা দিল সস্-পেন্টিং। এগুলিও ছিল ভূ-দৃশ্য। তারপর একদিন সস্-পেন্টিং-এর পরিবর্তে রেলিং-এর ওপর দেখা দিল রঙিন ক্যালেণ্ডার। জরির সাজপরা রাধাকৃষ্ণ, ময়ূর ইত্যাদি। এই ক্যালেণ্ডারের যুগ আসার সঙ্গে সঙ্গে দাদার একজিবিশন দেখার শখও মিটল। ফুটপাথের ওপর তখন ইউ. রায়, কে. ভি. সেন ইত্যাদি প্রেসে ছাপা ছবি নিয়ে ফেরিওয়ালা বসে। দাম এক পয়সা, দু'পয়সা। ফুটপাথের ওপর দাদা উবু হয়ে বসে ছবি বাছাই করেন। অবনীন্দ্রনাথ, সুরেন গাঙ্গুলি, প্রিয়নাথ সিংহ, নন্দলাল ইত্যাদির ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর এই নিদর্শন। এছাড়া বিলিতি ছবি এবং দেশের বিখ্যাত লোকেদের প্রতিকৃতি পেলেও তিনি কিনতেন এবং বাড়িতে গিয়ে ছাপা ছবি থেকে নকল করতেন। অবশ্য তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল ওরিয়েন্টাল আর্ট। কখনো কখনো সহপাঠীরা থাকলে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। বলতেন, 'বিজন ওঠো।' তিনি বলতেন, 'তোমরা যাও, আমি এখানে একটু বসব।'

এই সময় আমার দাদা সংস্কৃত কলেজের স্কুল-বিভাগের ছাত্র। স্কুলে খেলাধুলো শেষ ক'রে অথবা চ্যারিটি ক্লাব-এর দায়িত্ব শেষ ক'রে তিনি এসে তাঁর অবসর বিনোদন করতেন এই কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে। আমি যদিও সংস্কৃত স্কুলের টেন্থ ক্লাস থেকে বিদায় নিয়েছি, কিন্তু ভাইদের সঙ্গে বিকেলবেলা স্কুলে যাওয়া বারণ ছিল না। এছাড়া তাঁর আর একটি আকর্ষণের স্থান ছিল বৌবাজার স্ট্রিটের ওপর পুরনো বাজার—যার নাম পরে হয়েছে চোরা বাজার। পুরনো বাজার আমাদের কাছে ছিল মস্ত যাদুঘরের মতো। সেখানে ছবি ও ছবির বইয়ের অভাব ছিল না।

বাজারে ঢুকেই পাওয়া যেত ছবির দোকান। দেওয়ালের প্রায় সবটাই ঢাকা ফ্রেমে বাঁধা অয়েল পেন্টিং। তারপর বাজারের ভেতর নানা জিনিস—কোট-পাতলুন, চামড়ার লেগিং, ছুরি-কাঁটা-প্লেট। এইসবের সঙ্গে সাজানো থাকত সোনার জলে বাঁধানো মোটা মোটা বই। আর পাওয়া যেত নানারকমের স্টেনসিল করা মহৎ বাণী : 'Lead me in Thy truth and teach me His will' ইত্যাদি।

এমনিভাবেই সন্ধ্যা কাটে প্রধানত কলেজ ষ্ট্রিটের মোড়ে, দৈবাৎ ঘোরা হয় পুরনো বাজারে। সেদিন আমরা বাড়ি ফিরছি, হঠাৎ দাদার নজরে পড়ল একখানা সাইন-বোর্ড—'আর্ট স্টুডিও, দোতলা'। দাদা ও আমি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠেই দেখলাম জমি মাদুর দিয়ে মোড়া একখানা ছোট ঘর, ভেতরে মাটিতে বসে ছিলেন আর্টিস্ট। মাদুর পাতানো ঘর দেখেই দাদা চমৎকৃত হয়ে বললেন, 'কি সুন্দর সাজানো।' ভেতরে দেওয়ালে কয়েকখানি নগ্ন নারীমূর্তি—কালিতে করা। একখানা ছিল অয়েল পেন্টিং, পূর্ণাঙ্গ নগ্ন নারী—আর্টিস্টের পেছনে দেখা যাচ্ছে। আর্টিস্ট কেবলই দাদাকে বলছেন, 'এসব ছবি আর্টের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আর্টের দৃষ্টিতে অশ্লীল কিছু নেই। নগ্নতাই হল শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য।' দাদা এসব জানতে চাইছেন না। তিনি জানতে চাইছেন কি ক'রে ইণ্ডিয়ান ইংক দিয়ে এই ছবিগুলি আঁকা হয়? এই আর্টিস্টের কাছেই প্রথম আমি ভবানীচরণ লাহার নাম শুনেছিলাম। আর্টিস্ট বলছিলেন, 'ভবানী লাহা বড়লোক, নিজের মাইনে করা মডেল আছে, তাই তিনি এত ভাল ছবি করতে পারেন। আমরা মডেল রাখতে পারি না, তাই আমাদের এত অসুবিধা।' মাসখানেক পরে যখন একদিন আর্টিস্টের স্টুডিওতে যাওয়া হল, দেখা গেল সেইখানে আর্টিস্ট নেই, সেখানে হয়েছে দর্জির দোকান।

আসল কথা, দাদার আর্টিস্ট হবার আন্তরিক ইচ্ছে ছিল। আর্ট স্কুলে তিনি তৎকালীন অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছিলেন। ভর্তিও হতে পারতেন। কিন্তু আর্টিস্ট হয়ে জীবিকা উপার্জন করা যাবে, এ কল্পনা তখন অনেকেই করতেন না। কাজেই ভাগ্যচক্রে দাদা হলেন শিবপুর কলেজের পাশ করা মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, আর আমি হলাম পেশাদার শিল্পী। যদিও দাদা ইঞ্জিনিয়ার হলেন, কিন্তু দাদার ছবি আঁকা বন্ধ হয় নি।

প্রায় সারা জীবনই তিনি কাটিয়েছিলেন ধানবাদ অঞ্চলের রেল কলোনিতে।

মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারের সচল ব্যস্ত জীবনের মধ্যে তাঁর ছবি আঁকা একদিনের জন্যেও বন্ধ হয় নি। বাগানের ফুল, বন্ধুদের প্রতিকৃতি, গল্‌ফ খেলা, কয়লাখনির ছোটবড় দৃশ্য—এইসব তিনি যেমন করতেন, তেমন তিনি বন্ধু-পত্নীদের অনুরোধে সেলাইয়ের ডিজাইন ছড়িয়ে গেছেন প্রায় কয়লাখনির সমস্ত পরিবারের মধ্যে। নববর্ষ খ্রীস্ট-উৎসব ইত্যাদি সময়ে বিজনবিহারী ছুটি পেতেন অফিস থেকে। ঘরে বসে তৈরি হতো ক্লাব সাজাবার নানা প্রকারের নক্‌শা। আহার নিদ্রা ভুলে দিবারাত্র তিনি এই কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আমি যখন উপার্জনক্ষম, তখনো আমার ভাই রং, তুলি, কাগজ, রবার, পেন্সিল আমাকে সরবরাহ করতেন। তিনি শিল্পীর মতোই জীবন কাটিয়েছেন, কিন্তু জগতে নাম রেখে যেতে পারেন নি। আমি আরো অনেককে জানি যাঁরা সারা জীবন শিল্প সংগীত ইত্যাদি নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন। এঁদের দেখেই আমার ধারণা হয়েছে যে সৃষ্টির উৎস মানুষের অন্তরের বস্তু। তার প্রচার বহু পরিমাণে নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। একজন অখ্যাত, অতি সাধারণ লোকের কথা শুনতে ভাল না লাগারই কথা। শিল্পের জগতে প্রবেশের মুহূর্তে আমার দাদার উৎসাহ ভুলে যেতেও আমি পারি নি। হাততালির উৎসাহ জীবনে কতটুকু শক্তি যোগায়, কিছুই নয়! কিন্তু ভালবাসা, যত্ন, আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে দেবার মতো বিশ্বাস—এই হল জীবনের পাথেয়।

এ পর্যন্ত আমার জীবনে বাইরের কোনো প্রভাব পড়ে নি। সেসময়ের বালক-যুবক-বৃদ্ধ কাউকেই আমি চিনি নি, কেবল চিনেছি আমার বাবা মা দাদা দিদি ও বৌদিদের। তাই পরিবারের প্রভাব আমার জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের পরিবারে জ্ঞানচর্চার সুযোগ ছিল যথেষ্ট, কিন্তু ভক্তির পথ অনুসরণ করার বিশেষ সুযোগ ছিল না, বাধাও ছিল না। সোজা কথায় আমাদের পরিবারে কেউই পিউরিটান ছিলেন না। তাই নীতি-বিদ্যালয়ের উপদেশ আমাকে শুনতে হয় নি। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমার বাবা-মার দুটি উপদেশ।

আদর্শ জিনসটা একরকমের সংক্রামক ব্যাধির মতো। শরীরে প্রবেশ ক'রে মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্থান ক'রে নেয়, তারপর তার প্রভাব চলতে থাকে সারা জীবন। আমার বাবা বিপিনবিহারী বলতেন, 'মানুষকে কখনো লাঞ্ছিত করবে না, কখনো বঞ্চিত করবে না।' তাঁর পুত্রদের সকলকেই এই একই কথা

বলেছিলেন। বোধহয় জীবনে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত ভালভাবেই হয়েছিলেন বলে তাঁর এই অভিজ্ঞতাটি ছেলেদের জানিয়েছিলেন। 'ঋণ নিয়ে শোধ দেবে। শোধ দিতে গিয়ে যদি অনাহারে থাকতে হয় তাও থাকবে।' যতদূর জানি ভাইদের মধ্যে কেউই কাউকে লাঞ্ছিত বা বঞ্চিত করেন নি এবং ঋণ নিয়ে কখনো ভুলেও যান নি। আমার মা অপর্ণা দেবী বলেছিলেন, 'মানুষকে বিশ্বাস ক'রে ঠকা ভাল, অবিশ্বাস ক'রে জেতার চাইতে।' আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে আমার মায়ের এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে আমি পারি নি, আবার ভুলেও যাই নি। তাঁর এই উপদেশের গভীর তাৎপর্য ক্রমে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। ভালভাবেই আমি লক্ষ করেছি যে নিজের দুর্বলতাই অবিশ্বাসের সর্বপ্রধান কারণ। মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে সন্দেহ জিনিসটা বেশ ক্ষতিকর। অবশ্য সন্দেহের দ্বারা সাংসারিক জীবনে কিছু লাভ হয়ত হয়, তবু মনে হয় মায়ের এই আদর্শ উপেক্ষণীয় নয়।

বাবা ছেলেবয়সে পয়সা দেখেছিলেন এবং তাঁর মন থেকে প্রথম জীবনের কথা কখনোই মুছে যায় নি। অপরদিকে আমার মা ছিলেন পণ্ডিতের কন্যা, সোজা কথায় সাধারণ ঘরের মেয়ে। আমাদের ভাইদের মধ্যে অনেকেরই কৌতূহল ছিল আমাদের পূর্বপুরুষরা কিরকম বড়লোক ছিলেন জানতে। মাকে অনেকবার এ প্রশ্ন করা হয়েছে, কিন্তু মা বলতেন, 'যা গেছে তা নিয়ে ভেবে আর কি লাভ, যা আছে তাইতে তোরা খুশি থাক, এই আমি চাই।'

ইতিমধ্যে আমার ডাক্তার দাদা বনবিহারী বদলি হয়ে চলে গিয়েছেন গোদাগাড়ির রেল-কলোনির ডাক্তার হয়ে। শুনলাম মা ও আমি যাব গোদাগাড়িতে দাদার কাছে থাকতে। কলকাতার বাইরে যাবার সুযোগ এই আমার প্রথম। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যই কলকাতার বাইরে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

খড়ের ছাউনিওয়ালা বেশ বড় বাংলোতে আমরা এসে উঠলাম। ভেতরে উঁচু পাঁচিল-ঘেরা উঠোন, বাঁদিকে একসারি ঘর, ডানদিকে আর একসারি খড়ের ঘর। এই ঘরগুলির মধ্যেই রান্না, ভাঁড়ার, গুদোম এবং চাকর থাকবার ব্যবস্থা ছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যায় মানকচুর ঝাড়।

ইতিপূর্বে খড়ের ঘরেও কখনো থাকি নি আর মানকচুর গাছও কখনো দেখি নি। মস্ত বাগান, একদিকটা কলাগাছের ঝাড়ে প্রায় অন্ধকার হয়ে আছে, আর বাকি

অংশ, আগাছায় ভরা, মাঝে মাঝে বিলিতি বেগুনের গাছ। আমাদের রাঁধুনি ও তার স্ত্রী বাড়িতেই থাকে। রাঁধুনির নাম মহাদেব। সমস্তিপুর আর গোদাগাড়ি ছাড়া আর কোথাও সে যায় নি। মায়ের সময় কাটে এদের সঙ্গে গল্প ক'রে ও রান্না ক'রে। বাড়ির পেছনে সামনে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে লম্বা হয়ে উঠেছে বড় বড় গাছ, যেন মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত সবুজের প্রাচীর। সকালে দাদা যান হাসপাতালে, মা যান রান্নাঘরের দিকে, আর আমি একা বাইরে ঘুরে ঘুরে দেখি গাছ। দূরে একটা ছাতিম গাছ, ছাতার মতন পাতা মেলে উঁচু হয়ে উঠেছে অনেকখানি। এই গাছের চারিদিকে ঘুরে বেড়াই। অন্যান্য গাছের সঙ্গে এর আকারপ্রকার পাতা কিছুই মেলে না. তাই এই গাছের প্রতি ছিল আমার বিশেষ আকর্ষণ।

যতদূর দেখা যায় সবই সবুজ। রৌদ্র যেমন বাড়তে থাকে, চারদিকের ঝোপ রৌদ্রের আভা লেগে হলদে হয়ে ওঠে, আর নাকে আসে তীব্র ছেঁচামূলোর গন্ধ। কতকগুলো ঝোপঝাড়ের গন্ধ এত তীব্র যে হাত দিলে হাত গন্ধ হয়ে যায়। ছাতিম গাছ পেরিয়ে হাঁটু পরিমাণ ঘাস ও দুর্গন্ধওয়ালা ঝোপের মধ্যে দিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই দেখা যায় বাবলা বন এবং বনের ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় ঘন পাতা-ওয়ালা আম গাছ, কাঁঠাল গাছ। সবই দেখি. কেবল মানুষ দেখতে পাই না।

অনেকবার আমি গোদাগাড়ির দৃশ্য আঁকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কখনো সফল হই নি। বালকবয়সের এই যে নির্জনতার অভিজ্ঞতা, বোধহয় কোথাও কোথাও আমার ছবিতে প্রকাশ পেয়েছে। দুপুরবেলা হাসপাতাল থেকে দাদা বাড়ি ফেরেন, স্নানাহার শেষ ক'রে তিনি খাটে বসেন, বলেন, 'নিয়ে এস W. W. Jacob-এর বই।' খুঁজতে দেরি হলে বানানও বলে দেন, কিন্তু নিজে ওঠেন না। তারপর খুঁজে পাই W. W. Jacob-এর বই। চকচকে মলাট, দাড়িওয়ালা টুপিপরা পাইপমুখে। কোনোটাতে থাকে জাহাজ আর নাবিকের ছবি। দাদা লম্বা হয়ে শুয়ে বই পড়েন ও মাঝে মাঝে হো হো ক'রে হেসে ওঠেন।

বিকেল হলে কয়েকখানা চেয়ার বাইরে রাখা হয়। লোকজনের আগমন কমই হয়। প্রায় প্রতিদিনই স্যানিটারি ইন্‌সপেক্টর আসে। আধা বাংলা, আধা হিন্দিতে তার কাজের কথা বলে যায়। চিকিৎসাসূত্রে একজন পুলিস অফিসারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। পায়ে লেগিং, ব্রিচেস, কোট, কোমরে পিস্তল। বিকেলবেলা পুলিস অফিসার, দাদা ও আমি, তিনজনে বসি। দু'জনের মধ্যে চুরি-

ডাকাতির গল্প হয়। তারপর একসময় সন্ধে হয়ে আসে। লণ্ঠন হাতে একজন লোক আসে। পুলিস ইন্‌সপেক্টর বিদায় নেন। দাদা আমাকে তখন পায়চারি করতে করতে তারা দেখান। চশমার ভেতর দিয়ে তারা দেখি—কালপুরুষ, গ্রেট বেয়ার ইত্যাদি। জনসমাগম দেখে দুটো দেশি কুকুর যাতায়াত করে বাড়িতে। প্রায় সময়ই বিনা নিমন্ত্রণে তারা আমাদের পায়ের কাছে বসে থাকে।

বাইরে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে, লণ্ঠন জ্বললে আমরা ভেতরে যাই। ভেতরে ঘরের মধ্যে গল্প শুরু হয়। প্রায় সময়ই মহাদেব এসে বসে। সে গল্প করে সমস্তি-পুরের। সমস্তিপুর যে মস্ত শহর সেইটাই সে নানাভাবে প্রকাশ করতে চায়। কলকাতার গল্প শুনলে প্রায়ই সে বিশ্বাস করতে চায় না, বলে সমস্তিপুরের চাইতে বড় শহর আর নেই।

দাদা আমাকে দাবা খেলা শেখাচ্ছেন। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দাবা খেলতে হয়। আমরা খেতে বসি বারান্দায়, আর লণ্ঠনের আলোয় চারিদিকের ব্যাঙ এসে জড়ো হয় পোকা খেতে। খাবার পর এক ঘরে দাদা আর আমি, অন্য ঘরে মা। বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ গল্প হয়। দিনে দাদা যেসব গল্প পড়েন, তার গল্প বলে যান। ঘুমের আবেশে শুনতে পাই, দাদা ও মা গল্প ক'রে চলেছেন।

জীবন ক্রমেই সচল হয়ে উঠছে। মহাদেবের সঙ্গে পোস্ট-অফিস যাই। টিনের ছাতওয়ালা ছোট পোস্ট-অফিস। এখানেও লোকজনের ভিড় বেশি নেই। চার-দিকের দৃশ্য একইরকম সবুজের আভা লাগা হলদে এবং সেই ছেঁচাগুলোর গন্ধ, পোস্ট-অফিস থেকে চিঠিপত্র নিয়ে বাজার হয়ে বাড়ি ফিরি। বাজারে বড় বড় চিতল মাছ, রুই, কাতলা—দু টাকা থেকে পাঁচ টাকার মধ্যে যে কোনো একটা মাছ কেনা যেতে পারে। কথায় বলে 'বাজারের ভিড়'—কিন্তু গোদাগাড়ির বাজার সম্বন্ধে একথা খাটে না। এত মাছ, এত তরিতরকারি কে যে কেনে! মহাদেবকে জিজ্ঞেস করি। মহাদেব বলে অনেক লোক আছে। বাজারে আমি বেশি ভিড় কোনোদিন দেখি নি। হাসপাতালে যাই বেড়াতে। খড়ের ঘরে ডাক্তার বসেন, পাশে ছেঁচা বেড়া দেওয়া কমপাউণ্ডারের ঘর, টেবিল, শিশি-বোতল। হাসপাতালে রেখে যাদের চিকিৎসা করা হবে তাদের জন্য আর একখানা লম্বা খড়ের ঘর।

গোদাগাড়িতে মানুষ বেশি দেখি নি, কিন্তু সাপ দেখেছিলাম অনেক। গোখ্‌রো, চন্দ্রবোড়া, ঘুবিতে, বোড়া ইত্যাদি নানা সাপ। তবে গোখ্‌রো সাপই ছিল

সর্বপ্রধান আর গোখ্‌রো সাপের সাক্ষাৎ পেতেও অসুবিধে হতো না। রান্নাঘরে উনুনের কাছে ঘুঁটের গাদায়, সিঁড়ির ওপর, যে কোনো সময় গোখ্‌রো সাপের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। আমাদের শোবার ঘরের কোনো গর্তের মধ্যে একদিন একটা গোখ্‌রো সাপ ঢুকেছিল। মহাদেব গেল ছুটে হাসপাতালে সাপ মারার লোক ডাকতে। সাপ মারায় সিদ্ধহস্ত হরিহর এল, এক হাতে নির্জলা ফেনাইলের বোতল আর এক হাতে লাঠি। নির্জলা ফেনাইল ঢালা হচ্ছে গর্তে আর হরিহর বলছে, 'কই সাপ তো বেরোচ্ছে না, সাপ বোধহয় নেই,' বলে হরিহর আর একবার ফেনাইল ঢালতে যাবে, এমন সময় লাঠির মতো সোজা হয়ে বিছানার দিকে ছিটকে বেরিয়ে এল গোখ্‌রো সাপ, যেন উড়ন্ত সাপ! চক্ষের নিমেষে হরিহর সেই উড়ন্ত সাপকেই লাঠির এক ঘা দিল। সাপের কোমর সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে, কিন্তু মরে নি। তারপর সাপ মারতে আর বেশি সময় লাগে নি। যেমন মোটা তেমনই লম্বা। হরিহর বলল, 'খোলস ছাড়া সাপ কিনা, তাই এত তেজ।'

একদিন দুপুরে অনেকগুলো লোক বেশ বড় আকারের এক মরা কুমির ডাক্তারের বাড়ির সামনে এনে ফেলল। রেললাইনের ধারে কুমিরটাকে পাওয়া গিয়েছিল। সম্ভবত দুর্ভাগা কুমির দুপুরে জল থেকে উঠেছিল রোদ পোহাতে। ক্রমে নড়া-চড়া করতে করতে এসে পৌঁছেছে রেললাইনের ধারে। আশেপাশের লোক ছুটোছুটি ক'রে কোথা থেকে একটি লোহার ডাণ্ডা নিয়ে এসে হাঁ করা কুমিরের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কুমির যতই স ামনের দিকে এগিয়ে আসে ততই লোহার ডাণ্ডা ঢুকে যায় পেটের মধ্যে। সেই সঙ্গে লোহার ডাণ্ডা ও লাঠি পিঠে মেরে কুমিরকে শেষ করতে বিলম্ব হয় নি। কিছু বক্‌শিশ পাবার আশায় কুমিরকে টেনে আনা হয় ডাক্তারের বাড়ির সামনে। কুমির দেখে আমার ডাক্তার দাদার ইচ্ছে হল কুমিরের চামড়া দিয়ে একটা ব্যাগ তৈরি করা। তারপর দড়ি বাঁধা কুমিরকে টানতে টানতে সকলে নিয়ে গেল হাসপাতালের দিকে। পাঞ্জাবি পরতে পরতে দাদাও চললেন তাদের সঙ্গে। বিকেলবেলা দাদা লোকজন সমেত ফিরলেন কুমিরের চামড়া নিয়ে। চামড়া উল্‌টে ফেলে সমস্ত চামড়ার ওপর প্রচুর পারমাণে নুন ছড়ানো হল। ঠিক হল সকাল থেকে আম চামড়া পাহারা দেব। রোজ নুন ছিটিয়ে, রোদ্দুরে শুকিয়ে ট্যানিং করা হবে। দিনে দিনে পচা চামড়ার দুর্গন্ধে বাড়িতে টেকা যায় না। কুকুরের কামড়ে চামড়ার ধারগুলো প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আমি আমার কর্তব্যপালন করছি।

নুন ছেটাই, চামড়া টেনে টেনে এক জায়গার থেকে আর এক জায়গায় রোদ্দুরে নিয়ে যাই। এইভাবে আধ শুকনো কুকুরের দংশনে ক্ষতবিক্ষত কুমিরের চামড়ার প্রায় অবশিষ্ট কিছুই রইল না, পিঠের অংশটা ছাড়া। ট্যানিং পর্ব শেষ হল।

ক্রমে ক্রমে গোদাগাড়ির জীবন অভ্যস্ত হয়ে আসছে। বাইরে বেরিয়ে মা আর বলেন না যে এ কোন জঙ্গলে এলাম। ইতিমধ্যে মা মহাদেবের স্ত্রীর কাছে ঘাস দিয়ে ঝুড়ি, কৌটো ইত্যাদি বুনতে শিখেছেন এবং দুপুরটা তাঁর মহাদেবের বউয়ের সঙ্গে বসে বসে গল্প ক'রে আর ঝুড়ি বুনে ভালই কাটে। এই অবস্থায় দাদা একদিন হাসপাতাল থেকে ফিরে বললেন, 'আমাদের বনবাস শেষ হয়েছে, বদলির খবর এসেছে।'

জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হল। ফিরে এলাম কলকাতার শানবাঁধানো শহরে। বাড়িতে জিনিসপত্র নামানো হল, আর সেই সঙ্গে নামানো হল স্পিরিট ভরা বড় একটা কাঁচের জার, ভেতরে মুঠো পরিমাণ চওড়া দুটো গোখ্‌রো সাপের মাথা। জারের ওপর লেবেল দেওয়া, ওপরে লেখা : 'গোদাগাড়ির স্মৃতি'।

গোদাগাড়ির পরেই আমার বালককালের অভিজ্ঞতা পাকৃশি শহরকে কেন্দ্র ক'রে। দাদা তখন পাকৃশি শহরে রেলের ডাক্তার। গোদাগাড়ির মতো পাকৃশি শহর পাণ্ডব-বর্জিত দেশ নয়। এই শহরের বিশেষ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নির্মাণের কাল থেকে, যে ব্রিজের নাম পরে হয়েছে 'সারা ব্রিজ'। সারা ব্রিজ ও রেল স্টেশনের থেকে মাইল খানেকের মধ্যে দোতলা বাড়ি, ওপরে ডাক্তারের কোয়ার্টার, নিচে হাসপাতাল। সামনে বাগান, সবুজ লন, লনে কয়েক-জন মালি জল দিচ্ছে, আগাছা তুলছে। লনের মাঝখানে মস্ত স্থলপদ্মের গাছ—কি তার শোভা! কুঁড়ি খুলে বেরিয়ে আসে ধবধবে সাদা ফুল, ক্রমে গোলাপি থেকে লাল হয়ে পোড়া লোহার মতো রং হয়, তারপর ঝরে যায় সবুজ ঘাসের ওপর। স্থলপদ্মের গাছ সারাজীবন দেখেছি, কিন্তু এত বড় গাছ পরে কখনো আর আমি দেখি নি।

বাড়ির মধ্যে মানুষের অভাব নেই। বাবা, মা, বৌদি, দিদি, দাদা-দিদির ছেলেমেয়ে। কলকাতা থেকেও ভাইরা আসেন। বাড়ির মধ্যে আনন্দের হাসির রোল ওঠে, তার সঙ্গে মিশে থাকে বাচ্চাদের চিৎকার, হাসিকান্না। একতলায় ডাক্তারের

ঘর, ডাক্তারের ঘরের অন্যদিকে আর একখানা ঘরের মধ্যে পর্বতপ্রমাণ জমা করা আছে কাঠের splint, ব্রিজ তৈরির সময় এইসব ডাক্তারি সরঞ্জামের প্রয়োজন হতো প্রতিদিনই। আজ সেগুলোর ওপর ধুলো জমছে। দৈবাৎ এক-আধখানা বের হয়, কিন্তু কাজে লাগে না। সাহেবের মাপে তৈরি হাত-পায়ের মাপের সঙ্গে পাবনা জেলার মানুষদের হাত-পায়ের মাপের পার্থক্য অনেক।

আমরা ছয় ভাই একই বাড়িতে থেকে, একই সঙ্গে মানুষ হয়েছি—কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক এক ভাই স্বতন্ত্র হয়ে আমার সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। যেমন কেষ্টদাস পালের স্ট্যাচুর সামনে চিনেছিলাম বিজনদাদাকে, গোদাগাড়িতে পেয়েছিলাম ডাক্তারদাদাকে, পাক্‌শিতে এসে পেলাম আমারই ওপরের ভাই বিমানকে।

সকালবেলা বিমানের সঙ্গে আমি বেরিয়ে যাই অ্যাডভেঞ্চার করতে। পদ্মার ধারেই পাকশি শহর। ওপারে সারা ঘাট। দৃষ্টিশক্তি যাঁদের ভাল তাঁরা রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের কুঠিবাড়িও দেখতে পান। পদ্মার ধার দিয়ে আমরা হেঁটে যাই বহুদূর। একদিকে বাগানওয়ালা বাড়ি। বিকেলবেলা জেলেনৌকো পাড় ঘেঁষে চলে. পাড়ের ওপর মাছ কিনবার জন্য লোক দাঁড়িয়ে যায়, মাঝে মাঝে দু-একজন মেমসাহেবও দেখা যায়। তারপর নদী বেঁকে গেছে, হাট বাজারের দিকে। ফিরে আসি আমরা আবার নদীর ধারে ধারে নানারকমের পাখিদের আওয়াজ শুনতে শুনতে।

আর একদিন সকালে চলি আমরা বিখ্যাত পাবনা রোড লক্ষ্য করে। দীর্ঘ পাবনা রোড। একদিকে ঘন বাবলা বন। বাবলা বন হল আমাদের প্রধান আকর্ষণের স্থান। গোদাগাড়িতে দেখেছি ছাতিম গাছ। এখানে বাবলা বনের ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল লম্বা শিমুল গাছ। একদিন বাবলা-শিমুল মেশানো বনের মধ্যে অনেকখানি আমরা চলে গিয়েছি, অকস্মাৎ বিমান থমকে দাঁড়ালো, বলল, 'ওই দ্যাখ্, কত হাড়। এত হাড় এখানে এলো কি ক'রে?' তারপরই তার চোখে পড়ল কয়েকটা শকুন। ওপর দিকে তাকিয়ে বিমান বললে, 'গাছেও অনেকগুলো শকুন।' তারপরেই বিমান আমাকে বলল, 'ফিরে চল।' বেরিয়ে এসে বলল, 'আর একটু হলেই শকুন আমাকে তাড়া করত।' আমি হাড়গুলো দেখেছিলাম, কিন্তু শকুন আমার চোখে পড়ে নি।

ইতিমধ্যে গুলেল ছুঁড়বার উপযুক্ত একটা ধনুক তৈরি হল। মাটির গুলি তৈরি
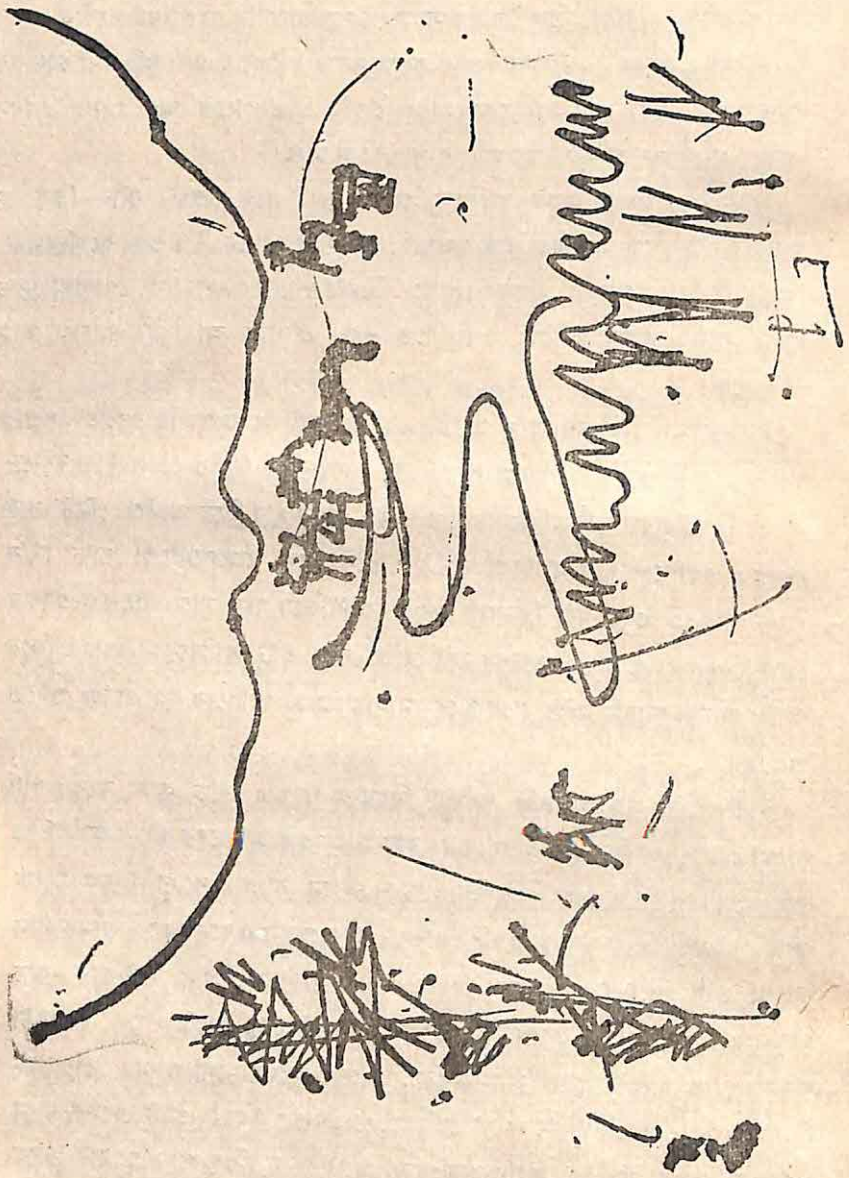
হল ও শুকানো হল। বেহারি ঠেলাওয়ালাদের একজন মাটির গুলি পুড়িয়ে দিল। শুরু হয় শিকারের তোড়জোড়। এতদিন ছিল উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ, এখন ঘুরেবেড়ানো হয় পাখি মারার উদ্দেশ্যে। এবার, পাখি মারার উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ফিরে আবার আমরা যাই পাবনা রোডের ওপর সেই বাবলা বনে। গুলি ছোঁড়া হয়, কিন্তু পাখি মরে না।

সেদিন বিকেলে অনেকদূর পর্যন্ত পাবনা রোড়ের ওপর বেড়িয়ে ফিরে আসছি বাড়ির দিকে। ফেরবার পথে একটা ছোট গ্রাম পার হতে হয়। গ্রাম ঘিরে বাঁশ-ঝাড়। চট ক'রে বিমান ধনুক তুলে নিয়ে গুলি ছুঁড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'পাখিটার লেগেছে।' দৌড়ে গেলাম, ছোট্ট একটা সবুজ নরুনচোরা পাখি। রক্তাক্ত দেহে পাখি পড়ে আছে মাটির ওপর। ল্যাজের অংশ এবং মাথার অংশটা ছাড়া সবটাই রক্তপিণ্ড। প্রথম লক্ষ্যভেদ। এতদিন বিমান আকাশে গাছে যেখানে পেরেছে গুলি ছুঁড়েছে, আর ব্যর্থতা নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। আজ তার প্রথম লক্ষ্যভেদ, কিন্তু মনে তার আনন্দ নেই। বেশ কিছুক্ষণ পাখিটার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, 'এত ছোট পাখি, আর আমি পাখি মারব না।' যত্নে তৈরি পোড়ামাটির গুলি রাস্তায় ফেলে দিয়ে ধনুক হাতে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। ধনুকখানার কি হল তা আমি জানি না, তবে পরের দিন থেকে শুরু হল আমাদের পুনরায় নিরুদ্দেশ ভ্রমণ।

সেদিন সারা সকাল বৃষ্টি হয়ে দুপুরের দিকে বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে। আমরা বেরিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে চলেছি। বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়, হঠাৎ বিমান আমার হাতখানা চেপে ধরে বললে, 'দ্যাখ, কতবড় সাপ।' ঘাসের ওপর ফিতের মতো একটা বস্তু। সেই কালো ফিতেটার শেষও দেখা যাচ্ছে না, শুরুও দেখা যাচ্ছে না। বিমান আমাকে সেইখানে দাঁড়াতে বলে নিজে এগিয়ে গিয়ে আকাশ ফাটা চিৎকার করে বলে উঠল, 'সাপ নয় রে, মাছ।' সারি সারি, কৈ মাছ, পাশের জলা জমি থেকে কানকো মারতে মারতে এগিয়ে চলেছে একটা গাছের দিকে। ইতিমধ্যে গাছের গুঁড়ি ধরে কতকগুলো কৈ মাছ ডালপালার উপর উঠেছে এবং মাঝে মাঝে মাটিতে পড়েও যাচ্ছে। ঢালু জমি থেকে বৃষ্টির জল গড়িয়ে চলেছে, সেই জলের উল্টোদিকে কৈ মাছরা অভিযান চালিয়েছে। অপূর্ব সে দৃশ্য। হয়ত নয়-দশ বছর বয়স হবে, কিন্তু সেই অপূর্ব দৃশ্য এখনো মনে আছে এবং অনেককে এই গল্পও করেছি। বিমান বলল, 'এতগুলো মাছ ছেড়ে দিয়ে যাওয়া তো চলবে না!' সে চট ক'রে পাঞ্জাবিটা

খুলে, তাই দিয়ে একটা থলে ক'রে ফেলল। তারপর থলেতে মাছ ভরার পালা। বেশ বড়সড় মাছের পুঁটলি নিয়ে আমরা বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

বাড়িতে পৌঁছে বিমান হাঁক দিয়ে বলল, 'দেখে যাও কত বড় সাপ।' বলার সঙ্গে সঙ্গেই মাছগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বাইরে বারান্দার ওপর। 'কোথায় সাপ' বলতে বলতে ঘর থেকে বাচ্চা-কাচ্চা সমেত সকলে বেরিয়ে এসেছে। বাচ্চারা এতগুলো কৈ মাছের কিলবিল ক'রে চলা দেখে চিৎকার ক'রে উঠল, ভয়ে না আনন্দে, তা অবশ্য তখন আমি বুঝি নি।

এক বৈকালের এই ঘটনা আমার মনে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। কোনো মহৎ কীর্তি নয়। তবু জীবনের অমূল্য সঞ্চয়, কারণ ছেলেবেলা জীবন্ত হয়ে থাকে এই সব স্মৃতিকে আশ্রয় ক'রে।

হাসপাতালের অনতিদূরে অতিকায় এক অশত্থ গাছ। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, আর দোতলার বারান্দায় বসে আমরা শুনি হুতুম পেঁচার হুম্ হুম্ ডাক। ডাক্তার দাদার লোকবল যথেষ্ট। লোক দিয়ে একদিন হুতুম পেঁচা ধরা হল। হুতুম পেঁচা দিনের আলোয় কেন দেখতে পারে না, দাদা সেটা বুঝিয়ে দেবেন। পেঁচাকে এনে প্রথমেই সিঁড়ির নিচের চোখ দেখবার অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। চোখ দেখবার অন্ধকার ঘরে ঢুকতেই ভেতর থেকে আওয়াজ হল হুম্ হুম্। হুতুম পেঁচার ভয় ভেঙেছে বলে যখন মনে হল তখন তাকে বের ক'রে আনা হল বাইরে দিনের আলোতে। সিমেন্ট করা মেঝের ওপর ডানা বাঁধা হুতুম পেঁচা মূর্তির মতো স্থির হয়ে আছে। কাঠের সিঁড়ি, ছাত থেকে ঝোলানো ইলেকট্রিক বাতির ঝাড়, পাস্তুর ফিলটার, ঘড়ি—এরই মাঝখানে বড় বড় হলদে চোখওয়ালা হুতুম পেঁচা। অভাবনীয় এক অভিজ্ঞতা! কেবল আমি নই, বড়রাও খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, পেঁচাকে এইরকম এক পরিবেশের মধ্যে দেখে। এখন মনে হয় মানুষের মধ্যে হুতুম পেঁচা দেখেছিলাম, যেন একখানা স্যুররিয়েলিস্ট ছবি!

বালকবয়সের অত্যন্ত তুচ্ছ সব ঘটনা, কিন্তু সেগুলোকে কোনো মানুষই তাচ্ছিল্য করতে পারে না। জীবনপ্রভাতের নির্মল আলোর মতোই এইসব স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে থাকে মানুষের মনে। যাঁদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এইসব ছোটখাটো স্মৃতি তাঁদের সকলেই সংসার ত্যাগ করেছেন, কিন্তু তাঁদের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্থলপদ্মের গাছ, কৈ মাছের ঝাঁক, আর হুতুম পেঁচা।

ইতিমধ্যে বিমান দিদিকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেছে। আমি একা হয়েও একা

নই। কারণ বিমান আমার দৈহিক স্থবিরত্বকে ভালভাবে সচল ক'রে দিয়ে গেছে। নানা জায়গায় ঘুরি ফিরি, রেলের লাইব্রেরিতে যাই, হাটবাজারে যাই। পাবনা রোডে বা নদীর ধারে একা বেড়াতেও ভয় হয় না।

ঝোড়ো হাওয়ায় যেমন বন্ধ দরজা খুলে যায়, খোলা দরজা বন্ধ হয়, তেমনি জীবনের ঝোড়ো হাওয়া এসে আমার গৃহপালিত জীবনের দরজা বন্ধ ক'রে হঠাৎ রাজপথে চলবার দরজা খুলে দিল আমার সামনে।

সকালবেলা বাগানে ঘোরাফেরা করছি, হঠাৎ দাদা রোগী দেখার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, 'দাঁড়াও, তোমাকে একটা কথা বলি। বড় হয়েছ, একটা দায়িত্ব নিতে হবে।' এই দু'টি কথায় আমার জীবনের মোড় ফিরে গেল। 'প্রবোধ মারা গেছে। শৈলী (আমার দিদি) বিধবা হল। বাবা-মাকে একথা আমি বলি নি। বলেছি শৈলীর অসুখ। তুমি তাদের সঙ্গে যাবে। কিন্তু এই কথা তাদের বলবে না। বাবা-মা তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেও বলবে না। বাড়ি পৌঁছাবার একটু আগে কেবল বলবে। পারবে কথা চাপতে?' বললাম, 'হ্যাঁ। কিন্তু বাবা যদি জিজ্ঞাসা করেন?' 'ওই যে বললাম কিছুই বলবে না? কেবল বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছালে বলবে।'

সন্ধ্যার সময় দার্জিলিং মেলে রওনা হলাম। ট্রেন চলতে চলতে মা জিজ্ঞেস করেন বাবাকে, 'শৈলীর কি হল? ছেলে কিছু বলল?' বাবা বলেন, 'না। কিছু তো স্পষ্ট ক'রে বলল না।' মা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোকে কিছু বলেছে?' আমি বলি, 'না।' বুকের মধ্যে দুর দুর করে, বাবা-মার সামনে এত বড় মিথ্যে কথা বললাম! আবার মনে পড়ে, বড় হয়েছি, দায়িত্ব পালন করতে হবে।

পরের দিন সকালবেলা শেয়ালদা স্টেশনে নেবে বাড়ির দিকে চলেছি। আমি যেন আমার দায়িত্ব আর রক্ষা করতে পারছি না। বাড়ি কখন পৌঁছাব, কখন কথাটা বলে হাঁপ ছাড়ব, তাই ভাবছি। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছাতে আমি বললাম, 'মেজদা তোমাদের একটা কথা বলতে বলেছে। বাঁড়ুজ্জে মশায় মারা গেছেন।' জ্যান্ত মানুষ যে পাথর হয়ে যেতে পারে তা এই প্রথম জানলাম। প্রথমে বাবা কথা কইলেন, 'আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি। বিধবা বিয়ে দিয়ে সমাজচ্যুত হয়েছি।' আবার বললেন, 'পিতার কর্তব্য আমি পালন করেছি।' মা বললেন, 'যার কপাল ফাটা তার আমি কি করব?' তারপরেই হাতের দুটো আঙুল ঠোঁটের ওপর চেপে বসে রইলেন। কথা নেই, চোখে জল নেই, দু'জনেই গাড়ি থেকে

নামলেন নীরবে। সিঁড়ির ওপর বড়দা দাঁড়িয়েছিলেন। ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন, শৈলী ওই ঘরে। কাল থেকে কিছু খায় নি। দরজা বন্ধ, গারদওয়ালা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দিদি বসে আছে, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে, পা ছড়িয়ে, কোলের ওপর মুঠো করা দুখানা হাত। আর একখানি পাথরের মূর্তি। অন্য ঘরে এসে বাবা মাকে বললেন, 'একবার ওর কাছে গিয়ে বসো।' এবার মা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমি পারব না, তুমি যাও।'

ঘরে-বাইরে ঘুরে ঘুরে বারো বছর পেরিয়ে গেছে। ঘরে বসে যথেচ্ছ বই পড়ি, ছবিও আঁকি। দেখি সকলেই স্কুল যায় কেবল আমিই যাই না। এ দুঃখ আর মনে দাগ কাটে না। অস্বাভাবিক শৈশব ও বাল্যকাল স্বাভাবিক হয়ে এসেছে যখন, সেই সময় শুনলাম, আমাকে বোলপুরে 'রবিবাবুর' স্কুলে ভর্তি করা হবে। এই সময় ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপক কালীমোহন ঘোষের সঙ্গে আমার দাদার পরিচয় হয় এবং কালীমোহনবাবুর সাহায্যেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি হবার ব্যবস্থা হল।

একদিন খাকি হাফ প্যান্ট ও খাকি হাফ শার্ট বাক্সে বন্ধ ক'রে বিমানের সঙ্গে রওনা হলাম বোলপুরে। গাব গাছের তলায় টিনের ছাতওয়ালা অতিথিশালা, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্ররা অতিথিদের সেবা করে অক্লান্তভাবে। পরের দিন সকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হল না, দেখা হল বৈকালে। শাল-বীথিকার মধ্যে দিয়ে কালীমোহনবাবু আমাদের সঙ্গে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথের বাসস্থান দেহলীর সামনে। কালীমোহনবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রবীন্দ্রনাথকে কখনো দেখেছো?' 'আজ্ঞে না।' 'তাঁর ফটো দেখেছো?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' 'তাঁকে দেখলে চিনতে পারবে?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' 'সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাও। ওপরে তাঁর ঘর। উঠে তাঁকে প্রণাম করবে এবং তিনি যা জিজ্ঞাসা করেন জবাব দেবে।'

সিঁড়ির তলায় জুতো খুলে ওপরে উঠে গেলাম। দোতলায় উঠে রবীন্দ্রনাথের ঘর, দরজা খোলা—ভেতরে গিয়ে প্রণাম করলাম। ঘর অত্যন্ত ছোট। টেবিল-চেয়ারের ফাঁক দিয়ে তাঁর পা পর্যন্ত পৌঁছাল না। প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়ালাম। রবীন্দ্রনাথ স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর চোখ নাবিয়ে পা পর্যন্ত একবার দেখলেন, আবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। প্রশ্ন করলেন, 'ভাল ডাক্তার দিয়ে চোখ দেখানো হয়েছে?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ। মেনার্ড

সাহেব চোখ দেখেছেন।' রবীন্দ্রনাথ: 'এখানে সব কাজ নিজে করতে হয়, ঘর ঝাঁট দেওয়া, কাপড় কাচা, নিজের থালা ধোয়া ইত্যাদি, পারবে?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ, পারব।' 'আমার লেখা পড়েছো?' বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' তারপর বাংলা, ইংরেজি কি কি বই পড়েছি বললাম। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য' ইত্যাদি। 'মেঘনাদবধ কাব্য' পড়েছি শুনে তিনি একটু বিস্মিত হলেন। তারপর তিনি বললেন, 'তোমার সঙ্গে যিনি এসেছেন, তাঁকে ওপরে পাঠিয়ে দাও।' নিচে এসে কালীমোহনবাবুকে খবর দিলাম, তিনি ওপরে উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে নিচে নেমে আমার পিঠে হাত দিয়ে হেসে বললেন, 'যাক গুরুদেব তোমায় ভর্তি হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।' সঙ্গে আমার দাদা ছিলেন, তাঁকেও তিনি বললেন, 'গুরুদেব খুব খুশি হয়েই অনুমতি দিলেন।'

নাট্যঘরে আমার স্থান হল। জগদানন্দবাবু তখন গৃহশিক্ষক। সে সময় কতকগুলি আবশ্যিক নিয়ম আমার জন্য শিথিল করা হয়েছিল। খেলার মাঠে আমি খেলতে পারি না জেনে বৈকালে খেলার পরিবর্তে আমাকে বেড়াবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আরো অনেক ছোটখাটো কাজে আমি যথেষ্ট স্বাধীনতা পেলাম। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে aptitude test-এর ব্যবস্থা না থাকলেও ছাত্রদের রুচি মেজাজ অধ্যাপকরা জেনে নিতে পারতেন সহজেই। কে গান করতে পারে, কার অভিনয়ের ক্ষমতা আছে, কে লিখতে পারে, এসব কয়েকদিনের মধ্যেই গুরুদেব এবং গৃহশিক্ষক জেনে নিতেন। জানা গেল, আমি আর কিছু পারি না বটে তবে ছবি আঁকতে পারি। জগদানন্দবাবু তখন 'পোকা মাকড়' বই লিখছেন, তাঁর বইয়ের জন্য কেঁচো-কেন্নোর ছবি এঁকেছিলাম। যদিও কেঁচো-কেন্নোতে আমার খুবই ভয় ছিল, তৎসত্ত্বেও জগদানন্দবাবুর ভয়ে কাজগুলো যথাসাধ্য যত্ন করেই করলাম, কালি-কলম দিয়ে। আমার ছবি সমেত বই ছাপা হল। ভূমিকায় জগদানন্দবাবু আমার নাম উল্লেখ করলেন। গুরুদেবের কাছে আমার কৃতিত্বের কথা জগদানন্দবাবু পৌঁছে দিয়েছিলেন। ক্লাসেও আমার সম্মান বাড়ল এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রায় সকলের কাছেই আমি রাতারাতি আর্টিস্ট হিসাবে পরিচিত হয়ে গেলাম।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পুরনো কাঠামো নতুন ক'রে গড়বার সূচনা যখন, সেই মুহূর্তে আমি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দিয়েছিলাম। কলা, সংগীত এবং গবেষণা—এই

তিনের সংযোগে বিশ্বভারতীর কল্পনা রবীন্দ্রনাথের মনে জেগেছিল। আনুষ্ঠানিক-ভাবে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই কলাভবনের সূচনা হয়। সকালে ক্লাসে চলেছি যথারীতি বই-আসন নিয়ে, এমন সময় ধীরেনকৃষ্ণের সঙ্গে শালতলায় আমার সাক্ষাৎ। ধীরেনকৃষ্ণ আমাকে বললেন, 'গুরুদেব কলাভবন খুলেছেন, আমরা যারা ছবি আঁকতে চাই, সেখানে যেতে পারি। আমি চলে গেছি, তুমিও চল।' আমার চেয়ে তাঁর উৎসাহ বেশি। তিনি তখনই আমাকে নিয়ে গেলেন তৎকালীন অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রীর কাছে। ক্লাসের বইখাতা ও আসন তখনো আমার হাতে। 'কলাভবন' বলে নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে, এ খবর শাস্ত্রীমশাই জানতেন না। যাই হোক বাড়ি থেকে অনুমতিপত্র আনিয়ে দেব, এই প্রতিশ্রুতিতে কলাভবনে যোগ দেবার অনুমতি পেলাম। এরপর ধীরেনকৃষ্ণই আমাকে নিয়ে গেলেন জগদানন্দবাবুর কাছে। জগদানন্দবাবু শুনে অবাক, 'কলাভবন, সে আবার কবে হল ?' সব শুনে জগদানন্দবাবু অনুমতি দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রাবাস থেকে বাক্স-বিছানা দুজনে ধরাধরি ক'রে শমীন্দ্র-কুটিরের ছোট ঘরে আমরা উপস্থিত হলাম। ধীরেনকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি ও আমি এ ঘরেই থাকব।' শমীন্দ্র-কুটির তখনো তৈরি হচ্ছে। চারদিকে ভারা বাঁধা এবং চুনবালি, ইট ইত্যাদি ছড়ানো। পাশের ঘরে থাকেন অর্ধেন্দুপ্রসাদ, হীরাচাঁদ ও কৃষ্ণকিংকর এবং সকলেই আমার চাইতে বয়সে বেশ বড়। কলকাতার আর্ট-স্কুলে অসিতবাবুর কাছে তাঁরা শিখছিলেন এবং অসিতকুমারের কথামতোই তাঁরা শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।

দ্বারিকের দোতলায় তখন কলাভবন, নিচে সংগীতভবন। একখানা মাদুর, সামনে নড়বড়ে জলচৌকি এবং ডানপাশে জলের গামলা। এরই মধ্যে অন্যের মতন আমিও স্থান পেলাম। বেশ কিছুদিন নন্দলাল আমাকে সুনজরে দেখেন নি। তাঁর মনে হয়েছিল, গুরুদেব জোর ক'রে এমন একজনকে তাঁর ঘাড়ে চাপালেন যে শিল্পজগতে প্রবেশের অনধিকারী। যার চোখ নেই, সে ছবি আঁকবে কি ক'রে ?

একদিন সকালে গুরুদেব কলাভবনে এসেছেন, নন্দবাবু তাঁকে আমার কথা এবং এবিষয়ে তাঁর আপত্তি জানালেন। গুরুদেব বললেন, 'নন্দলাল, ও কি নিজের কাজ করে ?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ, মনোযোগী ছাত্র। কিন্তু এই লাইনে···।' কথা থামিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'যদি ও নিয়মিত আসনে বসে এবং মনোযোগ দিয়ে কাজ করে তবে ওকে স্থানচ্যুত কোরো না। ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা কোরো না। সকলকে নিজের নিজের পথ খুঁজে নিতে দাও।'

নন্দলাল আমাকে মাদুর, ডেস্ক, জলের পাত্র ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করেন নি, কিন্তু আশেপাশের সবাইকে তিনি দেখাতেন, কেবল আমাকে ছাড়া। দিন যায়, ছবি আঁকি, স্কেচ করি, বন্ধুদের দেখাই। আর্টস্কুলে পড়া, অর্ধেন্দুপ্রসাদ ও হীরাচাঁদ বলেন, 'বিনোদ, তোমার কোনো ভাবনা নেই ভাই, আমরা তোমার ছবি ষ্টিপলিং দিয়ে ফিনিশ ক'রে দেব।' বন্ধুদের তুলনায় আনপড়, কাজেই যেমন ইচ্ছা আমি কাজ করি।

দুপুরবেলা আমরা প্রায় সকলেই ছবি দেখি। এই সময়ে আমি একদিন একটি কাঠের বাক্স থেকে একটি ছবি পেলাম। বাক্সের ওপর লেখা W. W. Pierson—Rock and Water, শিল্পীর নাম সেরায়ু। যে কোনো কারণেই হোক ছবিটি আমার খুব ভাল লাগল ও ছবিটি প্রায়ই আমি দেখতাম। এইভাবে দেখতে দেখতে আমার একটি লম্বা ছবি করার ইচ্ছে হল এবং এক বিঘত চওড়া, চার-পাঁচ বিঘত লম্বা কাগজে ছবি করলাম। শালগাছের সারি সারি গুঁড়ি, গুঁড়ি বেয়ে কতকগুলো কাঠবেড়ালি উঠছে নামছে, এবং জমিতে দৌড়াচ্ছে। ছবি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় একদিন আমার সতীর্থরা একবাক্যে বললেন, 'ছবি composition-এ খুব ভুল হয়েছে, ছবিটি কেটে ফেল।' তারপর আমার অনুমোদনক্রমে ছবিটিকে তাঁরা তিনটুকরো ক'রে কেটে দিলেন। আমারও মনে হল এবার ছবিটি বেশ ভাল হয়েছে। অদৃষ্টের পরিহাস, পরদিন সকালে সাদা কাগজ নিয়ে আমি যখন নতুন ছবি করবার কথা ভাবছি, এমন সময় নন্দবাবু এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার সেই লম্বা ছবিটা কোথায় গেল?' আমি সসম্ভ্রমে বোর্ডের তলা থেকে টুকরো-করা ছবি বের ক'রে টেবিলের ওপর রাখলাম। 'ছবি কাটলে কেন?' বললাম, 'composition ভুল হয়েছে।' 'কে বললে তোমায় composition ভুল হয়েছে?' কণ্ঠস্বর কঠিন। আসল কথা তাঁকে আমায় বলতে হল। ছবির টুকরোগুলো তুলে নিয়ে আমার পরামর্শদাতাদের অন্য ঘরে নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরে এসে তিনটুকরো ছবি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এরপর থেকে ছবি আমাকে দেখাবে, অন্যের পরামর্শে চলবে না।' পরে জানলাম ছবি যে composition-এ ভুল হয় নি, সেকথাই তিনি সতীর্থদের ভাল ক'রে বুঝিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে এলেন রমেন্দ্রনাথ, অসিতকুমারের ছাত্র। তারপর বোম্বাই থেকে এসেছেন বিনায়ক মাসোজি। দীর্ঘকায় সুগঠিত দেহ, বোম্বাই

প্রদেশের সেরা স্পোর্টসম্যান, পোল জাম্পে অদ্বিতীয়। অন্ধ্রদেশ থেকে এলেন বীরভদ্র রাও চিত্রা—বেঁটে-খাটো, রবারের বলের মতো সর্বদাই লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন। ঢাকা থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ধাক্কায় এসে পৌঁছালেন মণীন্দ্র-ভূষণ গুপ্ত। আর এলেন বাঁকুড়া থেকে সত্যেন্দ্রনাথ। আকারেপ্রকারে এবং শিল্পচেতনায় সকলেই ভিন্ন এবং সকলেই নিজের নিজের পথ ক'রে চলবার চেষ্টা করছিলেন তখন। ধীরেনকৃষ্ণ আসেন ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবি, হাতে এসরাজ, wash-এর কাজ করেন, কাগজ ভিজিয়ে বোর্ডের ওপর রেখে কিছুক্ষণ এসরাজ বাজান, গান করেন। আর একদিকে অর্ধেন্দুপ্রসাদ—চোখে পাঁশনে, পাঁশনের ফিতে রোজই বদলান, খুব ঝাঁঝালো scent ব্যবহার করেন। ক্রাম্‌রিশ তাঁকে বলতেন, 'a young man, with strong scent'। সত্যেন্দ্রনাথ কাজ করতেন গার্হস্থ্যজীবন, গ্রাম্যজীবন নিয়ে, মাঝে মাঝে পৌরাণিক ছবিও করেন। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালই তাঁর আদর্শ। রমেন্দ্রনাথ ছবি আঁকেন আর হকুসাই-এর (জাপানি শিল্পী) ছবি দেখেন, তাঁর জীবনী পড়েন। একদিন তিনি কাঠ-খোদায়ের কাজ করতে শুরু করেন। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত গম্ভীর লোক, সর্বদাই কাজে ব্যস্ত, স্লেট খোদাই করেন, ছবি আঁকেন, বিশ্বভারতীর সাহিত্যবিভাগে ফরাসি শেখেন, চীনে ভাষা শেখবারও চেষ্টা করেন।

জীবনযাত্রার মধ্যেও পার্থক্য অনেকখানি। একদল স্কেচ করেন, আর একদল স্কেচ করার জন্য বেশি বাইরে যান না। আর্থিক অবস্থা সকলের সমান নয়। যাঁদের কিছু অর্থকৃচ্ছ্রতা আছে তাঁরা নিজেরা রান্না করেন, বাজার করেন, চাল-ডাল কিনতে বোলপুরে যান। খোলামাঠের মাঝখানে যেমন নানারকমের গাছ বেড়ে ওঠে, তেমনি করেই আমরা বেড়ে উঠেছিলাম। পাঠক্রমরূপ কাঁচি দিয়ে নন্দলাল গাছের ডালপালা কেটে, সব গাছকে এক ঢঙে সাজিয়ে তোলবার চেষ্টা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন সভা করতে। ওপর তলায় তখনকার প্রায় সব সভাই হতো। গান, কবিতা নতুন রচনা করলেই তার প্রথম রিহার্সাল বা পাঠ এই ঘরেই হতো এবং এই দ্বারিকেই প্রথমে রবীন্দ্রনাথ নিজের আঁকা ছবি নিয়ে আসেন নন্দলালকে দেখাতে। বিশ্বভারতীর সংসদের মিটিং এখানেই শুরু হয়। শুনতাম প্রশান্ত মহলানবিশ এবং তপন চাটুজ্জের আইন-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে তর্ক। কেউই থামতে প্রস্তুত নন, কাজেই তর্ক চলত। সভা ভাঙত কিন্তু তর্ক শেষ হতো না। ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে এ তর্ক শুনতে বেশ ভালই লাগত।

আমরা ভালই আছি। বিশ্বভারতীর কনস্টিটিউশনের ফাঁস আমাদের গলায় পড়ে নি, কাজেই নিজেদের জীবন নিজেদের মতো করেই চালাই। ইতিমধ্যে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন, ধীরেনকৃষ্ণ তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর একটা ছবি কিনেছেন। নন্দলাল ধীরেনকৃষ্ণকে তাঁর উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করেছেন। অসিতকুমার বলেন, 'ধীরেন, তুমি নন্দলালের বিত্থে মারতে পারলে।' কলাভবনের তরুণ শিল্পীদের মধ্যে নতুনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেকথা অর্ধেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 'রূপম' পত্রিকায় স্বীকার করলেন। অর্ধেন্দুপ্রসাদ, হীরাচাঁদ, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির ছবি ছাপা হল। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রিয়দর্শিকা' পুস্তিকায় জানালেন যে প্রদর্শনীতে খোলা 'আলো-বাতাসের পরিবেশ' সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে এইসব তরুণ শিল্পীরা। এই আলোচনার মধ্যেই সর্বপ্রথম আমার ছবি 'শীতের সকালে'র উল্লেখ ছিল এবং প্রবাসী পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথের 'ত্রয়ী' ছবির সঙ্গে আমার 'শীতের সকাল' নামে ছবি প্রকাশিত হল। দ্বিতীয়বার ছাপার অক্ষরে নিজের নাম পড়লাম। বলা বাহুল্য, ছাপার অক্ষরে নিজের নাম পড়তে ভালই লেগেছে।

এ পর্যন্ত প্রথম যুগের শিল্পীদের অন্যতম প্রভাতমোহনের কথা বলা হয় নি। তিনি কিঞ্চিৎ কবিখ্যাতি নিয়ে কলাভবনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর ছবির বাক্সে, স্কেচ-খাতার ওপর, সর্বত্র তাঁর নামের লেবেল লাগানো থাকত। তাঁর এই ছেলে-মানুষী দেখে আমরা বেশ হাসি-তামাশা করতাম। কিন্তু দেখলাম অল্পবয়সে ছাপার অক্ষরে নিজে নাম দেখতে এবং দেখাতে বেশ ভালই লাগে।

আমি রোমন্টিক ছবি অথবা পৌরাণিক ছবি কোনোটাই তখন পর্যন্ত করতে পারি নি। আশপাশের দৃশ্য, সাঁওতাল জীবন—এই ছিল আমার ছবির বিষয়। এই সময়ের ছবির মধ্যে একটি মাত্র চবি আমি করেছিলাম যা আমার সমস্ত শিল্পীজীবনের ব্যতিক্রম বলা চলে। ছবির বিষয় ছিল এইরকম: অবনীন্দ্রনাথের 'সাজাহানের মৃত্যু' ছবির অনুকরণে করেছিলাম 'থামওয়ালা বারান্দা'। রাজপুত্র বসে আছেন সিংহাসনে, মোগল ধাঁচের পোশাক ও পাগড়ি, পাশে পারস্য রমণী সারেঙ্গি জাতীয় যন্ত্র বাজাচ্ছেন, দু'জনের মাঝখানে একখানা টেবিল, তার ওপরে ফল ও সুরাপাত্র ইত্যাদি। নন্দলাল এবং কলাভবনের গানবাজনা জানা ছাত্রেরা কলকাতায় গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের মঞ্চসজ্জা করতে। নন্দলাল ফিরে এসে আমার ছবি দেখে প্রশংসা করলেন। প্রশংসা সত্ত্বেও এরকম ছবি করার

চেষ্টা জীবনে আমি আর করি নি। ছবিটি বিক্রি হল। এই প্রথম ছবি বিক্রি ক'রে হাতে কিছু টাকা পেলাম। আমরা একসঙ্গে থেকেও যে শিল্পের ক্ষেত্রে ভিন্ন, সেটি দ্বারিক-এর কলাভবনে অল্পবিস্তর অনুভব করেছিলাম।

এ পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথকে আমি দেখি নি। নন্দলাল আমাকে বললেন: 'একবার তোমার ছবি নিয়ে অবনীবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে এসো।' চারখানা ছবি নিয়ে কলকাতা রওনা হলাম। কলকাতায় পৌঁছে পরের দিন সকালে উপস্থিত হলাম জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ দোতলায় যে বারান্দায় কাজ করতেন, সে বারান্দার অনেক গল্পই শুনেছিলাম। অবনীন্দ্রনাথ বসে আছেন দুই ভাইয়ের মাঝখানে। চেয়ারের ওপর বসে আছেন,—এক পা ঝোলানো, অন্য পা কোলের ওপর তোলা। কোলের ওপর বোর্ড নিয়ে কাজ করছেন। প্রথম ছবি হাতে নিয়ে বললেন, 'এটা কি হয়েছে?' বললাম, 'বাঁশি বাজাচ্ছে।' 'বাঁশি বাজাচ্ছে, না কলা খাচ্ছে?' দ্বিতীয় ছবি ছিল ধনুক হাতে ব্যাধ, চারদিকে গাছ, গাছের ওপর জোনাকি জ্বলছে। অবনীন্দ্রনাথ ছবিটি একটু দেখলেন, দেখে বললেন, 'রাখো। এইবার একজিবিশনে আমিও একটা ব্যাধের ছবি দেব। দেখি কার ভাল হয়।' বাকি দু'খানা ছবি সম্বন্ধে কিছু না বলে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'নোংরা রং আমি দেখব না। তোমার ছবি দেখলে আমার ছবি খারাপ হয়ে যাবে। যাও দাদাকে দেখাও।' গগনেন্দ্রনাথ ছবি চারখানা একসঙ্গে নিলেন, প্রথমেই তিনি বাঁশি বাজানো ছবি তুলে নিলেন। গাছের ওপর ডালে বসে সাঁওতাল ছেলে বাঁশি বাজাচ্ছে। বললেন, 'বাঁশি বাজাতে জান?' 'আজ্ঞে না।' 'বাঁশিতে একবার ফুঁ দিয়ে দেখ, তাহলেই তোমার ভুল বুঝতে পারবে। তোমার ছবির রং একটু নোংরা। সব ছবিরই রং এক রকম। ছাখো আমার ছবি, কাগজ কত পরিষ্কার। এইরকম পরিষ্কার ক'রে কাজ করবার চেষ্টা করবে। ছবিগুলো বেশ যত্ন ক'রে করেছো?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' এইবার অবনীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য ক'রে গগনেন্দ্রনাথ বললেন, 'অবন, সবাই যদি ঠিক তোমার মতো ছবি করে তাহলে নতুন ছবি হবে কবে? তুমি যখন নতুন ছবি করেছিলে, তখন তো লোকে ভাল বলে নি? এ যত্ন করেই করেছে। যা নিজের ভাল লেগেছে, তাই সে এঁকেছে। কারুর দেখে করে নি, তা তো তুমি বুঝতে পেরেছো?' তারপর আমার হাতে ছবিগুলো তুলে দিয়ে বললেন, 'তোমার ছবি বেশ নতুন রকমের, কিন্তু কাগজ এত নোংরা কোরো না। যাও, উনি যা বলেন,

তাই করো।' আবার এসে দাঁড়ালাম অবনীন্দ্রনাথের সামনে। অবনীন্দ্রনাথ: 'ওরে বাবা! দাদা তোমার ছবি পাশ ক'রে দিয়েছেন, আমি আর কিছু বলব না, ছবি একজিবিশনে দিয়ে দাও।' বেরিয়ে আসার সময় সমরেন্দ্রনাথ আমাকে দাঁড় করিয়ে ছবিগুলো দেখলেন, বললেন, 'বেশ তো সুন্দর ছবি!'

কলকাতায় একজিবিশনে এসেছি, দুপুরের পর অবনীন্দ্রনাথ একজিবিশন-ঘরের চেয়ারে বসে আছেন। অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম করার চেষ্টা করার আগেই বললেন, 'যাও গ্যাখ, আমিও ব্যাধ করেছি, তোমার ছবির পাশেই রেখেছি। গ্যাখ, কার ভাল হয়েছে!' খুঁজে পেলাম অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ব্যাধের ছবি। গলায় দড়ি বাঁধা একটা হরিণবাচ্চাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে একজন লোক। ক্রূর তার মুখের ভাব। ছবিতে আর কিছুই বোধহয় ছিল না। হালকা এলা মাটির রং। তার পাশেই আমার শ্যাওলা রঙের ব্যাধের ছবি। সেদিন এক ঝলকে যা বুঝেছিলাম সে বিষয়ে লম্বা বক্তৃতা দিয়ে আমাকে কেউ বোঝাতে পারত না।

শিল্পসৃষ্টির প্রথম আনন্দ পেয়েছিলাম এই দ্বারিক গৃহে, তাই দ্বারিকের দোতলার জীবনকথা শেষ হয়েও শেষ হতো না, যদি না দ্বারিক গৃহ ছাড়তে আমরা বাধ্য হতাম। খবর এসেছে আমাদের নবনির্মিত শমীন্দ্রকুটিরে যেতে হবে। জিনিসপত্র নিয়ে যথাকালে অধিকার করলাম শমীন্দ্রকুটির।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে শিল্পীর নিজস্ব উপলব্ধি অর্থাৎ যেটি তার মূল প্রেরণা, সেটি সে প্রথম জীবনেই পেয়ে যায়। যা সে লাভ করে তার শ্রীবৃদ্ধি অবশ্য অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার পথে হয়ে থাকে। যখন আমরা দ্বারিক ছাড়লাম তখন আমাদের মনেও একরকমের স্থায়ীভাব দেখা দিয়েছে। পৌরাণিক চিত্র যে আমার ধাতে নেই তা আমি বেশ ভাল ক'রে বুঝেছিলাম এবং সেকথা বন্ধু-বান্ধবদের বলতেও কখনো দ্বিধা করি নি। বিষয়-বৈভব সম্বন্ধে নন্দলাল কিঞ্চিৎ সচেতন ছিলেন। বলতেন, 'বড় আইডিয়া করতে হলে মনও বড় হওয়া দরকার এবং বড় আইডিয়া করতে করতে মন বড়ও হয়ে থাকে।' অবশ্য একথাও তিনি বলতেন যে, যদি ভাবের গভীরতা (ডেপ্‌থ) থাকে, তবে সবই মানিয়ে যায়। অসিতকুমারের রূপক-চিত্র আমার মনে তেমন দাগ কাটে নি। কোনোদিন ভুল-ক্রমেও আমি সে চেষ্টা করি নি। কথাবার্তা যাই হোক, লক্ষ করা যাচ্ছিল যে নন্দলাল ও অসিতকুমার উভয়েরই ছবি মাটির দিকে নেমে আসছে। তাঁদের

জীবনে যেটি পরিবর্তন, আমাদের জীবনে সেটি প্রথম থেকেই দেখা দিয়েছিল। তৎকালীন আমার ও আমার সতীর্থদের মনোভাবের কোনো পরিবর্তন স্থান-পরিবর্তনের কারণে ঘটে নি। শিল্পীজীবনের পরিবর্তনের স্থত্রপাত হল তৎকালীন লাইব্রেরি-ঘরের দোতলায় আসার পর।

এতদিন কেটেছে স্কুলের জীবনযাত্রার থেকে দূরে—রাস্তার ধারে। সকাল-সন্ধ্যায় পথচারীদের দেখেছি, সূর্যোদয় দেখেছি এবং নিজেদের শিল্পকর্ম, শিল্পচিন্তা করেই দিন কাটিয়েছি লাইব্রেরির দোতলাতে এসে যখন আমরা উঠলাম তখন থেকে পরিবেশ এবং ভাবনাচিন্তাও কিছু-কিছু বদলাতে শুরু হল। বাঁদিকে শাল-বীথিকা, গাছের তলায় ক্লাস হচ্ছে, ছেলেমেয়েরা আসন হাতে চলেছে, সামনে গেট, প্রাঙ্গণ, ছাত্রাবাস, ছাত্রাবাসের সামনে কয়েকটা কাঞ্চন গাছ, বাঁদিকে বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে উঠেছে বড় বড় পাতাওয়ালা সেগুন গাছ ও দুটো তাল গাছ। একতলায় লাইব্রেরি-ঘরের কিছু অংশ অধিকার ক'রে আছেন পণ্ডিতরা, বাকি অংশ লাইব্রেরি।

ছেলেবয়স বই নিয়েই কেটেছে। লাইব্রেরিতে সাজানো বই দেখতে দেখতে নতুন ক'রে বই পড়ার ইচ্ছে জাগল এবং বই পড়া শুরু করলাম নতুন উৎসাহে। এতদিন বিদ্যাভবনের ছাত্রদের সঙ্গে অন্তত আমার কোনো পরিচয় ঘটে নি। লাইব্রেরির ওপরতলায় থাকতে বিদ্যাভবনের ছাত্রদের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। এই সময় যাঁরা বিশ্বভারতীতে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই উজ্জ্বল প্রতিভার প্রমাণ রেখে গেছেন। তাঁরা জিজ্ঞাসু হয়ে কলাভবনে আসতেন, আমরাও তাঁদের নানা প্রশ্ন করতাম। যে বিষয়ে তাঁরা জানতেন না সে বিষয়ে অনুসন্ধান ক'রে তাঁরা আমাদের জানিয়ে দিতেন। আমরাও আমাদের কাজের রীতিপদ্ধতি তাঁদের দেখাতাম, অর্থাৎ উভয়ে উভয়কে জানবার সুযোগ ছিল অনেক। আমার মনে হয় সে সময়ে ঝিমিয়ে পড়া শিক্ষক বা ছাত্র বিশ্বভারতীতে ছিল না। হয়ত আমার এ ধারণা ভুল, কিন্তু আজও আমার এ বিশ্বাস চলে যায় নি। যাঁরা গম্ভীর বিষয় নিয়ে ঐকান্তিক গবেষণা করেন, তাঁরা প্রায় সময়ই চটুল রহস্যও করতে পারেন। কারণ রহস্য প্রাণশক্তিরই একরকমের প্রকাশ। তাই হাসি-গল্পেরও অভাব ছিল না এই সময়ে। অর্থাৎ হুমড়ি খেয়ে বই মুখস্থ করাটা চরম বিষয়
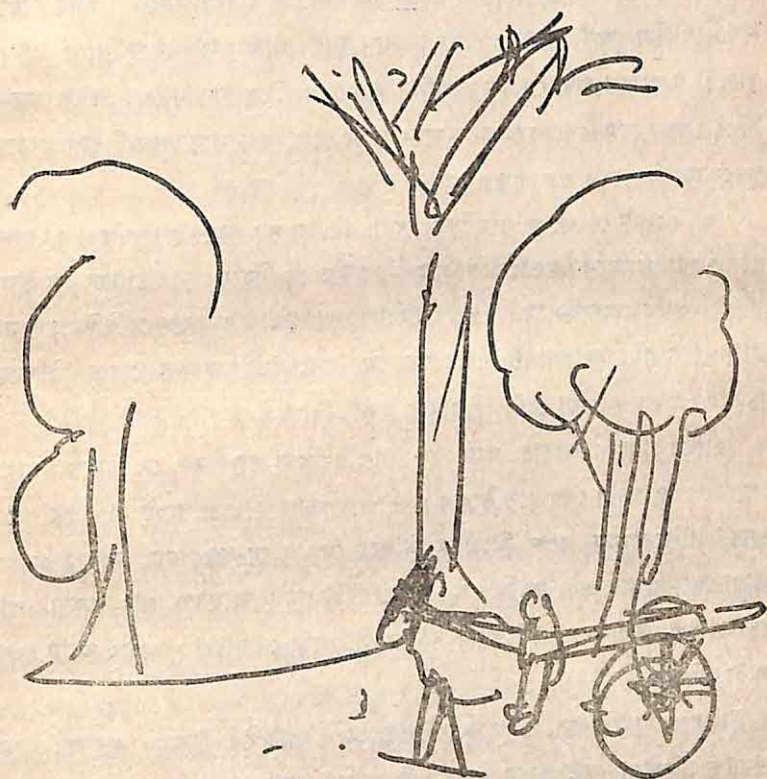
বলে সে সময়ের কোনো ছাত্র অন্তত মনে করত না, সংস্কৃতির মূল্য তারা বুঝত।

এ পর্যন্ত দিনরাত এঁকে বা ছবির চিন্তা ক'রে কাটিয়েছি। শুক্লপক্ষের রাত্রে বড় বড় কাগজ নিয়ে গাছের তলায় রেখে গাছের ছায়া কাঠকয়লা দিয়ে এঁকেছি। সংসারের ঘাত প্রতিঘাত বলতে কি বোঝায়, তার কোনো সন্ধান তখনো করি নি। ক্রমে চোরকাঁটার মতো গায়ে বিঁধতে শুরু করেছে নানা সমস্যা। এসব সমস্যার শীর্ষদেশে ছিল অর্থ সমস্যা। যাঁদের সঙ্গে ছবি আঁকা শুরু করেছিলাম, তাঁদের অনেকেই বাইরে চলে গেছেন চাকরির সন্ধানে। ঠিকে চাকরি শেষ ক'রে অনেকে ফিরেও আসছেন এবং অপেক্ষা করছেন নতুন চাকরির। কয়েকজন বিবাহ করেছেন, দু-একজন বিবাহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

আমি ছোট ছেলেদের স্কুলে ড্রইং ক্লাস নিতে শুরু করেছি। দক্ষিণা যৎসামান্য হলেও সামান্য অর্থে কিভাবে মানিয়ে নিতে হয় সে বিষয়ে পাকাপোক্ত অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করেছিলাম। কিন্তু মাস্টারি করা আমার পক্ষে বেশিদিন হল না। ক্লাস পরিচালনা করা আমার সম্ভব হয় নি, কাজেই শিক্ষকতা ছেড়ে নিশ্চিন্তেই ছিলাম। কিন্তু দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছিল টাকা নিয়ে।

বাইরে গিয়ে আমার পক্ষে যে চাকরি করা সম্ভব নয়, সে বিষয়ে আমার অধ্যাপক ও বন্ধুরা বেশ বুঝেছিলেন। সরকারী চাকরি তো পাবই না। বড় শহরে দ্রুত গাড়িঘোড়ার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়া যে সম্ভব নয়, এসব সত্য কথা তাঁরা জেনেছিলেন এবং আমিও জানতে পেরেছিলাম। আমাকে আর একটা কাজ দেওয়া হল, কলাভবন লাইব্রেরির বইপত্র সাজানো-গোছানো। অর্থাৎ আমি হলাম লাইব্রেরিয়ান।

ইতিমধ্যে রামকিংকর, সুকুমার দেউস্কর, সুধীর খাস্তগীর ইত্যাদি পরবর্তীকালের প্রখ্যাত শিল্পীরা কলাভবনে যোগ দিয়েছেন। আরো অনেক নতুন ছাত্রছাত্রী এসেছেন। নতুন এবং পুরাতনের মধ্যে একটা পার্থক্য তখন গড়ে উঠেছে। আমার পুরনো বন্ধুদের তখন কেউই নেই, তাই তখন আমি একা। খোয়াই, সুরুলের শালবন, কোপাইয়ের ধার—এইসব স্থান তখন আমার প্রায় নিত্য সঙ্গী। ছবিও আঁকি এইসব বিষয় অবলম্বনে। এই সময় একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে।

তখন আমি একখানা কাশফুলের ছবি আঁকছি। স্বাভাবিক রং দিয়েই ছবি শুরু হয়েছিল। ছবি যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন একদিন ভোর রাত্রে স্বপ্ন

দেখলাম যে ছবির সমস্ত পৃষ্ঠভূমি আমি লাল রং দিয়ে ভরে দিচ্ছি। ভোরের আলো তখন সবেমাত্র ফুটে উঠছে, ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার। নিজের আসনে বসে বেশ ভাল ক'রে অনেকখানি সিঁদুরে লাল গুললাম। তারপর আলো একটু ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রং লাগিয়ে ফেললাম, লাল রং দিয়ে ভরে ফেললাম ছবির পৃষ্ঠভূমি। সাদা কাশফুল, লাল জমি। রং-তুলি রেখে আবার বারান্দায় এসে শুলাম। সকালবেলা যখন সবাই কাজ করতে এসেছে, নন্দলাল ছবি দেখে বিস্মিত। নন্দলাল বললেন, 'এতটা লাল রং লাগিয়ে দিলে!' ছবি শেষ করবার জন্য আর আমাকে বিশেষ খাটতে হয় নি। লাল যেখানে সাদা ফুলের গায়ে এসে লেগেছে, সেগুলো পরিষ্কার ক'রে দিলাম। আর নীল আকাশ বদলে হলদে ক'রে দিলাম। উজ্জ্বল রঙের ছবি এই বোধহয় আমার প্রথম। এর পূর্বে এবং পরে যেসব ছবি হয়েছিল, তার অধিকাংশই হয়েছিল বর্ণ-বিরল।

আমার জীবনে এবং আমার পরিচিত শিল্পীদের জীবনে এমন কিছু-কিছু ঘটনা আছে যা নব্য সমাজে বলবার নয়, তবু এই ঘটনাটির উল্লেখ করলাম। কারণ আমি জানি কোনো বিষয় যদি দিবারাত্র কায়মনোবাক্যে চিন্তা করা যায়, তাহলে তার একটা অপ্রত্যাশিত মীমাংসা ঘটে।

এই সময় যেমন লেভি, উইনটারনিৎসের মতো বহু মনীষী এসেছিলেন, তেমনি বহু বিচিত্র চরিত্রের মানুষের সমাগম হয়েছিল। এর মধ্যে দু-একজন শিল্পীও ছিলেন। তাঁদের দু'জনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। প্রথম এসেছিলেন সাইকেল চড়ে এক বিদেশী আর্টিস্ট। বোহেমিয়ান আর্টিস্ট বলেই তিনি আমাদের মধ্যে পরিচিত হয়েছিলেন। এই আর্টিস্টের নিজের কাজও কিছু সঙ্গে ছিল এবং শান্তিনিকেতনে থাকতে কিছু কাজও তিনি করেছিলেন। তার মধ্যে প্রধান হল কাঁচের ওপর করা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। পৃষ্ঠভূমি তারকাখচিত, ছবিতে ছিল নানারকমের সবুজ। সব ছবিটা দেখতে ছিল শেওলার মতো। এই রং প্রবর্তন করতে বোহেমিয়ান আর্টিস্ট যে কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন, তারও কিছু উল্লেখ করা যাক। তাঁর বর্ণ প্রয়োগ-রীতি একটি চার্টের মধ্যে তিনি ফেলেছিলেন, সেই চার্টে প্রত্যেক রঙের সঙ্গে আলো উত্তাপ হিউমিডিটি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিশেষ বিশেষ গুণের জন্য বিশেষ বিশেষ রং। উদ্দেশ্য true to nature করা। কিন্তু

কার্যক্ষেত্রে সবই হয়ে যেত সবুজ। কেন সব ছবি সবুজ হতো আর কেনইবা তিনি ওই চার্ট করেছিলেন তার কোনো সদুত্তর তিনি দিতে পারেন নি। তাঁর ইচ্ছে ছিল, তাঁর চার্ট আমরা কলাভবনে প্রবর্তন করি। সচরাচর তিনি (যতগুলি ছবি আমরা দেখেছিলাম) সিল্কের ওপর মিহি তুলি দিয়ে কাজ করতেন। দেখতে হতো সবুজ শেওলা রঙের অলিওগ্রাফ। জীর্ণ কালো স্যুট পরা, দীর্ঘকায়, থেকে থেকে দীর্ঘ নিশ্বাস—এগুলিই আজ মনে পড়ে। কাঁচের ওপর করা রবীন্দ্রনাথের ছবিটি কলাভবনে প্রদর্শিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হাওয়ায় ছবিটি মাটিতে পড়ে টুকরো হয়ে যায়। এই দুর্ঘটনা যখন বোহেমিয়ান আর্টিস্ট দেখলেন, তিনি বললেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রাণ বেরিয়ে গেল ছবি থেকে। যেমন অকস্মাৎ তিনি এসেছিলেন তেমনি অকস্মাৎ একদিন তিনি সাইকেল ও জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেলেন।

বোহেমিয়ান আর্টিস্ট চলে যাবার বেশ কয়েক বছর পরে এলেন ফ্লোরেন্স অ্যাকা-ডেমির শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী কোঠারি। বেঁটেখাটো মানুষ, শীর্ণ চেহারা, পরনে গেরুয়া। তাঁর উদ্দেশ্য প্রথমেই তিনি জানিয়েছিলেন নন্দলালকে যে তিনি এখানে এসেছেন অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা করতে। তখনকার শান্তিনিকেতনের বাসিন্দাদের ধৈর্যের অভাব ছিল না। নন্দলাল বললেন, 'বেশ তো আপনি থাকুন, নিজে কাজ করুন, ছেলেদের শেখান।' কিন্তু শিল্পী বললেন, 'আমি নিজে তো করব না, আমি 'ভাউ' নিয়েছি যতদিন না অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা করব, ততদিন রং-তুলিতে হাত দেব না।' আমরা তাঁর ছবি দেখতে চাই, বলি, 'আপনি ছবি করুন, আমরা দেখব।' নন্দলাল বলেন, 'আপনি ছবি করলেই অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা হবে।' কিন্তু কোঠারি বলেন, 'না, নিজে হাতে আমি কিছু করব না। আমি তোমাদের মাথা, তোমরা আমার হাত—আই অ্যাম ইয়োর ব্রেন, ইউ আর মাই হ্যাণ্ড।' সকলেই সন্দেহ করতে লাগল, আদৌ লোকটি আর্টিস্ট কি না, ইটালি কখনো দেখেছে কি না! আমরা তাঁকে অবিশ্বাস করছি জেনে বললেন, 'আচ্ছা আমি তোমাদের প্রমাণ দিচ্ছি। তারপর একদিন একটি ছোট্ট বাক্স থেকে চামড়ার কেস বের ক'রে আমাদের দেখালেন। ভেতরে দু'দিকে দু'খানি পাসপোর্ট সাইজের ফটো। একদিকে স্যুট পরা কোঠারি অন্যদিকে ইটালীয় তরুণী, ফ্লোরেন্স অ্যাকাডেমির সার্টিফিকেটও বের করলেন। সেখানে তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন তারই সার্টিফিকেট। কোঠারি বললেন, 'এখন তো আমাকে তোমরা সন্দেহ করবে না?' কোঠারি যা বলেছেন, তা সবই সত্য। তিনি ইটালির

শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পী—এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু শপথ নেওয়ার কি কারণ? শেষপর্যন্ত রহস্য ভেদ হল। কোঠারী জানালেন তরুণীটি তাঁর বাগ্‌দত্তা। তাঁর কাছে তিনি শপথ করে এসেছেন, ভারতবর্ষে অ্যাকাডেমি ক'রে তাঁকে এনে তিনি বিয়ে করবেন। ১৫ বৎসর তাঁদের দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। মেয়েটি কোথায় আছে তিনি জানেন না, ঠিকানাও জানেন না। তাও তিনি প্রতীক্ষা করে আছেন যে অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা হলেই মেয়েটি চলে আসবে। আমরা যেন পাগলের প্রলাপ শুনছিলাম। যে মেয়ের সঙ্গে ১৫বৎসর দেখাসাক্ষাৎ নেই তাকে তিনি দেশে আনবেন, বিবাহ করবেন, কি এর তাৎপর্য! ছবি আঁকবেন না অথচ অ্যাকাডেমি করবেন। সাধারন একজন শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক এই ধারণা নিয়ে দিন কাটায় কি করে? কোঠারি বললেন, 'রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে তিনি স্থান পাবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু তা যখন হল না তখন বেঁচে থেকেই বা কি লাভ? আত্মহত্যা করাই আমার একমাত্র পথ।'

বোহেমিয়ান আর্টিস্ট বা কোঠারি ভাগ্যবিড়ম্বিত সরল লোক। কিন্তু আজও আমি বুঝতে পারি নি তাঁরা স্বাভাবিক ছিলেন, না পাগল ছিলেন!

গরমের ছুটিতে শান্তিনিকেতন আশ্রম নতুন রূপে দেখা যেত। বিদ্যালয় খোলা থাকলে ঘণ্টা ধরে কাজ চলত, গরমের ছুটিতে ছেলেরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজা মুহূর্তের মধ্যে বন্ধ হয়ে যেত। মনে হতো আচমকা সমস্ত পরিবেশ ঝিমিয়ে পড়েছে, সাড়াশব্দ নেই, মানুষও দেখা যায় না বেশি। কুকুরগুলো বিভ্রান্তের মতো খাবার অন্বেষণে ঘুরে বেড়ায়, কটকট ক'রে বটফল খায় আর শুয়ে থাকে গাছের ছায়ায়, বারান্দার কোণে, স্নানের ঘরের পাশে, বা কুয়োতলার কাছে। কাজের প্রচুর অবসর। ভাল ক'রে সাজিয়ে-গুছিয়ে বসি কাজের জায়গায়। সকালে-বিকালে দু-চারজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়, যাদের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা ছিল না তাদের সঙ্গে কথা হয়, ক্রমে এরাই হয়ে উঠতেন ছুটির সঙ্গী বা বন্ধু। বিকেলের দিকে কিছুটা ঝড়, কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে উত্তাপ কমে আসে। তারপর রাত্রি কাটে শান্তিতে। এই হল মোটামুটি গরমের ছুটির পরিচয়।

ক্রমে পটপরিবর্তন হয়। জ্যৈষ্ঠের ঝড়-বৃষ্টি প্রচণ্ড মূর্তিতে দেখা দেয়। বিকেলের দিকে ঝড়ে টিনের ছাদ উড়িয়ে নিয়ে যায়, চালের খড় উড়ে যায়, দরজা জানলা

ভাঙে, ঘরের মধ্যে বৃষ্টির জল পড়ে ভিজিয়ে দিয়ে যায়। সে হল আর এক অভিজ্ঞতা। বৃষ্টিতে গাছপালা একটু সতেজ হতে না হতেই গরম আরো প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। চারিদিক শুকনো পাতায় ভরে যায়, রাত্রে হাওয়াতে সেসব শুকনো পাতা মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলে খড়খড় আওয়াজ ক'রে। হাওয়া বন্ধ হয়, শুকনো পাতার নড়াচড়াও থেমে যায়। অন্ধকার রাত্রে শুকনো পাতার নড়াচড়ার এই শব্দ সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে এতই ভিন্ন যে সে-অভিজ্ঞতাকে একরকমের বিস্ময়কর ভূতুড়ে অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গ্রীষ্মের দুপুরে খালি পায়ে, খালি মাথায় যখন ঘুরে বেড়িয়েছি গ্রামের পথে, খোয়াইয়ের ধারে, তারও অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে দুর্লভ হয়ে উঠেছে এবং অন্যের কাছে এইসব কাহিনী গল্পের মতো মনে হয়েছে। গ্রীষ্মের ছুটি পড়লে আজও সেই দুপুর ও অন্ধকার রাত্রির কথাই মনে পড়ে। এই নির্জনতাই বোধহয় আমার দৃশ্য-চিত্রের প্রধান বিষয়। তাই ভাবি আমি শিখলাম কার কাছ থেকে? নন্দলালের কাছ থেকে, না লাইব্রেরি থেকে, অথবা শান্তি-নিকেতনের এই রুক্ষ প্রকৃতি থেকে? নন্দলাল না থাকলে আমার আঙ্গিকের শিক্ষা হতো না, লাইব্রেরি ছাড়া আমার জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হতো না, আর প্রকৃতির রুক্ষ মূর্তি উপলব্ধি না করলে আমার ছবি আঁকা হতো না।

এ পর্যন্ত যেভাবে আমি কাজ করেছি, প্রকৃতিকে অনুভব করার সুযোগ পেয়েছি, তার অবসান ঘটল লাইব্রেরি-ঘরের দোতলায়। এরপর শুরু হল নতুন পরিবেশ, নতুন জীবন; মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ হল ঘনিষ্ঠ।

আমার জীবনে যা মূল্যবান তা প্রকাশ পেয়েছে আমার ছবিতে। তাই আমার ছবি না দেখলে আমার জীবনের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যাবে না। জীবনের আর একটা অভিজ্ঞতা আছে—সে হল মাস্টারি, চাকরি, এইসব। আর সোজা কথায় এই সবই সংসারের অভিজ্ঞতা। এদিক দিয়ে আমার জীবন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে কিছুমাত্র ভিন্ন নয়। শৈশবকালে দেখেছি স্বদেশী আন্দোলন। দেখেছি রাস্তার ওপর কোমরে হারমোনিয়াম বেঁধে 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গাইতে গাইতে মিছিল বেরিয়েছে। ছেলেরা আওড়াতে আওড়াতে চলেছে, 'বেত মেরে কি মা ভোলাবি, আমি কি মার সেই ছেলে···? অপরদিকে দেখেছি বাড়ির জোয়ান ছেলেরা পান নিয়ে এসে রাস্তায় নর্দমায় ফেলে দিচ্ছে। এ ছিল বিলাসিতা-বর্জনের একটা অংশ। এ হল বাল্যের অভিজ্ঞতা। প্রথম যৌবন থেকেই গান্ধি-আন্দোলন শুরু হয়েছে। গান্ধি-আন্দোলনের প্রভাবে খদ্দর পরেছি, সিগারেট ছেড়ে বিড়ি ধরেছি।

একটু আধটু তকলি কাটতেও চেষ্টা করেছি। এর বেশি কিছু করি নি। কাজেই জীবনে এমন কোনো অভাবনীয় বিস্ময়কর ঘটনা নেই যা বলার কোনো প্রয়োজন আছে।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমার এক বন্ধু আমায় বলেছিলেন যে দেশের এই দুর্দিনে আপনার লজ্জা করে না বসে বসে কাগজে রঙ লেপতে? কিন্তু আমি নির্লজ্জের মতো সারাটা জীবন কাগজের ওপর রঙ লেপেই কাটালাম। আসল কথা, আমার স্বভাব এমন যে কোনো সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে আমি নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারি নি। পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের ইতিহাস তৈরি হয়েছে আমার চোখের সামনে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প ঘটেছে—এর সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমার ছিল না। এ বিষয়ে কোনো ছবিও আমি করি নি।

শিল্পীজীবনের পরাকাষ্ঠাই আমার চিরদিনের লক্ষ্য। আমি নিজেকে জানতে চেয়েছি এবং সেই জানার জন্যই অন্যকে জানাতে চেষ্টা করেছি। আমি সাধারণের একজন, একথা আমি কখনো ভুলি নি।

এই জানার কৌতূহল নিয়েই আমি ১৯৩৮ সালে কয়েকমাসের জন্য জাপান গিয়েছিলাম। জাপানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রায় কিছুই আমি দেখি নি। এমনকি যে টোকিও শহরে আমি বাস করেছি, সে টোকিও শহরেরও অল্পই আমি দেখেছি। মিউজিয়ম, আর্টিস্টদের স্টুডিও, এই দেখেই আমার সময় কেটেছে। যে সময় আমি জাপান গিয়েছিলাম সে সময় জাপান বিরাট এক ঐতিহাসিক ঘটনারসামনে উপস্থিত হয়েছে। টোকিও শহরে উপস্থিত হয়েছিলাম শীতকালে। এইখানে পৌঁছাবার কিছুদিন পরেই বরফ পড়া শুরু হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই উঁচু হয়ে উঠেছিল জাপান-জার্মানির মৈত্রীর প্রতীকরূপে দু-দেশের জাতীয় পতাকা। শহরের বাইরে মেশিনগানের মহড়া চলেছে। শহর ঘিরে এই শব্দ। সারা শহর বরফে সাদা। লক্ষ করতে অসুবিধে হয় না যে জাপানের অধিবাসীদের ভেতরের রক্ত গরম হয়ে উঠছে। তার আভাস আমার মতো বিদেশীর পক্ষেও বুঝতে অসুবিধে হয় নি। যাঁরা বিশুদ্ধ জাপানি পদ্ধতিতে তখন ছবি করছিলেন, তাঁদের কথায় কোনো ঝাঁজ পাওয়া যায় নি। কিন্তু যাঁরা আধুনিক প্যারিস শহরে শিক্ষিত শিল্পী ও তরুণ, তাঁদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে উত্তাপ বেরিয়ে আসত। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে দেখা যেত

ফ্রান্স-প্রত্যাগত শিল্পীদের কেউ জানিয়ে দিচ্ছেন যে তাঁরা ফরাসি রঙ-তুলি এবং ফরাসি স্ত্রী ত্যাগ ক'রে এখন থেকে জাপানি তুলি গ্রহণ করবেন।

রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী বৌদ্ধশাস্ত্র বিশারদ তাকাকুসু আমায় বলেছিলেন, 'তখনকার পণ্ডিতরা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, বৌদ্ধধর্ম সরাসরি তাঁরা ভারতবর্ষ থেকে পেয়েছেন ; অন্তত কোরিয়া থেকে জাপানে এসেছে—চীনদেশ থেকে নয়। এইজন্য যখন আমি ঐতিহাসিকদের কাছে বলেছিলাম যে সো-তাৎসুর ছবি কোরিনের চেয়ে আমার ভাল লাগে তখন তাঁরা দুঃখিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন সো-তাৎসু তো চীনদেশের নকল করেছিলেন! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে চীনাবিদ্বেষ জাপানের পণ্ডিতসমাজকে কতটা প্রভাবান্বিত করেছিল, তারই ইঙ্গিত তাকাকুসুর উক্তি থেকে পাওয়া যাবে।

কিন্তু এইসব খবর আমার অনুসন্ধানের বিষয় ছিল না। আমি গিয়েছিলাম আর্টিস্টদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে এবং জাপানি শিল্পের মর্ম বুঝতে। জাপানি শিল্পীদের মধ্যে 'ইমপ্রেশনিস্ট'দের প্রভাব সবচেয়ে বেশি ছিল। মাতিস্-এর প্রভাবকে তাঁরা খুব ভাল করেই আয়ত্ত করেছিলেন। এই সময় প্যারিস-ফেরতা অনেক জাপানি নিজের দেশের পরম্পরাকে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন।— 'সুররিয়েলিস্‌ম' (surrealism) তখন সবেমাত্র টোকিও শহরে দেখা দিয়েছে। তখনো তা জাপানি শিল্পীদের আয়ত্তে আসে নি।

সে সময় টোকিও শহরে বিশুদ্ধমতে life study, portrait করাবার ব্যবস্থাও অনেকগুলি স্টুডিওতে ছিল। একজন শিক্ষকের অধীনেই এই ক্লাস চলত। শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশের আর্টস্কুলের চেয়ে বিশেষ ভিন্ন নয়। তুলনার ভাষায় বলতে পারি যে এইসব শিল্পীর ড্রইং এবং বর্ণলেপনের দক্ষতা সমকালীন ভারতীয় শিল্পীদের চেয়ে অনেক ভাল।

রাসবিহারী বসুর মধ্যস্থতায় সে সময় একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল প্রাচ্য-সংস্কৃতি ও জাপানি সংস্কৃতির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন। এঁরা প্রয়োজন হলে বিদেশীদের 'গাইড' দিয়ে সাহায্য করতেন। আমি যে গাইড পেয়েছিলাম তার নাম হংগো। জাপান ইম্পিরিয়াল ইউনিভারসিটির শিক্ষাপ্রাপ্ত এই যুবকের জাপানি শিল্প সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। যে ক'মাস আমি টোকিওতে ছিলাম, হংগো প্রতিদিন সকালে আমাকে টেলিফোন ক'রে জানাতেন বাইরে কোথায় কোন প্রদর্শনী হচ্ছে এবং কোন কোন আর্টিস্টের

সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা হতে পারে। হংগোর চেষ্টাতে আমি জাপানের বিখ্যাত শিল্পী টাকে-উচি সেইহোর সঙ্গে দেখা করতে পেরেছিলাম। টাকে-উচির বয়স তখন ৭০ পেরিয়েছে। যৌবনকালে জার্মানি, ইটালিদেশ তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি যে দক্ষিণ-চীনের পরম্পরার অনুগামী সেকথা তিনি নিজেই স্বীকার করলেন। তাঁর মতে নব্য শিল্পীরা আঙ্গিকের চর্চায় খুবই দক্ষ কিন্তু তারা অনুভব করার কথা ভাবে না। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা শিখেছি অনুভবের পথেই আঙ্গিক আয়ত্ত করা। শিল্পীর মনই জানে কালি কখন তরল হবে, কখন গাঢ় হবে—তুলি কখন চলবে ঝড়ের বেগে, কখন চলবে মৃদুমন্দ গতিতে। এসব কিছু অনুভব না করলে ছবি করা যায় ?'

কথাবার্তা শেষ হবার পর তিনি অবনীন্দ্রনাথের পুরনো খেলনার পরিচিত একটি ছাপা ছবি বের ক'রে আমাকে বললেন, 'ছবিটি সুন্দর। এই আর্টিস্ট কি portrait করেন ?' বললাম, 'তিনি প্রথম যৌবনে প্রতিকৃতি অঙ্কনই শিখেছিলেন। তারপর মাঝে মাঝে সে কাজ ক'রে থাকেন।' টাকে-উচি বললেন, 'ইনি খুব উচ্চস্তরের প্রতিকৃতি আঁকিয়ে হতে পারতেন।' বহুক্ষণ কথাবার্তার মধ্যে কোথাও চীন পরম্পরার বিরুদ্ধে তাঁর কোনো ঝাঁঝ লক্ষ করি নি। বরং তিনি বললেন, 'চীনদেশের কাছ থেকে আমরা অনেক পেয়েছি। পলিটিক্স-এর সঙ্গে আর্টিস্টদের কি সম্পর্ক ?' ঠিক এর উল্টো কথা বলেছিলেন টাইকান। কারণ জাপান সরকার তখন টাইকানের পৃষ্ঠ-পোষক। টাইকানই যুদ্ধের প্রাক্কালে ইটালিতে জার্মানিতে গিয়েছিলেন জাপানের সংস্কৃতির প্রতিনিধিরূপে। হংগো আমাকে বলেছিলেন যে টাইকান একসময় শিল্পের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে অনেক লড়েছেন। কিন্তু আজ তিনি আমাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছেন। কথাটি উচ্চারণ করেই হংগো বললেন, 'সরি, এই কথাটি আপনি কাউকেই বলবেন না, আপনার ভারতীয় বন্ধুদেরও নয়।'

ধীরে ধীরে হংগো আমার বন্ধুর মতো হয়ে উঠলেন। জাপানের তৎকালীন অবস্থার নানা খবর তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম। একদিন কথা প্রসঙ্গে চায়ের উৎসব (Tea-ceremony) সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে হংগো একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'চায়ের উৎসব তো কাউন্ট-ব্যারনদের ব্যসন। আমাদের মতো লোকের জন্য তো সে জিনিস নয়।' হংগোর কালো ওভারকোটের নিচে একটা লাল আবরণ ছিল, সেইটি সে আমার কাছে ধীরে ধীরে খুলে ধরল। যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম করতে দেশের সব টাকা কিভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে—গ্রামের লোক কি রকম দরিদ্র—এই ছবি সে আমার কাছে তুলে ধরল।

সেদিন সন্ধ্যায় প্রদর্শনী থেকে বাড়ি ফিরছি, হংগো বলল, 'কাছেই একটা ছোট পার্ক আছে, চলুন সেখানে গিয়ে একটু বসি।' পার্কের মধ্যে জনমানব নেই, কেবল এক বুড়ি একটা ঠেলাগাড়ি সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠেলাতে রঙচঙে কাগজের মোড়কে বাঁধা জাপানি কেক। হংগো দুটো কিনল। আমাকে সে বলল, 'আপনিও দুটো কিনুন।' কেক কেনবার পর হংগো তার হাতের কেক দুটো আবার ঠেলা-গাড়ির ওপর রেখে দিল, আমাকেও বলল রেখে দিতে। হংগোর এই রহস্য-জনক ব্যবহার আমি বুঝতে পারছি না। কেনই বা এই কেক পয়সা দিয়ে কেনা হল, আর কেনই বা পয়সা সমেত কেক ফেরত দেওয়া হল? পার্কের বাইরে এসে হংগো বলল, 'ওই কেক খাওয়ার উপযুক্ত নয়। টোকিও শহরের রাস্তায় ভিক্ষে করা নিষেধ, সেইজন্যই এই ব্যবস্থা। আমাদের বাইরেটা রঙচঙে, কিন্তু ভিতরে কিছুই নেই।' আবার হংগো প্রশ্ন করেন, 'কার জন্যে আমরা যুদ্ধ করছি, কে আমাদের শত্রু? এই যে জার্মানি-জাপান সন্ধি হল তার পরিণাম কি হবে—বলতে পারেন?'

দেশে ফেরার পর হংগোর সঙ্গে নিয়মিত পত্র-বিনিময় হতো তারপর ১৯৪০-এর প্রাক্কালে এক চিঠিতে সে জানালো চিঠিপত্র লেখা আমাদের বন্ধ হোক।

•

অবনীন্দ্র পরম্পরার ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে কম্পু আরাইয়ের নাম অজানা নয়। জাপানে কম্পু আরাইয়ের কাছ থেকে বহুদিক দিয়ে বহু রকমের সাহায্য আমি পেয়েছি। জাপানি শিল্পে ক্লাসিক আঙ্গিক সম্বন্ধে যেসব কথা তিনি ছবি এঁকে আমাকে বুঝিয়েছিলেন, সেসব কথা আমি ভুলি নি। তাঁর সঙ্গে প্রথম যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি একখানা স্ক্রিন করছিলেন, কোনো হোটেলের ছাদের নিচের নক্শা হিসেবে। আরাই বললেন, 'দ্যাখো, ভারতীয় ফুল হয়েছে কি না।' এই ছবিতে সাংঘাতিক ভুল ছিল, পলাশ ফুলের সঙ্গে তিনি অশোক গাছের লম্বা লম্বা পাতা লাগিয়েছিলেন। এই ত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে বেশ জোরে হেসে উঠে বললেন, 'কি ক'রে এরকম ভুল হল?' তারপর আমার কাছ থেকে পলাশ গাছের আকার-প্রকার দেখে নিয়ে বললেন, 'ও পাতা ব্যবহার করা যাবে না, দেখবে আমি মানিয়ে নেব।'

তাঁর ছাত্রদের কিভাবে শেখান দেখবার সুযোগ তিনি আমায় দিয়েছিলেন। তোবাসোজোর লাইন তিনি ছাত্রদের মুখস্ত করাতেন। আরাই-এর মতে তোবা-

সোজোর লাইন ঠিক বুঝতে পারলে জাপানি শিল্পের যে কোনো লাইন সহজে আয়ত্ত করা যাবে। কারণ তোবাসোজোর লাইনে তুলির সকল রকমের খেলা লক্ষ করা যায়। এরকম ছোটখাটো অনেক কথাই বলা যায়। আপাতত আমার সবচেয়ে মূল্যবান অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দিই।

জাপানি নববর্ষ উপলক্ষে আরাই প্রচুর অর্ডার পেয়েছিলেন। অধিকাংশই হোটেল থেকে। সকাল আটটার মধ্যে তিনি কাজে বসে যেতেন। কাকিমোনোর জন্য নির্দিষ্ট মাপের জাপানি কাগজের উপর তিনি বিদ্যুৎ গতিতে ছবি এঁকে যেতেন সন্ধ্যা পর্যন্ত। ছবির উপরাংশে গোল লাল সূর্য, নিচে মাছ, দু-চারটি জলের রেখা, তারপর সিল মেরে কাগজটা দূরে রেখে আর একখানা কাগজ বের ক'রে সামনে ফেললেন। চেরি সিগারেটে দুটো টান দিয়ে আগুনের পাত্রে সিগারেট গুঁজে দিয়ে আবার কাজ শুরু হল। কিছুক্ষণ পরে পরে আরাই-এর স্ত্রী আসছেন, ধোয়া রঙের বাটি রেখে নোংরা রঙের বাটিগুলি উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। রঙের বাটি ওঠানো নাবানোর সঙ্গে ঝনঝন আওয়াজ চলেছে। ছবি আঁকা, প্লেট ধোয়া, হুস্ হুস্ ক'রে আরাই-এর সিগারেট খাওয়া—সব মিলে মনে হতো যেন একটা কারখানা।

সেদিন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আরাই কাগজ সামনে রেখে একটু বেশি সময় নিয়ে সিগারেট ধরিয়েছেন। এমন সময় আরাই-এর স্ত্রী দ্রুতপদে ঘরে ঢুকে বললেন, লোক এসে গেছে। আরাই বললেন, 'দাঁড়াও।' তারপর কথা নেই বার্তা নেই, নামের একটা সিল্ নিয়ে ছবির কাগজের ওপর নানা জায়গায় লাগিয়ে দিয়ে মাঝখানে বিদ্যুৎ গতিতে দুটো মোটা লাইন টানলেন নিচে থেকে ওপরে। এইবার গাঢ় কালি নিয়ে লাইনের মাথায় দুটো মোটা মোটা ছোপ লাগালেন, দেখতে হল যেন ব্যাঙের ছাতা। আমি প্রশ্ন করবার পূর্বেই তিনি বললেন, 'সামুদ্রিক উদ্ভিদ, আমরা খাই। আর কিছু ভাবতে পারছি না।'

আরাই স্ত্রীকে বললেন, 'ওকে ডাকো।' পাওনাদার ঢুকেই আরাই-এর পাশে বেশ ভারি রকমের টাকার তোড়া রাখল। তারপর চটপট ছবিগুলো গুছিয়ে বেরিয়ে গেল। আরাই টাকা গুনলেন না, পাওনাদারও ছবি গুনে নিল না। আরাই একটা ছোট হাই তুলে বললেন, 'আটটায় বসেছি, খুব ক্লান্ত।'

দেশে ফেরবার পূর্বে আমার ছবির একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। যে সোসাইটির সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম এবং যাঁরা হংগোকে আমার 'গাইড' রূপে দিয়েছিলেন তাঁরাই এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে যখন ঘরে বসে ছবি আঁকছি

সেইসময় আরাই দুপুরবেলা প্রায়ই আসতেন এবং ছবির ভালমন্দ বলতেন। শেষপর্যন্ত তিনিই প্রদর্শনীর উপযুক্ত ছবি বাছাই ক'রে দিয়েছিলেন। যেদিন আরাই আসতেন না সেদিন এশিয়া লজের ওবাসান এসে আমার ঘরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসত আর সিগারেটের বাক্সের রাঙতা দিয়ে ছোট ছোট নানা রকমের পোকা, পাখি, ফড়িং, প্রজাপতি ইত্যাদি তৈরি ক'রে আমার টেবিলের ওপরে রাখত। ওবাসানের হাতের তৈরি এইসব জিনিস আমি একাধিক শিক্ষিত জাপানিকে দেখিয়েছি। তাঁরা বলেছেন, দুঃখের কথা যে জাপানে আজ আঙুলের দক্ষতা শিক্ষিত সমাজ থেকে প্রায় মুছে গেছে। এসবের সঙ্গে জাপানি চা আসত। যতবার আমি চাইতাম ততবার ওবাসান আমায় চা দিত। মাঝে মাঝে আধপোড়া, লেবু দেওয়া মাছও আমাকে খাওয়াতো। ইতিমধ্যে রাসবিহারী মশাইয়ের দৌলতে আমার নাম কয়েকবার খবরের কাগজে উঠেছে।

সংক্ষেপে, টোকিওর আর্টিস্ট এবং ক্রিটিক মহলে আমি তখন অল্পবিস্তর পরিচিত। কাজেই প্রদর্শনীতে লোকেরও অভাব হয় নি, প্রচারেরও অভাব হয় নি। হংগো এবং আমি সারাদিন প্রদর্শনীতে বসে থাকতাম। দর্শকদের কথাবার্তা, তাদের সমালোচনা হংগো আমাকে ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিত আর আমায় বলত, 'প্রদর্শনী খুব ভালই হল। আধুনিক শিল্পীদের কাছে আপনি বেশ সুখ্যাতি পেয়েছেন।'

এ পর্যন্ত বিখ্যাত ঐতিহাসিক সাইচে টাকির নাম উল্লেখ করি নি। তিনি আমাকে মিউজিয়মের ডিরেকটার আকিয়ামার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'মিউজিয়মে তুমি যা দেখতে চাও সবই দেখতে পাবে, আকিয়ামা তোমাকে সাহায্য করবেন।' আকিয়ামা সত্যিই আমাকে সাহায্য করেছিলেন। কারণ তাঁর সাহায্য ছাড়া কোনো স্কুলের শিল্পীদের স্কেচ-বুক আমি দেখতে পেতাম না এবং অন্যান্য শিল্পীদের কাজও আমার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখবার সুযোগ হতো না। টাকি বারংবার আমায় জাপানি ভাষা শিখতে বলেছিলেন। কিন্তু সে অনুরোধ আমি রক্ষা করি নি। এই ছিল টাকির দুঃখ বা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ। শেষপর্যন্ত তিনি বলেছিলেন, 'যদি তুমি জাপানি ভাষা শিখতে, অনেক বিষয়ে তুমি উপকৃত হতে।'

শান্তিনিকেতন ফেরার পর নতুন ক'রে আঙ্গিক চর্চায় আমি লাগলাম। কলাভবনের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জানিয়ে দিলাম মাউন্ট করা সিল্ক বা কাগজ আমাকে যে দেবে তাকেই আমি একখানা ছবি ক'রে দেব। এইভাবেই ফুল আঁকা শুরু করি। ১৯৪০ সালে কলাভবনের ছাত্রাবাসের ছাদের নিচের কাজ যখন করেছি তখন আমার তুলির টান-টোনের বা রঙের ছোপছাপ দেওয়ার রীতি পূর্বের চেয়ে অনেক বদলেছে।

অনেকে আমায় প্রশ্ন করেছেন যে আমি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কি পেয়েছি? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন। কারণ আমি জন্মেছি রবীন্দ্র-যুগে। ছেলেবয়সে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত করেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছি। সে সময়ের কোনো কোনো পাঠ্যপুস্তকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা স্থান পেতে শুরু করেছে। আমার সাহিত্যবোধের অনেকখানি রবীন্দ্র-প্রভাবান্বিত। বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের লেখা নিয়মিত পড়া হতো। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'নায়ক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কৌতুকজনক চিত্র ও টিপ্পনী নিয়মিত প্রকাশিত হতো। এই কৌতুকচিত্রের একখানি আমার বেশ মনে আছে—বাঁশের ডগায় রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন, তলায় অনেকজন মিলে বাঁশ ধরে আছে, তাতে লেখা—'আমরা তোমায় চাই'। সে সময় প্রায় সমস্ত তরুণ বাঙালি রবীন্দ্রনাথকেই চেয়েছিল। তারপরে এলাম রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে। যে সময় কলকাতা শহরের কোন স্কুল ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন বালককে ভর্তি করতে চায় নি, সেই ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন বালক রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে স্থান পেয়েছে। যে সময় আমার মতো ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষার্থীর পক্ষে কোনো আর্টস্কুলে যোগ দেওয়া অসম্ভব ছিল, সে সময় রবীন্দ্রনাথের কলাভবনে আমি স্থান পেয়েছিলাম, অধ্যাপকের আপত্তি সত্ত্বেও। নন্দলালের যে এ-বিষয়ে বিশেষ আপত্তি ছিল সেকথা প্রসঙ্গক্রমে আমি লিখেছি। নন্দলাল ভাবতে পারেন নি যে আমি কোনোদিন ছবি আঁকতে পারব। সোজা কথায়, তিনি বলেছিলেন যে যার চোখ নেই সে ছবি আঁকবে কি ক'রে? রবীন্দ্রনাথের কাছে আমি আর কিছু যদি না পেয়ে থাকি তবু আমি বলব তিনিই আমার নবজন্মদাতা।

একসময় বিশ্বভারতীর জনৈক রবীন্দ্রবিশারদ আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ নাকি ক্লাস করতেন? জবাবে বলেছিলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁর ক্লাসে আমি পড়েছি। তিনি আমাদের খাতা দেখতেন। বাংলা অক্ষরে আকার-ইকার-

গুলি যে তিনি কেবল সংশোধন করতেন তা নয়, যে সব অক্ষর পরিষ্কার নয়, তার পাশে তিনি নিজের হাতে পরিষ্কার ক'রে অক্ষরগুলি লিখে দিতেন।' এইসব খাতা বোধহয় তখনকার ছাত্ররা কেউ রাখে নি। কারণ রবীন্দ্রনাথ তখনো ছাত্রদের কাছ থেকে দূরে চলে যান নি। পথে, ঘাটে, লাইব্রেরিতে, ছাত্রাবাসে, ডরমেটরিতে যখন-তখন পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি পরা রবীন্দ্রনাথকে দেখা যেত। সহজেই তাঁর সঙ্গে কথা বলা যেত।

রবীন্দ্রনাথের খুব নিকটে আসবার সৌভাগ্য আমার ঘটে নি। আবার তিনি আমার জীবন থেকে কখনো দূরেও চলে যান নি। জীবনের আনন্দ কেউ কাউকে কখনো বিলিয়ে দিতে পারে না। তবু বলতে হয় জীবন যে আনন্দময়, সৃষ্টির পথে অবসাদ অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে যে মুক্তি পাওয়া যায়, সেকথা উপলব্ধি করার সার্থক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে উপস্থিত করেছিলেন তাঁর গানের ডালি। প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য ও তাঁর গান একত্রে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তার স্মৃতি শান্তিনিকেতনের কোনো ছাত্রছাত্রীর মন থেকে বোধহয় মুছে যায় নি।

বর্ষার দিনে শান্তিনিকেতনের ছাত্রাবাসগুলি প্রায় জলে ডুবে যেত, ফুটো ছাদ, ভাঙা জানলা দিয়ে বৃষ্টির ঝাপটা এসে অনেক সময়ে বিছানাপত্র ভিজিয়ে দিয়েছে। বর্ষার এইরকম এক রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়ে আমরা কয়েকজন ছাত্র অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাঁকে আমাদের অসুবিধের কথা জানিয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ ধীরকণ্ঠে বললেন, 'তোরা বোস। ছাখ, আমারও রাত্রে এই খড়ের ঘরে জল পড়েছে, আমিও সারারাত ঘুমোতে পারি নি। বসে বসে একটা গান লিখেছি। শোন, কিরকম হয়েছে।' এই বলে রবীন্দ্রনাথ গান শুরু করলেন—'ওগো দুখজাগানিয়া, তোমায় গান শোনাব, তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখ...'। গান শেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আর্টিস্ট, কবি—আমাদের একই দশা। কেউ আমাদের ছাখে না।' রবীন্দ্রনাথের ঘরে জল অবশ্য সামান্যই পড়েছিল। আমরা পরম আনন্দে রবীন্দ্রনাথের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। নিজেরাই বলাবলি করলাম, 'কই আমরা তো এরকম পারি না!' আজ একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করব, কই রবীন্দ্রনাথ তো ঘর মেরামতের কোনো ব্যবস্থা করলেন না! রবীন্দ্রনাথ ঘর মেরামতের কোনো ব্যবস্থা করেছিলেন কিনা আজ আমার স্মরণ নেই, তবে সেদিন রাত্রের সমস্ত দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর গানে।

রবীন্দ্রনাথ অনেক অন্যায়, ছাত্র-অধ্যাপকদের অনেক অসুবিধে দূর ক'রে যেতে

পারেন নি, একথা অস্বীকার করা যায় না। তবু বলব যে রবীন্দ্রনাথের কাছে যা পেয়েছি তা অমূল্য। অনেকদিন পরের আর একটি ঘটনা—১৯৩৮ কি ৩৯ সাল—সকালবেলা উত্তরায়নের বাগানে ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্কেচ করছি, এমন সময় রবীন্দ্রনাথের কাছে আমার ডাক পড়ল। তিনি পূর্বে কখনো এরকম অকস্মাৎ আমায় ডাকেন নি সেজন্য কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হলাম। উদয়নের দক্ষিণের বারান্দায় রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন। সামনে ছোট টেবিল। প্রশ্ন করলেন, 'কি করছিস তোরা ওখানে?' 'আজ্ঞে স্কেচ করছি ছেলেদের নিয়ে।' 'ওদের সঙ্গে তুইও স্কেচ করছিস?' 'আজ্ঞে হাঁ।' 'দেখি কি স্কেচ করিস?' খাতার পাতা উল্টে উল্টে বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে স্কেচ দেখতে লাগলেন—সূর্যমুখী ফুলের স্কেচ। তারপর স্কেচ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করলেন। ফুলের construction, ফুলের বিশেষ বিশেষ অংশ পেছন থেকে সামনে থেকে নানাভাবে আমি স্কেচ করেছিলাম। এইভাবে স্কেচ করার কার্য-কারণ তিনি জিজ্ঞেস করলেন। রবীন্দ্রনাথ: 'ছেলেরা কি তোর কথা শোনে, তারা এসব বোঝে?' 'আজ্ঞে, আমি সাধ্যমতো তাদের বোঝাবার চেষ্টা করি। আলাদা আলাদা করেও এগুলো তাদের খাতায় করি, আর তাদের বোঝাই।' রবীন্দ্রনাথ: 'তুই বলছিস তারা বোঝে, আমি বলছি তারা সবাই বোঝে না।' তাঁর এই কথার কি জবাব দেব বুঝতে পারলাম না। রবীন্দ্রনাথ: 'তোর কথা ৫।৬ জন হয়ত মন দিয়ে শোনে ২।৩ জন বোঝবার চেষ্টা করে এবং ১।২ জন হয়ত এইসব বোঝে এবং কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। জানিস, এই তোর দুর্ভাগ্য। যে জিনিস ৪ জন বুঝবে, সে জিনিস ১৪ জনকে শেখাতে হয় তোকে। বিশ্বভারতীকে আমি বড় করতে চাই নি, আর সবাই চায় বড় করতে। তুই আর কি করবি বল?'

নানা কারণে রবীন্দ্রনাথকে অনেক জিনিস সহ্য করতে হয়েছে। যা তিনি চান নি সে জিনিস তিনি সবলে উৎপাটন করার চেষ্টা করেন নি বা করতে পারেন নি। এইজন্যেই দেখা যায় যে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। তাঁর এই উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে যেসব আগাছা গজিয়েছিল সেইগুলি মহীরূহ হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর।

সম্ভবত ১৯৪০ সালে অতুল বোস শান্তিনিকেতন থেকে আমন্ত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি আঁকতে আসেন। প্রতিকৃতি শেষ হয়েছে শুনে আমি গিয়েছি ছবি দেখতে। মনোযোগ দিয়ে ছবি দেখছি, এমন সময় পেছন দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের

-গলা শুনলাম। মুখ ফিরিয়ে দেখি রবীন্দ্রনাথ আমার পেছনে দাঁড়িয়ে। স্নান করে ফিরছেন—সাদা চুল দাড়ি, গায়ে সাদা জোব্বা, হাত দু'খানা পেছন দিকে রাখা, হাতে বড় তোয়ালে। সিমেন্টের লাল মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে। তখন তিনি সামনের দিকে একটু ঝুঁকেছেন। তিনি বললেন, 'দ্যাখ্ তো ওই ছবি কি আমার মতো হয়েছে?' শুভ্র আলোর মতো রবীন্দ্রনাথ লাল মেঝের ওপর দিয়ে আমার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আর একবার তাকালাম অতুল বোসের করা প্রতিকৃতির দিকে। মনে মনে আমাকে স্বীকার করতেই হল যে রবীন্দ্রনাথের মুখেচোখে, তখনো যে উজ্জ্বলতার প্রকাশ, এই প্রতিকৃতিতে তা নেই।

এ বিষয়ে অতুল বোসকে যখন প্রশ্ন করলাম তখন তিনি বললেন, 'কি করব বলুন, স্টুডিওর মধ্যে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেই আমি কিরকম নার্ভাস হয়ে যাই। তাছাড়া তাঁর খেয়ালেরও অন্ত ছিল না। কাজ বেশ কিছু অগ্রসর হয়েছে, এমন সময় একদিন আমাকে বললেন, তুমি কি করছ খুটখুট ক'রে? ছবির পেছনটা লাল ক'রে দাও আর জোব্বা কালো ক'রে দাও। বললাম তাহলে আপনাকে কালো জোব্বা পরতে হয়। রবীন্দ্রনাথ উত্তেজিত হয়ে বললেন, তুমি আর্টিস্ট, একটা কালো জোব্বা মন থেকে করতে পারবে না? অতটা কালো রঙ পড়তেই সব ছবির লাইট অ্যারেন্জমেন্ট বদলে গেল। কি করব বলুন? পোরট্রেট করেছি অনেক, কিন্তু এরকম সমস্যায় আমি কখনো পড়ি নি।' অতুল বোসের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল বলেই তাঁকে এরকম ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে সাহস করেছি। আর অন্য কেউ আমার প্রশ্নের এরকম খোলা জবাব দিতেন না। অতুল বোস সত্যিই সরল লোক ছিলেন। নিজের দুর্বলতা বা নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বলতে তাঁকে কখনো আমি সংকোচ করতে দেখি নি।

১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে রথীন্দ্রনাথ হলেন বিশ্বভারতীর কর্ণধার। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে সারা বিশ্বভারতী জুড়ে একরকমের রক্ষণশীলতা দেখা দেয়। নন্দলাল সম্পূর্ণ স্বাধীন থেকেও কলাভবনকে রক্ষণশীলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চললেন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে। কলাভবনের এই রক্ষণশীল আবহাওয়ার মধ্যে আমি কলাভবনের এক ছাত্রীকে বিবাহ করি। বিবাহের সময় আমার বয়স ৪০-এর কাছাকাছি।

বিবাহের কথা উঠলেই ছোটবড় কোনো না কোনোরকমের প্রীতিভোজের কথা চলে আসে। আমার চীনে বন্ধু অধ্যাপক উ এবং তাঁর পত্নী প্রীতিভোজের এক অনুষ্ঠান করেছিলেন চীনা পদ্ধতিতে। অধ্যাপক উ চীনা-ভবনে ভারতীয় নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন এবং শ্রীমতী উ বাংলা শিখছিলেন। অধ্যাপক উ বেশ ভাল রান্না করতে পারেন। এই নৈশভোজে তাঁকে একজন বিচক্ষণ সূপকার ব'লে চিনলাম। তিনি নিজ হাতেই এইসব রান্না করেছিলেন। বহু প্রকারের রান্না, অবশ্য বাঙালিদের মতো যদি মশলা বাটা, ফোড়ন দেওয়ার ব্যবস্থা থাকত, তাহলে তিনি এতরকমের রান্না একা হাতে করতে পারতেন না। চীনা রান্না কতকগুলো হয় জলে সেদ্ধ কতকগুলো হয় ভাপে সেদ্ধ! তেলে রান্না তরকারি ও ভাজা চীন দেশে অজানা নয়। এইসব রান্নার একটি বিশেষত্ব এই যে তরকারি বা মাছের স্বাভাবিক রং প্রায় অবিকৃত থাকে। কাজেই ভোজের টেবিলে রঙের বৈচিত্র্য থাকে যথেষ্ট। বিশেষ প্রয়োজনে হলুদের ব্যবহার দেখা যায়। বিভিন্ন রকমের সস্ নুন-মিষ্টির মতো প্রায় সকল রান্নাতে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। অধ্যাপক উ নিমন্ত্রণে প্রায় সকল রকমের রান্নারই নমুনা তৈরি করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন যে এই রান্না করতে আমার বন্ধু প্রায় দু'দিন খেটেছিলেন। রন্ধনবিদ্যাকে শিল্পকলার মর্যাদা দেওয়ার রীতি পৃথিবীর সকল দেশের লোকেই স্বীকার করেছে। তাই চীন দেশের রন্ধনশিল্প সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম।

চৈনিক সৌন্দর্যশাস্ত্র সম্বন্ধে উ-র কাছ থেকে আমি বহু সাহায্য পেয়েছি। চীনা ভাষায় লেখা পুস্তক থেকে তিনি অনেক অংশ আমায় অনুবাদ ক'রে শুনিয়েছেন। চীনা কাব্যবিচার সম্বন্ধে কতকগুলি সূত্র উ-র কাছ থেকে আমি প্রথম জানতে পারি। তাও-পন্থী ও কন্‌ফ্যুশাস-পন্থী পণ্ডিতরা এই বিষয়ে বহু ব্যাখ্যা বিচার করেছেন এই কাব্যবিচারের কয়েকটি সূত্র সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করছি। যথা : রসের গভীরতা বোঝাতে গিয়ে সূত্রকার বলছেন কুয়োর মধ্যে যদি একটি পাথর ফেলে দেওয়া যায় তবে জলে একরকমের শব্দ জাগিয়ে পাথর তলায় চলে যায়, তখন আর পাথর দেখা যায় না! সেইরকম সার্থক কাব্য অর্থপূর্ণ বাক্যের ধ্বনি জাগিয়ে রসের জগতে অদৃশ্য হয়। Tragedy সম্বন্ধে সূত্রকার দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন : যোদ্ধা বৃদ্ধবয়সে বসে বসে তলোয়ারের মরচে পরিষ্কার করছে। রসের বিকৃতরূপ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দিয়ে সূত্রকার বলছেন : আকাশে চাঁদ, পাহাড়, ফুলের গাছ, নদী বয়ে চলেছে, গাছের তলায় যুবক বাঁশি বাজাচ্ছে—এ হল অনেকগুলি সুন্দর জিনিস সাজিয়ে অসুন্দরের সৃষ্টি। জলের

পাত্রে মুক্তাফল রেখে দিলে যেমন মুক্তাতে একরকমের মৃদুগতি সঞ্চারিত হয়, কিন্তু জলের পাত্র থেকে মুক্তা বেরিয়ে যায় না, তেমনি সার্থক কাব্য যুগপৎ সীমিত ও চঞ্চল, ইত্যাদি। সূত্র আলোচনা কালে শ্রীমতী উ চীনা সাহিত্য থেকে নানারকম দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতেন এবং তাও-পন্থী ও কন্‌ফ্যুশাস-পন্থীদের দৃষ্টিতে এক-এক কবিতার ব্যাখ্যা কিরকম বদলে যেতে পারে সে সম্বন্ধেও আলোচনা হতো। প্রায় সময়ই তাও-পন্থী ব্যাখ্যাকেই আমি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতাম।

শ্রীমতী উ পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের ছাত্রী। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বুঝতে তাঁর খুবই অসুবিধা হতো। প্রথমত কবিতাগুলি তাঁর কাছে অত্যন্ত দীর্ঘ বলে মনে হতো, দ্বিতীয়ত কবিতাগুলির দার্শনিক তত্ত্ব তিনি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারতেন না। যেসময় অধ্যাপক উ-র সঙ্গে আমি চৈনিক সৌন্দর্যশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা-করছিলাম সেই সময় চীনদেশের বিখ্যাত চিত্রকর Jupeon-চীনা-ভবনে অতিথিরূপে বাস করছিলেন। তিনি প্যারিসে সাত বছর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং চীনা পদ্ধতিতে কাজ করারও তাঁর দক্ষতা ছিল। অত্যন্ত ব্যস্ত লোক, তাঁর সঙ্গে আলাপের সুযোগ একবারই আমি পেয়েছি। Jupeon-র কাছে চৈনিক শিল্পশাস্ত্রের কথা উত্থাপন করতেই তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে জুতোসুদ্ধ পা সামনের দিকে ছুঁড়ে বললেন, 'চীনদেশের সর্বনাশ করেছে এসব শাস্ত্র, একে লাথি মেরে দেশ থেকে বের ক'রে দাও। একদল আর্টিস্ট ঘরের মধ্যে বসে বসে শিল্প-শাস্ত্রের পাতা ওল্টায় আর শাস্ত্রমতো গাছের কোনদিকে দুটো ডাল, কোনদিকে একটা ডাল, তারই আইন অনুসন্ধান করে, বাইরের দিকে তাকায় না।'—সাংহাই-এর সরকারী প্রদর্শনী যদি পূর্বে আমার দেখা না থাকত তাহলে Jupeon-র এই যুক্তিকে অতিরঞ্জিত মনে হতো। অবশ্য তাং-পরম্পরা সম্বন্ধে Jupeon-র বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, তিনি বলতেন তাং যুগের ঐতিহ্যকে আমি আবার ফিরিয়ে আনতে চাই, সেইজন্যেই আমি এত পরিশ্রম করছি। আজ পর্যন্ত বুঝতে পারি নি প্যারিসে শিক্ষাপ্রাপ্ত তৈলচিত্রকর Jupeon কি ক'রে তাং যুগের ঐতিহ্যকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনবেন!

যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে কলাভবনের পরিবেশ আমার কাছে কিছু পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। একটা বড় কাজ হাতে নেবার কোনো সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না, সেইটাই ছিল প্রধান দুঃখ। একদিন রামকিংকর বললেন, 'আসুন

একটা বড় কাজে হাত দেওয়া যাক।' হিন্দি-ভবনের দেওয়াল খালি রয়েছে। হিন্দি-ভবনের অধ্যক্ষ হাজারিপ্রসাদের অনুমতি পেতে অসুবিধে হল না, অসুবিধে হল নন্দলালের কাছে অনুমতি পেতে। নন্দলালের কাছে যখন হিন্দি-ভবনের কথা উত্থাপন করলাম, তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'না, ওখানে কাজ হবে না।' জীবনে এই প্রথম তিনি আমার কাজে বাধা দিলেন, আমিও প্রথম তাঁর কথা উপেক্ষা করলাম।

এর পরেই হিন্দি-ভবনের কাজ আমি শুরু করি। এই সময় আমার পুরাতন শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ করের সহানুভূতি ও সাহায্য না পেলে হিন্দি-ভবনের কাজ করা বোধহয় সম্ভব হতো না। তিনি স্কুল থেকে বাঁশ টিন দিয়ে আমার জন্য ভারা তৈরি করিয়ে দিলেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে। ভারা কিরকম বাঁধা হল দেখতে গেছি, সুন্দর ভারা—চার দেয়ালেই ভারা বাঁধা হয়েছে। পেছনে মোটা বাঁশের রেলিং, পড়ে যাওয়ার ভয় নেই। আমার সহকারী জিতেন্দ্রকুমার মই বেয়ে উঠে চারিদিকে হেঁটে হেঁটে বললেন, 'বেশ পোক্ত কাজ, আপনিও ওপরে উঠে আসুন।' মই বেয়ে প্রায় যখন ভারার কাছে পৌঁছেছি, এমন সময় মই পিছলে গেল, নিচে আমার স্ত্রী ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি আমাকে ধরে ফেললেন। গুরুতর আঘাত থেকে সেদিন রক্ষা পেলাম। বললাম, 'শুভকর্মে বাধা, আজ থাক, কাজ কাল শুরু হবে।'

দেওয়ালে বালির আস্তর ছড়ানো, দেওয়াল ভেজানোর কাজ সহকারীরা করছেন, আমি ঘুরছি চুনবালি সংগ্রহের জন্য। চুন ভেজানোর সময় দইএর দরকার হয়। রান্নাঘর থেকে দইএরও ব্যবস্থা হয়েছে। পাথুরে চুন এলো, চুনে জল ছিটিয়ে পাথুরে চুন ভাঙা হল। তারপর চুন থেকে পাথর বা মরা চুনের দলা বাছাই ক'রে বড় বড় দুই গামলায় চুন ভেজানো হল, দই দেওয়া হল। এরপর দেওয়াল ভেজানোর কাজ। এ কাজে মেহনত আছে যেমন, তেমনি সময়ও লাগে প্রচুর। এইভাবে কয়দিন রাজমিস্ত্রির মতো কাজ করি। এইবার প্লাস্টার তৈরির পালা। আমি সকাল ৯টা পর্যন্ত কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের কাজ দেখিয়ে দিয়ে চলে আসি হিন্দি-ভবনে, তারপর প্লাস্টার লাগানো হয়। দক্ষিণ দেওয়ালের কোণ থেকে কাজ শুরু হল। কয়েক ফুট কাজ করার পরই বোঝা গেল যে পূবদিকের দেওয়ালে কলাভবনের ছাত্র কৃপাল সিংএর যে ছবিটি আছে, সেটি অত্যন্ত খাপছাড়া লাগবে। শেষপর্যন্ত ছবিটির ধারে ধারে কতকগুলি relief-এর কাজ ক'রে সমস্ত ছবি অলংকরণের পর্যায়ভুক্ত করার চেষ্টা করি। relief-এর কাজ করেছিলেন জিতেন্দ্রকুমার ও লীলা। পরিকল্পনা
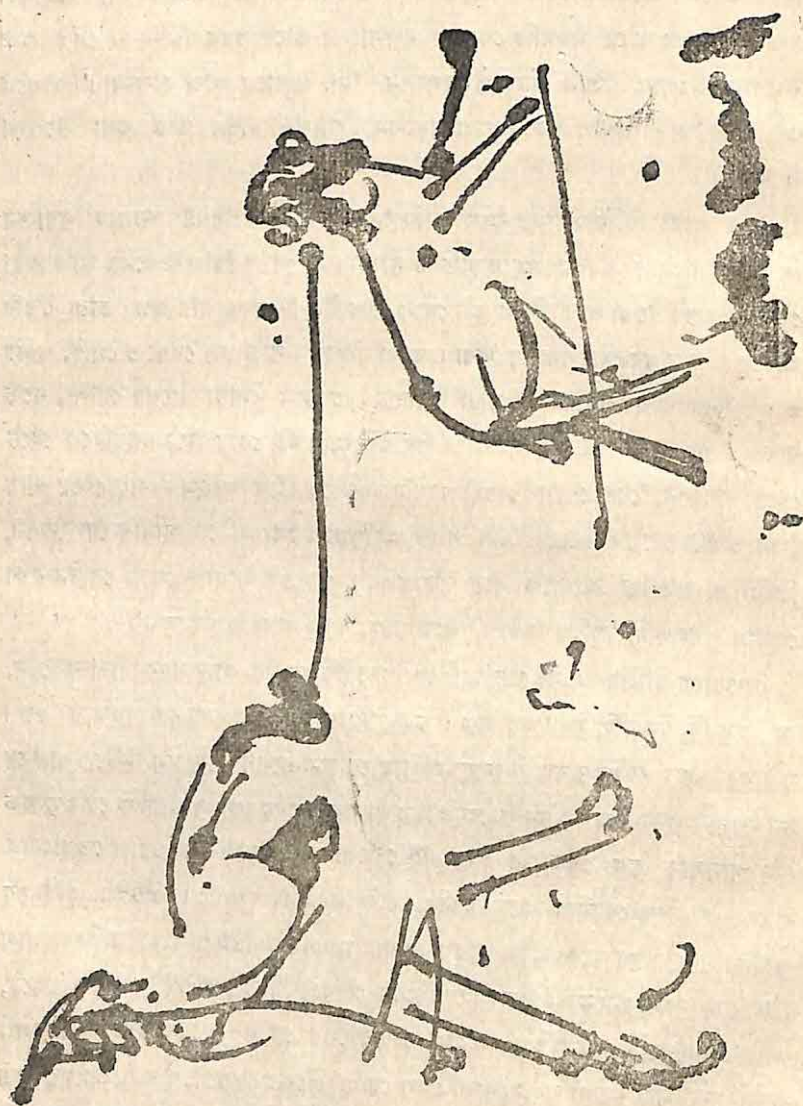
অনুযায়ী কাজ হল বটে কিন্তু সমস্ত পুবদিকের দেওয়ালে ছবি মানিয়ে নেওয়া যাবে না।

যাই হোক, দক্ষিণ দিকের অর্ধেক হবার পর জিতেন্দ্রকুমার ও লীলাকে শান্তিনিকেতন থেকে চলে যেতে হয়। লীলা গেলেন করাচিতে তাঁর মায়ের কাছে, জিতেন্দ্রকুমার গেলেন নাজিবাবাদে। পরিবর্তে এলেন স্থুব্রমণ্যম ও দেবকীনন্দন। ভিজে আস্তরের ওপর কাজের সময় সহকারীদের কাজ প্রায়ই থাকে না। সহকারীদের কাজ হল দেওয়াল ভেজানো, আস্তর লাগানো, রং তুলে হাতের কাছে এগিয়ে দেওয়া, অর্থাৎ কুলির কাজ। কোনো শিক্ষিত চিত্রকরের পক্ষে দিনের পর দিন এই একঘেয়ে কাজ করা সহজ নয়। কিছু নিজে কাজ করবার ইচ্ছা হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু আমার এই দুই সহকারীর ধৈর্য ছিল অসীম। তারপর ধৈর্যের পরীক্ষা হতো যখন সারাদিন পরিশ্রম করার পর, পরের দিন এসে বলতাম যে কালকের কাজটা চেঁছে ফেল, নতুন ক'রে প্লাস্টার লাগাও আর একবার। একটি প্রশ্নও না ক'রে মনি বা দেবকী ভারায় উঠে গিয়ে দেওয়াল চাঁছতে শুরু করতেন। এক বৎসরের মধ্যে কোনোদিন তাঁদের আমি বিরক্ত হতে দেখি নি। দেবকীনন্দনের ধৈর্য ছিল আর একরকমের। একদিন তিনি ভারা থেকে পড়ে গেলেন, তাঁর পরনের কাপড় বাঁশের খোঁচায় আটকে গিয়েছিল, ধীরে ধীরে তিনি ঝুলতে ঝুলতে নিচে পড়লেন। মুখে কোনো শব্দ নেই, আমি বলছি, 'মনি দেখ, দেবকী অজ্ঞান হল নাকি?' দেবকী বললেন, 'না কিছু হয় নি, কেবল কাপড়টা ছিঁড়েছে।' আবার ভারার ওপর উঠে এসে তাঁর যা কাজ তা শুরু করলেন। যখন পশ্চিমদিকের দেওয়ালে কাজ করছি, সেই সময় দেবকীনন্দনও চলে গেলেন। রইলাম আমি ও মনি। ছবির অংশে সহকারীরা কিছু কাজ করেছিলেন কিনা আজ আমার মনে নেই, তবে ঘোড়ার ছবিতে স্থুব্রমণ্যমের যথেষ্ট হাত আছে বলে আমার মনে হয়। কাজ শেষ হয়েছে, নাম লেখা বাকি। ভারার ওপর ঘুরে ঘুরে দেখছি যে কোথাও কিছু করবার আছে কিনা, কোনো অংশ নতুন ক'রে করবার প্রয়োজন কি না, এমন সময় টিনের একটা অংশ ভেঙে গিয়ে আমার পা নিচের দিকে ঝুলে পড়ল। মনি ভারার উপরেই ছিল, সে ভারা পরীক্ষা ক'রে বলল, 'টিনের অনেক অংশই অকেজো হয়ে গেছে, এর ওপর দাঁড়িয়ে কাজ না করাই এখন ভাল।' নিচে নেমে এলাম, সই-করা আর হল না। বললাম, 'এইবার ভারা খুলে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে কিরকম হল কাজটি।' মনি বলল, 'না, এখুনি খুলে ফেলুন।' ত্বরিৎ গতিতে মনি ভারা

খুলে ফেলল, নিচে থেকে সব ছবি আমি ভাল ক'রে দেখতে পাই না, মনি ঘুরে ঘুরে দেখে বলল, 'না, করবার আর কিছু ছিল না। এইবার চলুন একটু চা খাওয়া যাক।'

হিন্দি-ভবনের কাজ শেষ হল, সেই সঙ্গে আমার ভাগ্যচক্রও বদলে গেল। কিছুকাল শান্তিনিকেতনের বাইরে থাকা স্থির করলাম এবং আমার দাদার বন্ধু নরেন্দ্রমণি আচার্যকে নেপালে লিখলাম, যদি তিনি আমায় একখানা নেপাল প্রবেশের অনুমতিপত্র যোগাড় ক'রে দিতে পারেন। তিনি তখন নেপাল সরকারের বৈদেশিক সচিব। এই চিঠির জবাবে নেপালের শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে এক পত্র পেলাম যে শিক্ষা বিভাগ আমাকে নেপালের কিউরেটরের পদ দিতে প্রস্তুত। চাকরির সমস্ত শর্ত পত্রেই দেওয়া ছিল। শিক্ষামন্ত্রীকে আমি আমার সম্মতি জানিয়ে দিলাম ও কলাভবনের অধ্যক্ষের কাছে ত্যাগপত্র দাখিল করলাম। আমি যখন ত্যাগপত্র দাখিল করি, সেই সময়ে লীলা মিরাটে চাকরি করছেন। সংবাদ পেয়ে লীলা মিরাট থেকে শান্তিনিকেতনে এলেন। নেপালের চাকরির শর্ত দেখলেন, তারপর তিনি ফিরে গেলেন তাঁর কর্মস্থলে। আমিও সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস দুই বন্ধুর কাছে রেখে এক সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের মায়া কাটিয়ে নেপাল রওনা হলাম।

এখন ভারতবর্ষের যে কোনো স্থান থেকে উড়োজাহাজে নেপালে যাওয়া যায়। কিন্তু আমি গিয়েছিলাম পাহাড়ে ঘেরা দুর্গম পথে। এই পথের কিছু কিছু পরিচয় হয়ত আমার স্কেচ-খাতায় আছে। স্মৃতি এমনই ঝাপসা হয়ে এসেছে যে পথের বিস্তারিত বর্ণনা দেবার উপায় নেই। কেবলই মনে হয় হিমালয় পর্বতের বিস্ময়কর গাম্ভীর্যের কথা। অহংকারের বাষ্পে স্ফীত মানুষ যে কত অকিঞ্চিৎকর, কত ছোট, কত অসহায়—সেকথাই বারম্বার মনে হয়েছে পথ চলতে চলতে। এই পথের প্রভাবে অতীতের স্মৃতি বেশ ঝাপসা হয়ে আসছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তামদান ঘাড়ে নিয়ে কুলিরা আমাকে পৌছে দিল চিসাগড়ির সরকারী অতিথি-শালায়। পরের দিন সকালে যাত্রা ক'রে কুলিখানির উত্তম মাছভাত খেয়ে কুলিরা এসে আর একবার থামল চন্দ্রগিরি পাহাড়ের সামনে। চন্দ্রগিরি পাহাড় অতিক্রম ক'রে বিকেলের দিকে এসে পৌছলাম থানকোটে। থানকোটের সমতলভূমিতে তামদান থামিয়ে কুলিরা সমবেতস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'জয় পশুপতিনাথ'।

থানকোট হল কাঠমাণ্ডুর প্রবেশদ্বার। এখানে মিউজিয়মের দু'জন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাই জিনিসপত্রের ব্যবস্থা ক'রে আমাকে বাসে ক'রে নিয়ে চললেন কাঠমাণ্ডু শহরের দিকে। একখানা তেতলা বাড়ির সামনে যখন বাস এসে থামল, তখন রাস্তায় বাতি জলছে। মিউজিয়মের সুব্বা আমার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। তিনি আমাকে সযত্নে বাস থেকে নামিয়ে বললেন, 'এই তেতলা বাড়িতে আপনার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। ওপরে চলুন, জিনিসপত্রের ব্যবস্থা আমরাই করছি।' সে রাত্রের আহার সুব্বার বাড়ি থেকেই এসেছিল। মাংস, কয়েকরকমের সব্জি, আর থালাভরা পরিষ্কার শুকনো পাতলা চিঁড়ে। রাত্রে দু'জন বেয়ারা আমার কাছে মোতায়েন ক'রে দিয়ে সুব্বা বিদায় নিল। বেয়ারা দু'জন কাজকর্মে বেশ পটু, একটু নড়াচড়া করলেই জিজ্ঞাসা করে, 'হুজুর কি চাই ?' তামদানে বসে বসে শরীর ব্যথা হয়ে গেছে, কাজেই বিছানায় শুয়ে নিদ্রার কোনো অসুবিধা হয় নি।

সকালবেলা চা খাচ্ছি, এমন সময় দেখি খোলা দরজার সামনে ছাইরঙের নেপালি পোশাক পরা বেঁটেখাটো এক ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে শুদ্ধ বাংলায় বললেন, 'ভেতরে আসতে পারি ?' বললাম, 'অবশ্য, অবশ্য, ভেতরে আসুন।' তিনি কথা শুরু করলেন, বললেন, 'কাল রাত্রে সুব্বার কাছ থেকে জানলাম, আপনি এখানে এসেছেন, তাই দেখা করতে এলাম।' বললাম, আপনি এমন পরিষ্কার বাংলা শিখলেন কোথায় ?' আজ্ঞে আমি যে কলকাতা আর্টস্কুলের ছাত্র। তাই আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভাল লাগল। আমার নাম চন্দ্রমান মাস্‌কে। এখানে অনেকেই আমাকে মাস্টার সাহেব বলে।' কথা জমাতে মাস্‌কে বেশ দক্ষ। দেখলাম চা খেতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। চায়ে চুমুক দেন আর বলেন, 'বেশ চা।' কথার পিঠে কথা জুড়ে দিতে চন্দ্রমানের অসাধারণ প্রতিভা। আমায় কথা কইবার অবসর না দিয়েই তিনি বলে যান, 'বাগবাজারের রসগোল্লা, দিলখুশ কেবিনের মাংস, গিরীশের চপ, ভীমনাগের সন্দেশ ..' আর থেকে থেকেই বলেন, 'মশাই কলকাতার খাবার আর মিষ্টি খুব সুন্দর। এখানে ওরকম খাবার আপনি পাবেন না।' জিজ্ঞাসা করি, 'কতদিন আপনি কলকাতা ছেড়েছেন ?' 'আজ্ঞে দশ বছর আগে, তারপর আর আমি কলকাতা যাই নি। বাংলা কথা কইবার লোকও এখানে নেই। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বড় ভাল লাগল।' ভাবছি চন্দ্রমানের কথা ফুরোলে হয়। কিন্তু অফুরন্ত তার কথার ভাণ্ডার। চন্দ্রমান বলে, 'আপনার বাড়িতে চা খেলাম, আমার বাড়িতেও একদিন আসবেন। আমাকে বন্ধু বলে যদি গ্রহণ করেন, তবে নিজেকে

আমি সৌভাগ্যবান মনে করব।' বললাম, 'নিশ্চয় আপনার বাড়ি যাব। আমারও সৌভাগ্য যে নেপালে পৌঁছতে না পৌঁছতেই আপনার মতো একজন আর্টিস্ট বন্ধু পেলাম।' মাস্‌কে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'আজ আসি। কাঠমাণ্ডু শহর দেখাবার দায়িত্ব আমি নিলাম, তবে মনে রাখবেন, আমার বাড়িতেও আপনাকে একবার আসতে হবে।' চন্দ্রমান মাস্‌কে বিদায় নিলেন।

এ বাড়ির কিছুই দেখা হয় নি তখনো। আমি বেয়ারাকে নিয়ে ঘরদোর দেখতে শুরু করলাম। দোতলার মতো তেতলায় একখানা লম্বা খালি ঘর। পাশে একখানা ছোট কুঠরি, তেতলায় রান্নাঘর। রান্নাঘরের ছাদের নিচে জ্বালানি কাঠ রাখবার জন্য বড় মাচা। একতলায় ছোট উঠোনের এক কোণে প্রাতঃকৃত্যের জায়গা··· যেমন অন্ধকার, তেমনি ছোট। অন্যপাশে একটি ভাঙা কুয়ো, কুয়োর মুখ পাথর বালি দিয়ে বন্ধ। একতলার বড় ঘর তালাবন্ধ, বাড়ির মালিক পাটন-এ থাকে। সরকারের তরফ থেকে বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে মিউজিয়মের নতুন কিউরেটরের জন্য। বেয়ারার কাছে শুনলাম এ বাড়ি নাকি ভূতের উপদ্রবের জন্য বিখ্যাত, সেজন্য এ বাড়িতে কখনো ভাড়াটে আসে না। ইতিমধ্যে মিউজিয়মের সুব্বা উপস্থিত হলেন। তাঁকে আমি বসতে বলি, তিনি কিন্তু বসেন না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলেন। শুনলাম এখন দশহরার ছুটি, মিউজিয়ম বন্ধ, তাই ঘরের উপযুক্তভাবে আসবাবপত্রের ব্যবস্থা হয় নি। শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমার আগমন সংবাদ জানানো হয়েছে, পরের দিন অপরাহ্ণে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছে। যাওয়ার সময় সুব্বা বলে গেলেন, 'প্রয়োজন হলেই আপনি বেয়ারাকে দিয়ে সংবাদ দেবেন।' ইতিমধ্যে দুই বেয়ারা বাক্সগুলোকে ঝাড়পোঁছ ক'রে দেওয়ালের দিকে সাজিয়ে দিয়েছে। এদের কর্মতৎপরতা দেখে খুশি হয়েছিলাম। বাক্স খুলে রং, তুলি, কাগজ টেবিলের ওপর সাজিয়ে নিলাম।

যুদ্ধ সড়কের চওড়া রাস্তা প্রায় জনহীন। নির্জন নিঝুম পরিবেশ। বেয়ারাদের জিজ্ঞেস করি রাস্তায় লোকজন নেই কেন? জবাব পাই যে এখন জুয়ো খেলার সময়, সব সরকারী অফিস ছুটি। তাই পথের লোক চলাচল কমে গেছে। সন্ধ্যার সময় আমার পূর্ব-পরিচিত নরেন্দ্রমণি সুটবুট পরা একজন বাঙালি ভদ্রলোককে নিয়ে উপস্থিত হলেন, নাম সুধীর রায়চৌধুরী। ত্রিচন্দ্র কলেজের প্রাচীনতম বাঙালি অধ্যাপক। নরেন্দ্রমণির পরনে নেপালি পোশাক, মাথায় কালো টুপি, টুপির সামনে সোনার তকমা লাগানো—তাঁর পদমর্যাদার চিহ্ন। একথা-সেকথার মধ্যে নরেন্দ্রমণি

হাসতে হাসতে বললেন, 'জানো, তোমার এখনো চাকরি পাকা হয় নি!' বলি, 'সে কি, আমি তো নিয়োগপত্র পেয়েই এখানে এসেছি।' নরেন্দ্রমণি ও সুধীর রায় মিলিতকণ্ঠে বললেন, 'না, আপনার পাকাপাকি চাকরি এখনো হয় নি। প্রথমে আপনাকে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে হবে, তিনিও আপনার চাকরি পাকা করতে পারবেন না। মহারাজই আপনার চাকরির সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করবেন।' বিদায়ের জন্য দু'জনেই উঠে দাঁড়িয়েছেন, বললাম, 'শেষপর্যন্ত এই চাকরি নিয়ে ফ্যাসাদে পড়ব না তো?' সুধীর রায় বললেন, 'আপনি কিছু ভাববেন না, নেপাল সরকারের এ একটা সাধারণ নিয়ম, যাকে বলে formality।'

পরের দিন অপরাহ্নে সুব্বা আমাকে পৌঁছে দিলেন বাবর-মহলে। শিক্ষামন্ত্রী মৃগেন্দ্র সামশের বেশ সুপুরুষ। কথাবার্তা অত্যন্ত ভদ্র। উচ্চপদস্থ রানাদের ঔদ্ধত্য তাঁর মধ্যে আমি লক্ষ করি নি। মৃগেন্দ্র সামশের আমাকে বললেন, 'এখন আরো সাতদিন ছুটি, আপনি বিশ্রাম করুন। একবার আপনাকে মহারাজার সঙ্গে দেখা করতে হবে, তিনিই আপনাকে নিয়ম অনুযায়ী কাজে নিযুক্ত করবেন, তবে এ হল এখানকার একটা formality। ইতিমধ্যে আপনার যা কিছু প্রয়োজন সুব্বাকে জানাবেন, আসবাবপত্রের ব্যবস্থা হতে একটু বিলম্ব হবে। আজ আর আপনাকে বসিয়ে রাখব না। আমাদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ তো প্রায়ই হবে, কাজেই আপনি এখন ব্যস্ত হবেন না।' হৃষ্টমনে মৃগেন্দ্র সামশেরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

সাতদিন ছুটি, বেয়ারাকে সঙ্গে নিয়ে কাঠমাণ্ডু শহর ঘুরে বেড়াই, রাস্তার দু'ধারে জুয়ো খেলা চলছে। চারদিকে ছোট বড় নানা আকারের স্তূপ, লোকেরা চলেছে স্তূপ প্রদক্ষিণ করতে করতে। চন্দ্রমান আমাকে বেয়ারার হাত থেকে উদ্ধার করলেন, বললেন, 'চলুন আমি আপনাকে চারদিক ঘুরে দেখাব।' চন্দ্রমান কথা বলেন দ্রুতগতিতে, কিন্তু চলেন মন্থর গতিতে। সারা কাঠমাণ্ডু শহরের লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। চন্দ্রমানকে দেখলেই লোকে দাঁড়িয়ে যায়, চন্দ্রমান ভুলে যান আমি সঙ্গে আছি। তিনি তাঁর অভ্যস্ত গতিতে অনর্গল গল্প করে যান। নেওয়ার ভাষায় কথা আমি বুঝি নি, তবে যে রহস্যালাপ চলেছে তা অনুমান করতে পারি। তবে একটা কথা বলতেই হয় যে চন্দ্রমান কাঠমাণ্ডু শহর ভাল করেই চেনেন। কোন মন্দিরে ভাল কাঠের মূর্তি আছে, কোথায় ধাতুমূর্তি আছে, কোথায় প্রসাদ ভাল—সবই চন্দ্রমানের নখদর্পণে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্কেচ করা

যায়, লোকেদের কোনো ঔৎসুক্য নেই। যদি কোনো বালক কি করছি পাশে দাঁড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করে, বয়স্ক লোকেরা বালককে বলে—চিত্রকারী, ওখান থেকে সরে এস।

দিন আমার ভালই কেটে যায়, কিছুটা বাইরে স্কেচ করি, তারপর ঘরে বসে মন থেকে নেপালের জীবনযাত্রার খসড়া বানাই। চন্দ্রমান আমার ঘরে বসে যেসব স্কেচ আমি মন থেকে করি সেগুলো দেখেন, আর তারিফ ক'রে চলেন, 'বেশ হয়েছে মশাই, চমৎকার। বেশ বোঝা যায় আপনি কোন জায়গাটা এঁকেছেন।' 'মশাই' কথাটা চন্দ্রমান কথার ফাঁকে ফাঁকে যত্রতত্র বসিয়ে দেন।

মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে চাকরি পাকা হল, ছুটিও ফুরোল। কাঠমাণ্ডু পৌছবার আট-দশ দিন পরে মিউজিয়ম দেখতে চললাম। আমার বাড়ি থেকে মিউজিয়ম অনেকখানি পথ। মিউজিয়মের নাম 'যুদ্ধ যন্ত্রশালা'—প্রধান সংগ্রহ অস্ত্রশস্ত্র, বন্য মহিষের মাথা, বাঘ ইত্যাদি। ছবি ও মূর্তির সংগ্রহ যা আছে তাও উপযুক্তভাবে সাজানো নয়, জ্ঞাতব্য বিষয়ে কোথাও কিছু লেখা নেই। যেন একটা বিরাট গুদোমঘর। আমার পূর্বের কিউরেটর কিছু শো-কেস করিয়েছিলেন, কাজের উপযুক্ত না হলেও ওগুলি করতে যথেষ্ট খরচ হয়েছিল। বহুসংখ্যক দিনমজুর (পিপা), Gallery-keeper ইত্যাদি নিয়ে লোকসংখ্যা কম নয়। কুলিরা শহরে মূর্তি সাফ করে, বাগান দেখে, মিউজিয়ম ঝাড়ু দেয়। গ্যালারি-রক্ষকদের কাজ দর্শকদের ঘুরিয়ে দেখানো, তবে দর্শকের সংখ্যা এতই কম যে গ্যালারি-রক্ষকদের প্রায় কিছুই করতে হয় না। সবার ওপরে আছেন সুব্বা, তিনিই দেখাশুনা করেন।

আমি নেপালে পৌছেছিলাম পুজোর সময়। শীতের মুখে আমার স্ত্রী ও কলাভবনের এক প্রাক্তন ছাত্র এসে পৌছলেন। এরপর আরো কিছু শিল্পী এসেছেন, গেছেন। মোটকথা, শীতের সময় থেকে আমার বাড়ি বেশ সজীব হয়ে উঠল। নেপালের জীবনযাত্রার মধ্যে নতুনত্বের অভাব নেই। দেখবার অনেক কিছু থাকলেও আধুনিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত যাঁরা তাঁদের জন্য এই স্থান বেশিদিনের জন্যে সুখকর হয় না। কারণ তখনো কাঠমাণ্ডু শহরে সিনেমা-হল তৈরি হয় নি, রেস্তোরাঁ-কফিহাউস নেই, লাইব্রেরি নেই, খবরের কাগজ নেই—গোর্খাপত্র ছাড়া ইংরাজি বা ভারতীয় ভাষায় অন্য কোনো কাগজ পাওয়া যায় না। কাজেই সকলে মিলে স্থির করা হল নেপালে কারিগরির কিছু কাজ শেখা থাক।

ইতিমধ্যে নেপালের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কারিগর কুলসুন্দর শিলাকর্মীর সঙ্গে

আমার পরিচয় হয়েছে। সরকারের সকল রকম কাজ কুলসুন্দর করে এবং রানা পরিবারের পারিবারিক পূজার স্থান তলাজু মন্দিরে কাঠের কাজ কুলসুন্দরের অধীনে হয়ে থাকে। সিলভা লেভি যেসব কাঠের কাজ নেপাল থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন তার প্রায় সবই কুলসুন্দরের হাতে তৈরি। অর্থ সম্বন্ধে কুলসুন্দরের নিস্পৃহতা এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে তুল্য ব্যবহারের যে পরিচয় আমি পেয়েছিলাম তা সচরাচর মেলে না। আর ছিল তাঁর অসাধারণ আত্মসম্মান জ্ঞান। আমি তাঁকে মিউজিয়মে নিয়ে যাবার জন্য অনেকবার পীড়াপীড়ি করি, কুলসুন্দর বলে কারিগরের হাতের জিনিস দেখতে আমি টিকিট কিনে কেন যাব? লিখিতভাবে বিনা-টিকিটে মিউজিয়মে প্রবেশ করবার অধিকার তাকে দিলাম। সে বলে, 'এখানে আরো তো অনেক কারিগর আছে, তাদেরও যদি অনুমতি দেন তবে আমি যাব।'

একদিন সকালবেলা কুলসুন্দরের কারখানায় দেখা করতে গেলাম, বললাম, 'আমার স্ত্রী ও আমার এই ছাত্র আপনার কাছে পাথর কাটা ও কাঠের মূর্তি করা শিখতে চান।' কুলসুন্দরের ঘরের বাইরে রাস্তার ওপর মেয়েরা জল দিয়ে পাথর ঘষছে, অন্যান্য কারিগররা ছোটখাটো কাজ করছে। কুলসুন্দর বসে বসে পাঁজি দেখছেন, তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, আমি শেখাব। কিন্তু এই রাস্তার ওপর, চট পেতে বসে কাজ করতে হবে।' বললাম, 'আপনি যেমন বলেন, সেইরকমই হবে।' দক্ষিণার কথা উঠতেই কুলসুন্দর হেসে বললেন, 'এখনো তো কাজ শেখা হয় নি, কাজ শেখা হোক, তারপর দক্ষিণার কথা হবে। কাল থেকে তোমরা আসবে।' কুলসুন্দরও অশুভ দিনের অজুহাত দিয়ে আমার স্ত্রীকে ও অন্যান্য যাঁরা ছিলেন ফিরিয়ে দিলেন। আবার আমি গেলাম, কুলসুন্দর বললেন যে কাল থেকে তিনি কাজ শুরু করবেন। পরের দিন কুলসুন্দর ছাত্রছাত্রীদের গ্রহণ করলেন। অবশ্য তিনি তাদের রাস্তার ওপর বসান নি, দোতলায় তাদের কাজের স্থান ক'রে দিয়েছিলেন। বললেন, 'আমি পরীক্ষা ক'রে দেখলাম যে তোমরা কাজ করতে প্রস্তুত আছ কিনা।'

গদা হাতে ভীমসেনের মূর্তি দিয়ে কাজ শুরু হল। ভীমসেন হলেন নেপালের বণিক সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান দেবতা। অনেকটা আমাদের দেশে গণপতির যে স্থান। ভীমসেনের মূর্তি নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়। কাজেই ভীমসেনের মূর্তির চাহিদা প্রচুর।

এইবার কুলসুন্দরের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে হয়। আইন অনুসারে ভীমসেনের মূর্তিতে চোখ খোলা থাকবে। কিন্তু ভুলক্রমে ছাত্ররা ভীমসেনের

চোখ নিচের দিকে তাকানো করেছে বলে অন্যান্য কারিগররা বলল, 'মূর্তি তো অশুভ হল।' তখন কুলসুন্দর বললেন, 'তা হোক, দুটো চোখ একরকম হলেই বিশ্বকর্মা খুশি হবেন, তাহলেই চলবে।' ছাত্ররা যখন কাজ করে, কুলসুন্দর তখন তাদের দিকে পিঠ ক'রে বসে তামাক খান, আর থেকে থেকে বলেন, 'ঠিক নহী হুয়া, হাতিয়ার ঠিক নহী ব্যাঠতা।' একজন ছাত্র জবাব দিলেন যে হাতে ব্যথা হয়ে গেছে, তাই যন্ত্র পিছলে যাচ্ছে। কুলসুন্দর বললেন, 'হাত নহি হিলতা, দিল হিলতা।' দিল ঠিক কর, তাহলেই হাত চলবে। একদিন শুনলাম কুলসুন্দর তাঁর ছাত্রছাত্রীদের আমার দেওয়া অনুমতিপত্র দেখিয়ে গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন যে স্বয়ং হাকিম আমার কাছে এসে এই হুকুম দিয়ে গেছে, তবু আমি যাই নি।

নেপালে বহু উত্তম কারিগর তখন ছিল, কিন্তু এইরকম ব্যক্তিত্ব আমি আর কোনো কারিগরের মধ্যে দেখি নি। মধ্যযুগীয় কারিগর সম্বন্ধে আমার ধারণা তিনি সম্পূর্ণ বদলে দিতে পেরেছিলেন। কুলসুন্দর পরম্পরাগত কারিগর হলেও শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করার সাহস তাঁর ছিল। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু নিতাইবিনোদ গোস্বামী একটি 'শক্তি-সহিত' বুদ্ধ চেয়েছিলেন। একেবারেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা। কুলসুন্দর যখন জানলেন যে যিনি মূর্তি চেয়েছেন তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রে পণ্ডিত, তখন মূর্তি ক'রে দিতে রাজি হলেন। তাঁর পুত্র ও অন্যান্য সহকারীরা যখন জানলেন যে এই শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ কারখানায় হবে, তখন তাঁরা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কুলসুন্দর বললেন, 'যদি কেউ এই মূর্তি কল্পনা ক'রে থাকে তবে সেই মূর্তিকে পূজার উপযুক্ত ক'রে গড়ে দেওয়াই কারিগরের কাজ।' এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি তৎকালীন চিত্রকর ও পাটনের ঢালাই কাজের কারিগরদের মধ্যে আমি লক্ষ করি নি।

নেপালের কারিগর ও সাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করবার যতটা সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, সে তুলনায় রানাদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ আমার ছিল না এবং সে বিষয়ে বিশেষ কোনো চেষ্টাও আমি করি নি। শিক্ষামন্ত্রী মৃগেন্দ্র সামশেরের সঙ্গে ছিল আমার সম্পর্ক। আর আমি চেষ্টা ক'রে পরিচয় করেছিলাম নেপালের তৎ-কালীন গভর্নর কেইসর সামশেরের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে আমি তাঁর লাইব্রেরি ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছিলাম। কেইসর সামশের খুশি হয়েই আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সময় আমাকে বলে দিলেন। বললেন, 'নিজে আমি তোমাকে লাইব্রেরি দেখাব, আমার লাইব্রেরিতে অনেক বাংলা বইও আছে।'
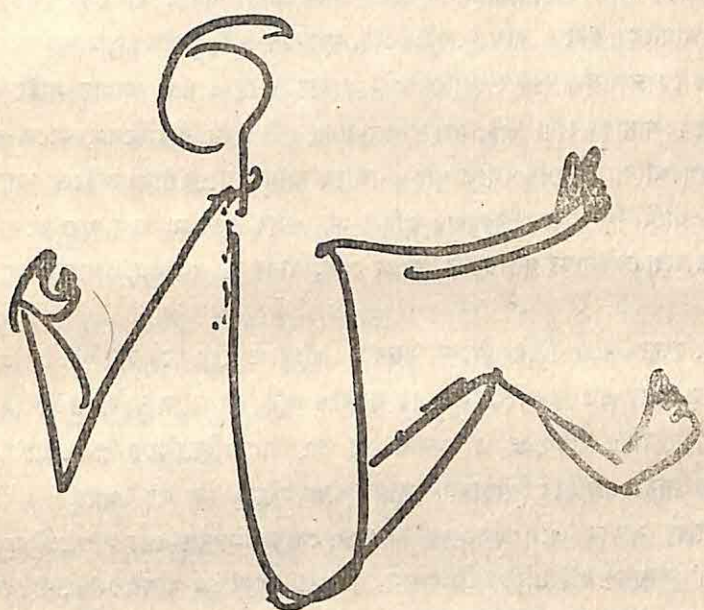
দু-একদিন পরে নির্ধারিত সময়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হলাম। দেখি কেইসর সামশের গাড়ি-বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে আছেন—পায়ে চামড়ার লেগিং, গায়ে নেপালি চাদর। হাতে দু'খানা কাগজ। আমি যথাবিহিত নমস্কার ক'রে লাইব্রেরি দেখার কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিতেই তিনি সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'তোমরা কি মনে করেছ, I am on your beck and call, যা হুকুম করবে, তাই আমাকে করতে হবে ? কমা নেই, ফুল-স্টপ নেই, কেইসর সামশের তর্জন-গর্জন ক'রে চলেছেন, 'ওই ছাখো লোকটা আমার কাছে এসেছে, আমার সাইকেল সে চায়। আমার বাবা এই সাইকেল আমাকে উপহার দিয়েছিলেন, তাকে এই সাইকেল আমি কেন দেব বলতে পার ? লোকে আমার কাছে টাকা চাইতে আসে কেন, আমি কি স্থদের কারবার করি ? না, ওসব হবে না বলে দাও ওকে।' মুহূর্তের মধ্যে কেইসরের গলার স্বর বদলে গেল, ধীরকণ্ঠে বললেন, আমার সঙ্গে এস।

ড্রইং-রুমের মধ্যে দিয়ে তাঁকে অনুসরণ ক'রে ওপরের ঘরে উপস্থিত হলাম। কাঠমাণ্ডু শহরে এতবড় লাইব্রেরি দেখব কল্পনাও করি নি। বাংলার সমস্ত ক্লাসিক বই—রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য বহু গ্রন্থ তাঁর লাইব্রেরিতে স্থান পেয়েছে। কেইসর আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, কোন আলমারিতে কি বই আছে। একটা আলমারির সামনে এসে বললেন, 'এখানে নেপাল সম্বন্ধে প্রায় সব গ্রন্থই তুমি পাবে।' তারপর লাইব্রেরিয়ানকে বললেন আলমারি খুলতে। যথেষ্ট মোটা, বাঁধানো টাইপ-করা দু'খণ্ড বই বের ক'রে বললেন, 'লেভির নেপাল গ্রন্থের আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদ। প্যারিসের অ্যাকাডেমি থেকে আমি আনিয়েছি, এই বই নিয়ে যাও, তারপরে প্রয়োজনমতো তুমি বই নেবে।' নিজে হাতে খাতায় বইয়ের নম্বর ও নাম লিখলেন। বই হাতে দিয়ে বললেন, 'এই বই আর কাউকে দেবে না।'

বছর ঘুরে গেছে, যে দু'জন আমার সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরাও দেশে ফিরে গেছেন। পরিবর্তে ঋতেন মজুমদার তখন আমাদের কাছে নেপালে এসেছেন শান্তিনিকেতনের ডিপ্লোমা পরীক্ষা দিয়ে। নেপালের উৎসবের পুনরাবৃত্তি দেখছি। এই সময় বিশেষ কোনো উৎসব উপলক্ষে কেইসরের দরবারে যেতে হয়েছিল। আমি সঙ্গে একখানা ছোট জল-রঙের ছবি নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁকে উপহার দেবার জন্য। ছবি হাতে নিয়ে তিনি বললেন, 'কে করেছে ? Good drawing।' তারপর তিনি ছবিখানি টেবিলে রাখা কাঁচের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে আমাকে বললেন, 'আমার ছবির কিছু সংগ্রহ

আছে, যদি চাও তো দেখতে পার।' বললাম, 'বর্তমানে আমার স্ত্রী এখানে আছেন, আর একটি অল্পবয়সী ছাত্রও আছেন। তাঁরা এখানে ছবি আঁকেন ও এখানে একজন কারিগরের কাছে পাথর কাটা শিখছেন। যদি আপনি তাদেরও ছবি দেখবার অনুমতি দেন, তবে আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।'

কেইসরের সংগ্রহালয়ে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, ক্ষিতীন্দ্রনাথের ছবি, রাজপুত ও মোগল পরম্পরার ছবিরও যথেষ্ট নিদর্শন দেখা গেল। আর দেখলাম রবীন্দ্রনাথের করা তিনখানি বড় আকারের দৃশ্যচিত্র। এক ঘর থেকে আর এক ঘর পেরিয়ে যাচ্ছি, কেইসর কোথাও দাঁড়াচ্ছেন না, শেষপর্যন্ত একখানা ঘরে এসে তিনি দাঁড়ালেন, বললেন, 'ওই দ্যাখো লোরা নাইটের আঁকা আমার স্ত্রীর প্রতিকৃতি।' ভাল ক'রে লোরা নাইটের ছবি দেখবার অবসর না দিয়েই কেইসর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'and here is the original।' বলেই তিনি আর এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সুন্দর তরুণী, কিন্তু মুখে উদ্বেগ, কেবলই তিনি ঘন ঘন হাত নেড়ে আমাদের চলে যেতে বলছেন। রানীসাহেবাকে নমস্কার পর্যন্ত করা হল না। খোলা দরজা দিয়ে আমরা বাইরে এলাম। দেখি দেওয়ালের কাছে কেইসর সামশের পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

কেইসর আবার শুরু করলেন তার সংগ্রহ দেখাতে। গোর্খার অধীনে নেপাল রাজ্যের প্রায় সকলরকমের শিল্প-নিদর্শন একসঙ্গে এই প্রথম আমি দেখলাম। এইসব জিনিস সম্বন্ধে জ্ঞান বিশেষজ্ঞের মতো। কেবল একটা জায়গায় তিনি ভুল করেছিলেন, একটা কাঁচামাটির রং-করা ফলককে তিনি পোড়ামাটির কাজের সঙ্গে রেখেছিলেন। আমার মতের সঙ্গে তাঁর মত মিলছে না দেখে আমি বললাম, 'অনুমতি করুন, আপনাকে আমি প্রমাণ দিচ্ছি।' তারপর মাটির উল্টো পিঠে একটা ছুরি দিয়ে আঁচড় কাটতেই কাঁচা মাটি দেখা গেল। কেইসর বললেন, 'তুমি আমার ভুল ভেঙে দিলে, ধন্যবাদ।'

বোধহয় তিন ঘন্টার বেশি আমরা সেদিন কেইসর-মহলে কাটিয়েছিলাম। শুধু দুঃখ রইল এই যে লোরা নাইটের ছবিটা ভাল ক'রে দেখা গেল না, আর রানী-সাহেবাকে সামনে পেয়েও তাঁকে ভাল ক'রে দেখতে পেলাম না।

বিকেলে টেনিস খেলা শেষ করে সুধীর রায় প্রায়ই আসেন আমাদের বাড়িতে। টুপি, ছড়ি সাবধানে টেবিলের ওপর রেখে ডেকচেয়ারে বসেই বলেন, 'বলুন, আজ আপনারা কোথায় গেলেন, কি দেখলেন?' সেইদিন কেইসর-মহলের

অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেকক্ষণ গল্প হল। শেষপর্যন্ত বললাম যে কেইসর-এর মতো অভিজ্ঞ লোক কাঁচামাটির কাজ আর পোড়ামাটির কাজের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেন না কেন বলুন তো? সুধীর রায় একটু হেসে বললেন, 'আপনি যা ভেবেছেন তা বোধহয় ঠিক নয়, ঐসব বিষয়ে তাঁর বেশ টনটনে জ্ঞান আছে। আপনাকে প্রশ্ন ক'রে তিনি শুধু জেনে নিলেন, নতুন কিউরেটরের বিদ্যেবুদ্ধির দৌড় কতটা।' বললাম, 'তাই নাকি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এরকম কাজ কেইসর অনেকবার করেছেন। কিছুই জানেন না এরকম একটা ভান করে কেইসর একবার ত্রিচন্দ্র কলেজের একজন নবাগত অধ্যাপককে নিজের বাগানে ঘুরতে ঘুরতে নানা প্রশ্ন করেন। শেষপর্যন্ত অধ্যাপক যে কিছুই জানেন না এ কথাই কেইসর প্রমাণ ক'রে দেন প্রামাণিক গ্রন্থের সাহায্যে। আপনি বোধহয় জানেন না যে উদ্ভিদ সম্বন্ধে কেইসর-এর জ্ঞান বিশেষজ্ঞদের মতো। আরো অনেক গল্প আছে, কিন্তু আজ আর সময় নেই, আরেকদিন হবে।' বলেই সুধীরবাবু উঠে দাঁড়ালেন। টুপি ও ছড়ি নিয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

সুধীর রায়ের আসা-যাওয়া বা ওঠা-বসা ঘড়ি ধরা। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তিনি কোনোদিন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন কিনা জানতে পারি নি, তবে স্বদেশী যুগের আদর্শকে যে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে করতেন, সেকথা জানতে অসুবিধা হতো না। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য তিনি বেশ কঠিন হতে পারতেন। মাঝে মাঝে বলতেন, 'হুজুরদের পায়ের কাছ থেকে মোহর কুড়িয়ে নেবার জন্য আমি কখনো শিরদাঁড়া ব্যাঁকা করব না। যারা এ কাজ করে তাদের আমি ঘৃণা করি। আপনাদের মধ্যে ওই জিনিসটি আমি এখনো দেখি নি বলে আমি এখানে আসি, গল্প করি।' কুলরত্নম সুধীর রায়ের কাছে পড়েছিলেন, বলতেন, এরকম আদর্শবাদী লোক ভারতীয়দের মধ্যে খুব কম।

নেপালে প্রায় তিন বৎসর ছিলাম, এই তিন বৎসরের মধ্যে কবে কি ঘটেছিল সন-তারিখ মিলিয়ে বলতে পারব না। ঘটনাগুলোর কথাই বলে যাচ্ছি। ইতি-মধ্যে মিউজিয়ম নতুন ক'রে সাজানো হয়েছে। মূর্তি, ছবি ইত্যাদি নিয়ে যারা শীতের প্রাক্কালে নেপালের বাইরে যায়, সেইসব ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথাবার্তা, দরদস্তুর করতে শিখেছি। তারা আমায় খাতির করে, কারণ জিনিসপত্র বাইরে নিয়ে যাওয়ার

ছাড়পত্র আমার কাছ থেকেই তাদের নিতে হয়। এসবের সঙ্গে চোরাব্যবসাও চলত এবং সাত-আটজন চোরাকারবারীর নামের তালিকাও সরকার আমায় দিয়েছিল। অবশ্য এসব চোরাকারবারীর সাক্ষাৎ আমি কখনো পাই নি। ব্যবসায়ীরা কি কি জিনিস বাইরে নিয়ে যেতে চায়, ছাড়পত্রে তার একটা তালিকা থাকত। কিউরেটরের কাজ ছিল যেসব মাল বাইরে যাচ্ছে, সেগুলি পরীক্ষা ক'রে দেখে নেওয়া এবং মিউজিয়মে রাখবার উপযুক্ত জিনিস বাইরে যেতে না দেওয়া। জিনিস আটকানো ব্যবসায়ীরা পছন্দ করতেন না। সেজন্য পাসপোর্ট কিউরেটরের সামনে উপস্থিত করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু টাকা তাঁরা পাসপোর্টের ওপর রাখতেন। সোজা কথায় ঘুষ। এই নিয়ম আমি বন্ধ করি। তাতে অধিকাংশ ব্যবসায়ী খুশি হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বিশেষ একটি ঘটনা মনে পড়ে।

একদিন এক ব্যবসায়ী একটি মধ্যবয়সী সুন্দরী মহিলাকে নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত। সুব্বাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'এই মেয়ে আপনার সঙ্গে দরদস্তুর করবে। এরা হল এইসব ব্যবসায়ীদের উকিল। মহিলার কথাবার্তা বেশ মনে রাখবার মতো। কখনো তিনি হেসে কথা বলছেন, কখনো কারিগরদের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ ক'রে কৃপা ভিক্ষা করছেন যে, জিনিস আটকালে তাদের অসম্ভব ক্ষতি হবে, ইত্যাদি। যখনই আমি কোনো জিনিস মিউজিয়মের জন্য আটক করতাম, তখনই এই মহিলাদের আবির্ভাব হতো। এইসব মহিলা প্রধানত মদের ব্যবসা করে এবং ব্যবসায়ীদের হয়ে মধ্যস্থতা করা এদের এক রকমের উপজীবিকা।

মিউজিয়মকে আর একটু জনপ্রিয় করবার জন্য একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে-ছিলাম। এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন দরবার থেকে প্রতিনিধি এসেছিলেন। মৃগেন্দ্র সামশের ও কেইসর সামশেরও এসেছিলেন। কিন্তু স্কুল-কলেজের ছাত্র অধ্যাপক বা কারিগররা এই প্রদর্শনী দেখতে আসে নি। এর কারণ কি অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভালভাবেই বুঝেছিলাম যে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যোগাযোগের প্রয়োজন সম্বন্ধে সে সময়ের কোনো শিক্ষিত নেপালি বা কারিগরশ্রেণী চিন্তা করে নি। পাশ্চাত্যের সকল দেশেই কোনো না কোনো সময়ে অনুরূপ সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু নেপাল তখনো মঞ্জুশ্রী, নেমুনি, ভগবান বুদ্ধ, মছিন্দ্রনাথ ইত্যাদি ধর্মগুরুর দ্বারা সম্পূর্ণ প্রভাবান্বিত। ১৯৫০ সালের পরেও ট্রেন, জাহাজ, এরোপ্লেন বা সিনেমা দেখেন নি এমন লোকের অভাব ছিল না। অবশ্য রেডিও তখন নেপালের দোকানে দোকানে পৌঁছে গেছে।

একদিন কুলরত্নম বিকেলে এসে আমাদের জানালেন যে মহারাজ সিনেমা খুলবার অনুমতি দিয়েছেন, সিনেমা-হল তৈরি হওয়া শুরুও হয়ে গেছে। মহারাজ হুকুম পরমাঙ্গি দিয়ে দিয়েছেন যাতে সিনেমা-হল দু-মাসের মধ্যে তৈরি হয়ে যায়। 'হুকুম পরমাঙ্গি' কথার তাৎপর্য এক্ষেত্রে হল এই যে হুকুম পরমাঙ্গি যার হাতে থাকবে সে যে কোনো সরকারী অফিস থেকে যে কোনো জিনিস বা যে কোনো লোককে সিনেমা তৈরির কাজে নিযুক্ত করতে পারে। সোজা কথায় কুলরত্নম দু-মাসের জন্য হলেন নেপালের মহারাজার প্রতিনিধি। কুলরত্নম কৌতুক ক'রে বললেন, 'জানেন, আপনাকে আমি মিউজিয়ম থেকে এনে সিনেমা হলের decoration-এর কাজে লাগিয়ে দিতে পারি, আপনি কিছুই করতে পারবেন না!'

অদ্ভুতকর্মা কুলরত্নম দু-মাসের মধ্যে সিনেমা হল খাড়া ক'রে দিলেন। কুলরত্নম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এই সিনেমা হলের প্রভাবে আমাদের জীবনযাত্রা একেবারে বদলে যাবে। একদিন বাড়ির পেছনে লাউড-স্পিকার বেজে উঠল, বিকেলবেলা থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হল। এতদিন নিয়ম ছিল যে সন্ধ্যার পর একসঙ্গে পাঁচজন লোক রাস্তায় জটলা করতে পারবে না। কিন্তু টিকিট বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমে গেল সিনেমা-হলের সামনে। দরবারের রানীসাহেবারা এবং উচ্চপদস্থ গোর্খারা এলেন সিনেমা দেখতে। তারপর একদিন শুনলাম স্বয়ং ধীরাজ আসছেন সিনেমা দেখতে। কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বুশকোট দেখা দিল, অনেকে টুপি ছেড়ে দিল। নেপাল বৈজ্ঞানিক যুগের মধ্যে প্রবেশ করল। তারপর ছাত্র আন্দোলনের কথাও কানে এল এবং একদিন মহারাজকে হত্যার যড়যন্ত্রকারীরা ধরা পড়ল।

কিংবদন্তি মতে গোকর্ণ হল কিরাত জাতির প্রাচীন রাজধানী। একটি পাথরের পাদপীঠের ওপর দু'টি গোরুর কান। এইখানেই নেপালের প্রথম এরোড্রোম তৈরি হয়। তারপর একদিন সমস্ত নেপালবাসীকে আশ্চর্য ক'রে এরোপ্লেন এসে নামল নেপালের মাটিতে। পশুপতিনাথের মাথার ওপর দিয়ে মানুষ উড়ে আসবে, একথা অনেক ধর্মভীরু নেপালি বিশ্বাস করতে চায় নি। কিন্তু এরোপ্লেন যখন নামল, তখন অনেকে গিয়ে এরোপ্লেনকে প্রণাম করল, বলল, 'সবই স্বয়ম্ভুনাথের দয়া।' শিবভক্তরা বলল, 'এ হল পশুপতিনাথের শক্তি।' কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুগের প্রভাব যে নেপালবাসীকে বদলে দিচ্ছে, তখনো তা নেপালবাসীরা অনুভব করে নি।

শহর থেকে মিউজিয়ম অনেক দূরে, সেখানে চিরশান্তি বিরাজমান। কিন্তু সেখানেও শান্তিভঙ্গ হল। পুরনো সুব্বা বদলি হয়ে চলে গেছেন অন্য বিভাগে। নতুন সুব্বা এসেছেন, পায়ে চকচকে দামি জুতো, পরনে মূল্যবান পোশাক, জিহ্বা খুরপির মতোই ধারাল। দৈবাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। অত্যন্ত উদ্ধত স্বভাব। কিছু বললে সুব্বা বলে, 'আপনার কাজ হলেই তো হল?' শেষপর্যন্ত মৃগেন্দ্র সামশেরকে বলতে হল সব কথা।

একদিন মৃগেন্দ্র সামশের ছুটোর সময় মিউজিয়মে এসে উপস্থিত হলেন, সঙ্গে আর কেউ নেই। সুব্বা মোটরের জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং তারপর মাথাটা জানলার মধ্যে ঢুকিয়ে মৃগেন্দ্র সামশেরের কানে কানে কিছু বলেই তিন পা পিছিয়ে গিয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। মৃগেন্দ্র সামশের মোটরের দরজা খুলে বললেন, 'ভেতরে এসো, আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই। তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি মহলে ফিরে যাব।' গাড়িতে উঠে বসলাম। দরজা বন্ধ ক'রে মৃগেন্দ্র সামশের গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। রাস্তার ওপর উঠে মৃগেন্দ্র সামশের আমায় বললেন, 'জান সুব্বা আমার কানে কানে কি বলল?' তিনি বললেন, 'সে আমায় জানিয়ে দিল যে সে আমার বাবা বাবর সামশেরের সাত নম্বরের গুপ্তচর এবং তাকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। মিউজিয়মে কখন আসবে, কতক্ষণ থাকবে, তা সে নিজেই জানে না। এর তাৎপর্য তোমাকে আমি যেন বুঝিয়ে দিই। ইচ্ছে করলে বাবার এই গুপ্তচর আমার সমূহ ক্ষতি করতে পারে, তোমার পক্ষে কাজ করা তো আরো কঠিন হবে।' তারপর বললেন, 'এইবার তোমার কাছে আমার কিছু ব্যক্তিগত কথা আছে। তুমি নেপালের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জান, আমার অনুরোধ, তুমি এসব কথা দেশে গিয়ে কিছুকালের মধ্যে প্রকাশ করবে না।' আমি বললাম, 'আপনি এই অসম্ভব কথা কি ক'রে ভাবতে পারলেন! আমি কোথাও যাই না, সুধীর রায় ছাড়া অন্য কোনো বাঙালির সঙ্গে আমি মিশি নি। প্রয়োজন ছাড়া আমি কখনো দরবারে যাই না। কেন আপনি ভাবছেন আমি সব কথা জানি?' মৃগেন্দ্র সামশের বললেন, 'তুমি কোথাও যাও না আমি জানি। কিন্তু তোমার কয়েকজন নেওয়ার বন্ধু আছেন যাঁরা নিয়মিত তোমার বাড়িতে যান। দরবারে কি হয় না-হয় সে খবরে তোমার কোনো আগ্রহ নেই এবং তুমি হয়ত সে সম্বন্ধে কিছুই জান না, কিন্তু শহরে কি ঘটছে, রানা ও নেওয়ারদের মধ্যে কিরকম মনকাষাকষি চলেছে, তুমি হয়ত জান। কুলরত্ন এবং

চন্দ্রমান এসব কথা নিয়ে নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে গল্প করেছে। তাই বন্ধু হিসেবে তোমাকে অনুরোধ করছি যে দেশে গিয়ে কিছুদিনের জন্যে এসব কথা লিখ না।'

বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামল, দরজা খুলতে খুলতে মৃগেন্দ্র সামশের আর একবার বললেন, 'তুমি বন্ধু হিসেবে আমায় কথা দাও যে বর্তমান নেপালের অবস্থা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তুমি কোনো লেখা প্রকাশ করবে না। আমার এই অনুরোধ কি তুমি রক্ষা করবে?' বললাম, 'ভদ্রলোক হিসেবে আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি যে একথা আমি কখনো প্রকাশ করব না, আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হোন।' ইংরেজিতে যাকে বলে warm handshake, সেরকম করমর্দন ক'রে মৃগেন্দ্র সামশেরের গাড়ি থেকে নামলাম। মৃগেন্দ্র সামশের মোটর গাড়ি হাঁকিয়ে দিলেন বাবর-মহলের দিকে।*

কাঠমাণ্ডু শহরে পৌছবার পর থেকে মঠ, মন্দির, শ্রাবণ মেলায় মন্দিরে মন্দিরে বিচিত্র ছবি ও মূর্তির প্রদর্শনী দেখে দিন আমার ভালই কাটছিল। বৈচিত্র্যের কোনো অভাব বোধ করি নি। সুসজ্জিত নেওয়ার নারীরা ফুলের গহনা পরে হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে যখন দলে দলে মন্দির প্রদক্ষিণ করে, দেখতে ভালই লেগেছে। মন্দিরে মন্দিরে ভোর থেকে ঘণ্টা বেজে ওঠে, সেও সুন্দর। কিন্তু এই অভিনব দৃশ্য দেখতে দেখতে ক্রমে আমিও মধ্যযুগীয় জীবনের মধ্যে প্রবেশ করলাম। মাঝে মাঝে আশংকা হয় আমিও কি এদের মতোই কল্মিলতা ঘেরা একটা রুদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হব? পাহাড়িরা মাইলের পর মাইল হাঁটতে পারে, যানবাহনের কথা মনেও হয় না তাদের, কিন্তু আমাদের মনে হয়।

আমাদের প্রথম কন্যার জন্মসংবাদ পেলাম। আমার মিউজিয়মের দায়িত্ব পালন করা যে কঠিন হয়ে উঠতে পারে, মৃগেন্দ্র সামশেরের সেই কথাও মনে পড়ে। শেষপর্যন্ত নেপালের চাকরি ছাড়াই মনস্থ করলাম। চাকরি পাকা করবার সময়ও যেমন মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়েছিল, সেরকম চাকরি ছাড়ার সময়ও মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে হল। তিনি বললেন, 'তুমি সুস্থ হয়ে আবার ফিরে এস।' বন্ধুরা বললেন, ভালই হল, মহারাজ যখন আপনাকে ছুটি দিয়েছেন, তখন যে কোনো সময় আপনি ফিরে আসতে পারেন।' বাঁধাছাঁদা শুরু হয়েছে, রান্নাঘরের

* ইতিমধ্যে নেপালের ইতিহাস সম্পূর্ণ পালটে গেছে। মৃগেন্দ্র সামশেরও ইহলোক ত্যাগ করেছেন; কাজেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার আর প্রয়োজন নেই। এখন ঘটনাটি অতীত ইতিহাসের অংশ।

জিনিসপত্র আমাদের কিশোরী পরিচারিকা মোহন দেবীকে দিয়ে দিয়েছি। মোহন দেবী বলে, 'নহি লেগা বাবু, নহি যাও।'

কাঠমাণ্ডু ছাড়বার আগের দিন রাত্রে বেশ জমকালো রকমের শেষ ভোজের আয়োজন করা গেল। বিকেলে সুধীরবাবু এলেন, বললেন, 'সকালে আর আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আসব না। যখন পরিচয় হল, তখন মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখবেন।' তারপর যথারীতি টুপি ও ছড়ি হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন, সিঁড়ির দিকে। একবার থামলেন, ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'এখানে, আসতে ভালই লাগত, আচ্ছা চলি।' কুলরত্নম বললেন, 'মাস্টারমশাই একটু সেন্টিমেণ্ট প্রকাশ ক'রে গেলেন।'

প্লেটের ওপর গরম ডাক্‌-রোস্ট সামনে নিয়ে ঋতেন, আমি, চন্দ্রমান ও কুলরত্নম বসেছি। দু-এক টুকরো মুখে পুরেছি, চন্দ্রমান তারিফ ক'রে বলছে ভারি চমৎকার খেতে হয়েছে। অনেকদিন পর ডাক্‌-রোস্ট খাচ্ছি। এমন সময় মোহন দেবী এসে খবর দিল দরবার থেকে লোক এসেছে। অসময়ে দরবারের লোক? উঠে গিয়ে দেখি মৃগেন্দ্র সামশেরের দেহরক্ষী। লোকটিকে আমি ভালভাবেই চিনি, কারণ অনেকবার সে মৃগেন্দ্র সামশেরের দরবার থেকে মাছ, পাখির মাংস নিয়ে এসেছে। আমি বলি, 'কি ব্যাপার?' প্রহরী সংক্ষেপে জানাল যে হুকুম পরমাঙ্গি নিয়ে সে এসেছে চন্দ্রমানকে গ্রেপ্তার করতে। হুকুম পরমাঙ্গিতে লেখা আছে যে চন্দ্রমান মাস্‌কে যেখানে যেঅবস্থাতেই থাকুক, তাকে ধরে নিয়ে তার বাড়িতে রাত্রে আটকে রাখতে হবে। চন্দ্রমান এখানে আছে জেনে সে এসেছে তাকে নিয়ে যেতে। আইনমতে সে একমুহূর্ত অপেক্ষা করতে পারে না। তাকে অনেক ক'রে বোঝালাম যে চন্দ্রমানকে আমি নিমন্ত্রণ করেছি, খাওয়া শেষ করতে দাও। প্রহরী শেষপর্যন্ত অপেক্ষা করতে প্রস্তুত হল।

হুকুম পরমাঙ্গির কথা শুনে চন্দ্রমানের মুখ এমনই বিবর্ণ হল যে সেরকম অবস্থায় কোনো মানুষ আমি পূর্বে দেখি নি। কুলরত্নম চন্দ্রমানের হাত ধরে উঠিয়ে স্নানের ঘরের দিকে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার দু'জনে ফিরে এল। চন্দ্রমান আর বসল না, সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কুলরত্নম বলে, 'ভাল লোক, কিন্তু fool। এত সরল যারা তাদের কি এসব কাজে নামা উচিত? যেন সে স্বগতোক্তি করছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে?' জানতে পারলাম মহারাজার হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের একজনকে চন্দ্রমান মাস্‌কের বাড়িতে পাওয়া যায় এবং

কতকগুলি হাত-বোমাও সেই সঙ্গে পুলিশ উদ্ধার করেছে। কুলরত্নম যেন কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন নয় এমন একটা ভাব ক'রে ডাক্-রোস্ট খেতে শুরু করলেন, এবং নিজের মনে আউড়ে চললেন, 'চন্দ্রমান এরকম কাজ পূর্বেও করেছে, ধরা পড়ে জেলও হয়েছে। সে সময়ে চন্দ্রমান সামশেরের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল বলেই জেলে তাকে বেশি কষ্ট পেতে হয় নি। জেলে থাকতে সে একটা মন্দিরও বানিয়েছিল। সবই তার ভাল। কিন্তু সে দল গঠন করতে জানে না।' খাওয়া শেষ ক'রে কুলরত্নম বললেন, 'চন্দ্রমান থাকলে আরো ভাল লাগত।'

যথাসময়ে পরের দিন সকালে কুলরত্নম ট্যাক্সি নিয়ে উপস্থিত হলেন। আগের দিন জিনিসপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একদিন রাতের অন্ধকারে কাঠমাণ্ডু শহরে প্রবেশ করেছিলাম, সেদিন পথের আশেপাশে বিশেষ কিছুই দেখি নি। আর আজ চলেছি ভোরের আলোর মধ্যে দিয়ে পথের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে। যাবার পথে বিখ্যাত নাগ-সরোবর স্থানটি অতি প্রাচীন। চারদিকে ঘন জঙ্গল, কুলরত্নম ট্যাক্সি থামিয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ওই দেখুন নাগ-সরোবর।' অন্ধকারের মধ্যে জলের চিকমিক দেখলাম বলে মনে হল। ঋতেন বলল, 'জায়গাটা এত অন্ধকার আর এত নিচে যে দেখলে ভয় হয়।' এরপর আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে পৌছান গেল থানকোটে। ইঞ্জিনিয়ার কুলরত্নমের মধ্যে কিছুমাত্র ভাবালুতা নেই। তিনি চট ক'রে কুলি ও তামদানের ব্যবস্থা ক'রে বললেন, 'আর কি, এবার চলি। অফিসে আজ অনেক কাজ।'

সেই পুরাতন পথ, কেবল পার্থক্য হল এই যে রাস্তার যে অংশ দেখেছিলাম সন্ধ্যার আলোয়, আজ সেই পথ দেখছি সকালের আলোয়।

দেশে ফিরে প্রথম ভাবলাম কোথায় যাব, কি করব? তারপর আমার স্ত্রী ও আমাদের নবজাত কন্যাকে নিয়ে প্রথম গেলাম রাজস্থানের বনস্থলি বিদ্যাপীঠে, বনস্থলি বিদ্যাপীঠের সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের। কাজেই সেখানে আমি থাকতে পারি অনির্দিষ্ট কালের জন্য। কিন্তু সপরিবারে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে থাকা সম্ভব নয়। তাই শেষপর্যন্ত ঠিক হল মুসৌরিতে গিয়ে স্বামী স্ত্রী মিলে একটি ছোটখাটো শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করব। মুসৌরিতে স্কুল খুলবার মতো একখানা বড় বাড়িও পাওয়া গেল কার্ট রোডের ওপর।
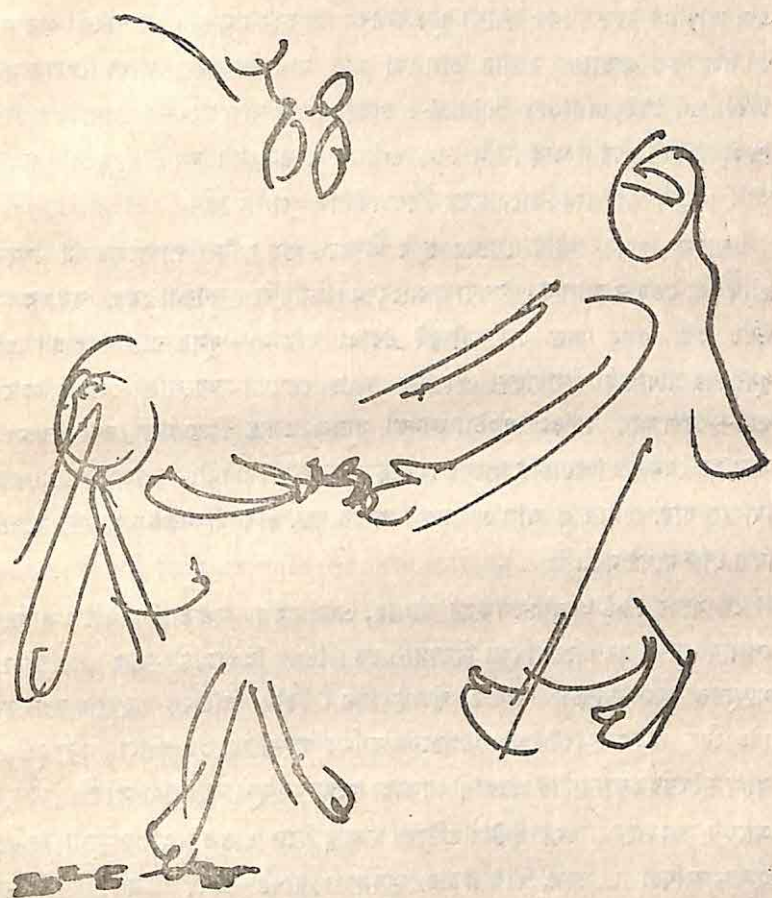
লীলা শুরু করল শিশু-বিদ্যালয় এবং আমি শুরু করলাম training centre—শিল্পকর্ম শিক্ষার জন্য। গ্রীষ্মাবকাশে শিক্ষকরা এই training centre-এ আসবেন এবং আধুনিক মতে শিক্ষা-প্রণালী বুঝে নেবেন। দু-চার জন ছাত্র যে পাওয়া যায় নি তা নয়, কিন্তু এভাবে সংসার চালানো যায় না। শেষপর্যন্ত লীলা দেরাদুনের Welham Preparatory School-এ চাকরি নিতে বাধ্য হলেন। সেখানে কন্যার শিক্ষাব্যবস্থাও হবে। তাই তিনি চলে গেলেন দেরাদুনে। আমি কিছুটা নিজের অর্থে, কিছুটা স্ত্রীর অর্থে কোনোক্রমে টিকে রইলাম মুসৌরিতে।

এখানেই প্রথম আমি মেঘের ছবি আঁকতে শুরু করি। পাহাড়ের বর্ষা যেমন ক্লান্তিকর, তেমনি আশ্চর্য এই বর্ষার আবেদন। চারিদিকে কালো মেঘ, সূর্য কখন উদয় হয়, কখন অস্ত যায়, কিছুই বোঝা যায় না—ধূসর রঙে আচ্ছন্ন। এই ধূসরতার মধ্যে হঠাৎ পাহাড়ের এক এক অংশ রোদের আলোয় কলমল ক'রে ওঠে—দেখা যায় বাড়ির একটা জানলা, মানুষ চলেছে, কিন্তু রাস্তা দেখা যায় না! মনে হয় যেন শূন্য দিয়ে মানুষগুলো চলেছে, এমন অভাবনীয় দৃশ্য মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে যায়, দেখা যায় আর এক দৃশ্য। সুন্দর দৃশ্য, ছবি আঁকারও অবসর যথেষ্ট, কিন্তু রুজি যথেষ্ট নয়।

কোমরের বেল্ট যখন ঢিলে হয়ে আসছে, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে আমন্ত্রণ পেলাম পাটনা সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে। শিক্ষা বিভাগের সচিব জগদীশচন্দ্র মাথুরের সঙ্গে পরিচয় আমার পূর্বেই ছিল। তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন বিহারের চারুকলা বিভাগের পুনর্গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে। আমার ক্ষীণ দৃষ্টি ও বয়স দুইয়ের কোনোটাই সরকারী চাকরির পক্ষে অনুকূল নয় জানা সত্ত্বেও মাথুর সাহেব আমাকে বিনা ইন্টারভিউয়ে চাকরি দিতে প্রস্তুত। যদিও মুসৌরির দৃশ্য সুন্দর, আবহাওয়া ভাল, কাজ করার অবসরও যথেষ্ট—সবই চিত্রকরের জীবনে অনুকূল—কিন্তু শূন্য হস্ত যার তার পক্ষে সবই প্রতিকূল। তাই পাটনা সরকারের চাকরি নিতে আমি প্রস্তুত হলাম।

তিন বছরের অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষর ক'রে পাটনার সরকারি চাকরিতে যোগ দিলাম। আমার সুখসুবিধার জন্য শিক্ষা বিভাগ সকল রকমের সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু আমাকে স্বীকার করতে হয় যে শিল্পশিক্ষার বিধিব্যবস্থার কোনো রকম অদল-বদল করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। অপরদিকে আমিও বিহারের মাটি থেকে কোনো রস গ্রহণ করতে পারি নি।

যে জায়গায় তখন আর্টস্কুল, সেই জায়গার নাম বান্দর-বাগিচা। বান্দর-বাগিচার চুনকাম করা ছোট বাড়ির মধ্যে চিত্রকলা, মূর্তিকলা, কমার্শিয়াল আর্ট সবই আছে। মুষ্টিমেয় ছাত্রসংখ্যা মনোযোগ দিয়েই কাজ করে। স্কুলের অধ্যক্ষ মাসে একবার ছাত্রদের perspective সম্বন্ধে লেকচার দেন। তাঁর মতে perspective ভালভাবে না শিখলে শিল্পশিক্ষার উন্নতি অসম্ভব। অধ্যক্ষ রাধামোহন আসলে উকিল। কিছুকাল ওকালতিও করেছেন। শুনেছিলাম হিন্দুস্থানি সংগীত তিনি ভালভাবেই শিখেছিলেন এবং নিয়মিত গানও করেন। শিল্পকলার উন্নতির জন্য তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে স্কুলটি সরকারের হাতে তিনি তুলে দেন। তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন modelling ক্লাসের অধ্যাপক যদু বন্দ্যোপাধ্যায়। যদু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমজীবনে সার্কাস দলে নানারকমের খেলা দেখাতেন। ভার উত্তোলনে তিনি ছিলেন অসাধারণ। কলকাতা আর্টস্কুলে এক বৎসর তিনি শিখেছিলেন। তারপর এই আর্টস্কুলে তিনি যোগ দিয়েছেন। চিত্রকলা বিভাগের অধ্যাপক লক্ষ্ণৌ আর্টস্কুলের বীরেশ্বর সেনের ছাত্র, এবং Commercial Dept.-এর অধ্যাপক নৃপেন মিত্র কলকাতা আর্টস্কুলের অতুল বোসের কাছে শিখেছিলেন। আর একজন ছিলেন, তিনি এই আর্টস্কুলেই শিক্ষা পেয়েছেন। এই স্কুলের শতকরা ৬০ জন ছাত্র বিবাহিত। কারো কারো পুত্রকন্যাও আছে। প্রথম বৎসর থেকেই ছাত্ররা উপার্জনের জন্য ব্যগ্র। এই জন্যেই কমার্শিয়াল বিভাগের শিক্ষকের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা সবচেয়ে বেশি। কারণ ইনি একমাত্র শিক্ষক যিনি উপযুক্তভাবে শিখেছিলেন এবং ছাত্রদের সাহায্য করতে সকল সময়েই প্রস্তুত থাকতেন।

পাঠক্রম তৈরি হল। কিন্তু স্কুলের অধ্যক্ষ আপত্তি করলেন। তাঁর মতে model drawing, cast drawing ইত্যাদি প্রথম বর্ষ থেকেই শুরু করা উচিত এবং একটি কি দু'টির বেশি রং ছাত্রদের ব্যবহার করা উচিত নয়। মৌলিক চিত্র ছাত্ররা করবে শেষ বর্ষে। দুজন শিক্ষক অধ্যক্ষের মত সমর্থন করলেন, একজন মৌন রইলেন। কমার্শিয়াল বিভাগের অধ্যাপক বললেন যে নতুন পাঠক্রম একবার পরীক্ষা ক'রে দেখলে হয়। প্রথম বর্ষ থেকেই মৌলিক চিত্র অভ্যাস করা যেতে পারে। নতুন পাঠক্রমের এই বিষয়টি কমার্শিয়াল বিভাগের অধ্যাপক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন।

আর্টস্কুলের বাইরেটা যদিও সাদা চুনকাম করা, কিন্তু স্কুলের ভেতরে গাঢ় অন্ধকার, এবং সেই অন্ধকারকে রক্ষা করার জন্য অধ্যক্ষ মশাই দৃঢ়সংকল্প।

শিক্ষামন্ত্রীকে আর্টস্কুলের অবস্থা বোঝাতে কিছুমাত্র অসুবিধা হল না। তিনি বললেন, 'আপাতত যারা শখ ক'রে ছবি আঁকতে চায় তাদের জন্য আপনি একটা আলাদা ক্লাস (amateur class) খুলুন।' তিনি মনে করেছিলেন যে amateur class শুরু হলে হয়ত ছাত্র ও শিক্ষকরা নতুন ক্লাসের কাজকর্ম দেখবে, তারপর ধীরে ধীরে স্কুলের অবস্থা ব্যবস্থা বদলাবার চেষ্টা করা যাবে।

কেন এই স্কুলের কোনো অদলবদল করা যায় না অনুসন্ধান করে জানলাম যে স্কুলের গভর্নিং বডির সভাপতি একজন ক্ষমতাশালী মন্ত্রী। অধ্যক্ষ রাধামোহন তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র। সেইজন্যেই অধ্যক্ষের অমতে কোনোকিছু করা সম্ভব নয়। শিক্ষাসচিব তো সামান্য ব্যক্তি, স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীরও কোনো শক্তি নেই যে এই আর্টস্কুলে তিনি হস্তক্ষেপ করেন। শিক্ষাসচিব ভেবেছিলেন যে আমি যদি কিছু অদলবদল করতে পারি। কিন্তু তিনি যখন বুঝলেন যে কোনো কিছুই করবার নেই, তখন শেষ উপায়রূপে এই amateur class-এর পরিকল্পনা নেওয়া হল। সকাল-সন্ধ্যায় amateur class করি, ছাত্রছাত্রী কিছু এলেন, কিছু গেলেন। মাস ছয়েকের মধ্যে এই ক্লাসের একটি প্রদর্শনী করবারও ব্যবস্থা করা গেল। দৈনিক সংবাদপত্রেও খবর বেরলো প্রদর্শনীর।

অবশ্য আর একটু আশাবাদী হলে হয়ত এই আর্টস্কুলের কিছু পরিবর্তন করা যেত, কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমার মানসিক অবস্থা তখন ঠিক অনুকূল ছিল না। কারণ পাটনা আসার পর থেকে আমি নিজের চোখের অবস্থা নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম।

একদিন আমার ডাক্তার বন্ধুর বাড়িতে হোস-পাইপে হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়লাম লনের ওপর, স্যুট-বুট সমেত।

ডাক্তার বন্ধু তাড়াতাড়ি আমাকে তুলে বললেন, 'আপনার চোখ কি আরো খারাপ হয়েছে? বোধহয় ছানি পড়ছে, একবার কাউকে দেখান। এখন থেকে আপনি লাঠি ব্যবহার করুন।'

আমার চোখ নিয়ে আমি যতই উদ্বিগ্ন, আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ ও তাঁর প্রিয় সহকারীরা ততই উৎফুল্ল হয়ে উঠছেন। আমি যে বেশিদিন আর্টস্কুলের সর্বনাশ করতে পারব না, তা তাঁরা নানা স্থানে রটনা করলেন। আমিও পদে পদে বুঝেছি যে চোখ খারাপই হয়ে চলেছে, ছবি আঁকতেও অসুবিধা হচ্ছে। কয়েকটা ছোট-বড় magnifying glass কিনলাম। উপরার্ধ কালো কাঁচে ঢাকা একজোড়া চশমা অর্ডার দিয়ে করালাম। কয়দিন মনে হয় বেশ লাভ হচ্ছে। আবার দেখি সেই

ঘোলাটে অবস্থা। তুলির লাইন কাগজে ঠিক জায়গায় পড়ে না, লাইন অস্পষ্ট হয়, তাই তেল-রঙের ছবি শুরু করলাম।

শেষপর্যন্ত দিল্লি যাওয়াই স্থির হল এবং ১৯৫৭ সালে, ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে আমি দিল্লি রওনা হলাম। সচরাচর আমি সন-তারিখ ভুলে যাই, কিন্তু এই দিনটি আমি ভুলি নি। ট্রেনে কয়েকখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা কিনলাম, কিন্তু কোনোটাই পড়তে পারি নি।

দিল্লির মস্ত ডাক্তার আমার চক্ষু পরীক্ষা ক'রে বললেন, 'কিছু না, আপনার একজন ভাল সার্জেন দরকার।' যতদূর সম্ভব বিনীত হয়ে বললাম, 'ছেলেবয়স থেকে যেসব ডাক্তার আমাকে দেখে এসেছেন তাঁরা এ-চোখের ওপর অস্ত্রোপচার করতে বারণ করেছেন।' তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে তিনি বললেন, 'আপনার পুরনো ডাক্তার কি বলেছে ওসব আমার জানবার দরকার নেই। বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে, আগের দিনের ডাক্তার এসব কথা জানতেন না। আর আপনার লোকসান কি? ডাক্তারি মতে তো আপনি অন্ধ!'

টেবিলের ওপর শুয়ে আছি, চোখের বাঁদিক থেকে ডানদিকে কাঁচি বা ছুরি কিছু একটা এগিয়ে যাচ্ছে, তাও বুঝতে পারছি। ডাক্তারের সহকারী, তিনিও একজন বিচক্ষণ ডাক্তার, বললেন, 'স্যার, এ কি করছেন?' ডাক্তার: 'We are in difficulty বিনোদবাবু, pray to God।'

বাকি অংশটা সংক্ষেপেই সেরে দিই। হাসপাতালে কয়দিন কাটিয়ে একদিন অপরাহ্ণে কালো চশমা চোখে লীলার হাত ধরে বেরিয়ে এলাম নার্সিং হোমের বাইরে। বাইরে রৌদ্রের উত্তাপ বুঝছি, কিন্তু আলো দেখতে পাচ্ছি না।

তারপর প্রায় বিশ বছর হতে চলল, আলো আর আমি দেখি নি। শাদা কাগজের ওপর নানা রঙের ছোপছাপ দিয়ে ছবিও আর আমি করি নি।

আজ আমি আলোর জগতে অন্ধকারের প্রতিনিধি।

কত্তামশাই

দিগন্তবিস্তৃত চন্দ্রাতপের নিচে নানা আকারের নানা বর্ণের মানুষ একত্রিত হয়েছে। তারা সকলে এসেছে জাদুকরের খেলা দেখতে।

এই কাহিনীর নায়ক রুদ্রনারায়ণও এসেছেন সভাস্থলে। ভেল্কি দেখছেন। দর্শকের দিকে তাঁর দৃষ্টি। রুদ্রনারায়ণ দেখছেন এই বিচিত্র জনতা। বসনে ভূষণে ভাবে ভঙ্গিতে বৈচিত্র্যের শেষ নেই, রুদ্রনারায়ণের বিস্ময়েরও কোনো কিনারা নেই। অন্য সকলের মতো জাদুকরকে তিনিও দেখতে পাচ্ছেন না। জাদুকর কি কোনো যবনিকার অন্তরালে, অথবা এই জনতার সঙ্গে মিশে আছে! এ প্রশ্ন অমীমাংসিত রেখে রুদ্রনারায়ণের দৃষ্টি ঘুরে বেড়ায় জনতার মধ্যে।

এবার শুরু হবে জাদুকরের অত্যাশ্চর্য ভাগ্যপরীক্ষার খেলা। সম্ভবত জাদুকরের মন্ত্রবলে ঢুকে পড়েছে চৈত্র-মধ্যাহ্নের ঘূর্ণি হাওয়া। ভাগ্যের রূপে তাস উড়ে চলেছে। শুকনো পাতার মতো ছড়িয়ে পড়ছে মাটিতে—আবার উড়ে যাচ্ছে উপরে। ছক্কা-পাঞ্জা-টেক্কা, সাহেব-বিবি-গোলাম, নওলা-দুরি-তিরি শব্দে সভাস্থল মুখরিত। তাসের সঙ্গে ঘূর্ণি হাওয়ার বেগে মানুষগুলো দৌড়ে চলেছে চারিদিকে। চলন্ত ইঞ্জিনের মতো মানুষগুলো গরম হয়ে উঠেছে। উত্তেজনায় রুদ্রনারায়ণের জিহ্বাগ্র থেকে ভিতর পর্যন্ত শুকিয়ে এসেছে, তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। লাফিয়ে উঠে একখানা তাস খপ্ ক'রে ধরে ফেললেন—উল্টে দেখেন হরতনের টেক্কা। শাদা কাগজের বুকে লাল ফোঁটা। কী এর তাৎপর্য! মৃত্যুবাণ ও ফুলবাণ—এই দুইয়েরই লক্ষ্য এই চিহ্ন। এই লাল চিহ্নটির দিকে দৃষ্টি রেখে রুদ্রনারায়ন ভাবছেন তাঁর ভবিষ্যৎ কোনদিকে—মৃত্যু অথবা নতুন জীবনের উদ্দীপনা! বিস্মিত হয়ে রুদ্রনারায়ন দেখছেন লাল ফোঁটা টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে শাদা কাগজের জমির উপর। রক্তের বিন্দুর মতো ছোট বড় চিহ্নগুলি ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে আসছে। ক্রমে দেখা দিয়েছে একটা পীতাভ গ্লানিকর পরিবেশ—যেন অনেকগুলো জণ্ডিস্ রোগী তাঁর গা ঘেঁষে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অস্বস্তিকর পীতাভ আলো নিস্তেজ হতে হতে গাঢ় অন্ধকারে পরিণত হল। যেদিকেই তিনি দৃষ্টি দেন একই দৃশ্য—কেবল অন্ধকার। নিজের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া ছাড়া কোথাও কোনো প্রকার প্রাণের চিহ্ন নেই। ভাগ্যের লিখন তাঁর কাছে এখন স্পষ্ট। আত্মরক্ষার জন্য এখন তিনি উদ্বিগ্ন। কিছু একটা অবলম্বনের জন্য অগ্রসর হতে গিয়ে তিনি কঠিন ধারালো একটা অবস্থার মধ্যে এসে পড়লেন। অন্ধকার যেমন তাঁর কাছে নতুন—অন্ধকারের এই অভিব্যক্তিও তাঁর

কাছে তেমন অপরিচিত। কোথায় তিনি! পথ কোথায়! এই প্রশ্নের জবাব পাবার পূর্বেই তিনি ছিটকে এসে পড়লেন ঐ হাতলওয়ালা গদি-আঁটা কুর্সিখানার উপর। চোখে তখন তাঁর কালো চশমা। গুহাভ্যন্তরস্থিত দীপশিখার মতো তিনি স্থির।

স্থান-কালের পরিচয় পাবার জন্য রুদ্রনারায়ণ এইবার কিঞ্চিৎ বিচলিত। অনেক-গুলি মানুষের পায়ের শব্দ, কণ্ঠস্বর, তাঁর কানে আসছে।

মানুষের জগৎ—কিন্তু এ হল রুদ্রনারায়ণের অনুমান মাত্র। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাবার কোনো পথ তিনি এখনো খুঁজে পান নি। ধীরে ধীরে রুদ্রনারায়ণের কাছে কণ্ঠস্বরের তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তিনি শুনছেন কত্তামশাই সম্বন্ধে উঁচু-নিচু গলায় বিবিধ প্রকার আলোচনা। কত্তামশাই নামে একজন কেউ এই অন্ধকারের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে—এই অনুমানে নির্ভর ক'রে রুদ্রনারায়ণ প্রশ্ন করেন, কত্তামশাই কে? কোথায় তিনি? জবাব পান, আজ্ঞে, আপনি আমাদের কত্তামশাই। আমরা আপনার শুভানুধ্যায়ী, আপনার প্রয়োজনের জিনিস-পত্র সাজিয়ে দিচ্ছি। এইখানে আপনার টেবিল, টেবিলের উপর রইল সিগারেট দেশলাই। জলের গেলাস, ওষুধের শিশি সব রইল আপনার সামনে। রুদ্রনারায়ণ বলেন, কত্তামশাইকে আমি চিনি না, আমার নাম রুদ্রনারায়ণ। অনেকগুলি কণ্ঠস্বর বলে ওঠে, আমরা তো রুদ্রনারায়ণকে চিনি না। এবার রুদ্রনারায়ণ উত্তপ্ত হয়ে উঠে বলেন, আমাকে নিয়ে এ কী রহস্য! আমি কত্তামশাই নই! কিন্তু কোনো ফল হয় না। কত্তামশাই এই আহ্বান কিছুতেই বন্ধ করতে পারছেন না।

রুদ্রনারায়ণ : এতো অন্ধকার কেন? আলো জেলে দাও।

চারদিক থেকে অসংখ্য কণ্ঠস্বর বলে ওঠে : কত্তামশাই আলো তো সব জেলে দেওয়া হয়েছে!

পাতালের গহ্বর থেকে পৈশাচিক গর্জন বুকের মধ্যে প্রবেশ করছে। সেখানে গর্জনের তাণ্ডবলীলা চলেছে। শব্দের সংঘাতে তাঁর অস্তিত্ব ফেটে চৌচির হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারত। কিন্তু রুদ্রনারায়ণের ভেতরটা দধীচির হাড়ে তৈরি, প্রতিহত-শক্তি তার ভয়ঙ্কর। ঘন বর্ষায় ঢেউ তোলা সমুদ্রের উপর দিয়ে রুদ্রনারায়ণের জীবন-তরী আছাড় খাচ্ছে—সামনে পিছনে—ডাইনে বাঁয়ে। গুহাভ্যন্তরস্থিত দীপশিখা দুলে দুলে উঠছে—সত্যের দীপশিখা বুঝিবা নিভে যায়।

কিছুতেই তিনি বর্তমানকে স্বীকার ক'রে নিতে পারছেন না। 'আমি' এই ক্ষুদ্র শব্দকে কেন্দ্র ক'রে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় নির্ভর করছে বলেই সেই রুদ্রনারায়ণ-রূপ 'আমি'কে কত্তামশাইয়ের প্রয়োজন। বর্তমান অস্তিত্বকে তিনি স্বীকার করতে পারছেন না। বর্শার ফলকে বেঁধা বিষধর সর্প যেমন ছোবল দিয়ে দিয়ে চারদিকটা ক্ষতবিক্ষত ক'রে আনে, রুদ্রনারায়ণ তেমনি 'কি? কেন? কোথায়?'—এই প্রশ্নের আঘাতে আঘাতে চারদিকটা ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুলছেন এবং ধীরে ধীরে নির্জীব হয়ে আসছেন। ছিপি-খোলা অ্যাসিডের বোতলের মতো রুদ্রনারায়ণের অবস্থা। ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে ক্ষারগন্ধী দীর্ঘশ্বাস। কুণ্ডলী পাকানো দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে তিনি পড়ে আছেন। খোলা জানলা দিয়ে ফুরফুরে বাতাস সেই দীর্ঘশ্বাসের কুণ্ডলীর ক্ষারগন্ধ উড়িয়ে নিয়ে গেল। রুদ্রনারায়ণ খানিকটা সুস্থ হলেন। এইবার তিনি উপলব্ধি করলেন এই অন্ধকার প্রদেশে কত্তামশাই ছাড়া তিনি আর কেউ নন। এইবার কত্তামশাইকে দেখা যাচ্ছে কুর্সির উপর কালো চশমা পরে।

কত্তামশাই বসে থাকেন। ভেতরের গর্জন আর তেমন শোনা যায় না। প্রশ্নের হুল বিঁধিয়ে এখন আর তিনি চারদিকটা ক্ষতবিক্ষত করতে পারছেন না। সে শক্তি তিনি হারিয়েছেন। এই রকম অবস্থায় একটা বিদ্যুতের আলো তাঁর সামনে দিয়ে চলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্ঞানচক্ষুর উদয় হল। তিনি দেখলেন নীল জলের আবর্তের মধ্যে রুদ্রনারায়ণ তলিয়ে যাচ্ছে। রুদ্রনারায়ণকে দেখতে পেয়েই কত্তামশাই চেঁচিয়ে উঠলেন: রুদ্রনারায়ণ দাঁড়াও—একটা কথা আছে। রুদ্রনারায়ণ বলল: আসছি। বলেই সে জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। নীল জলে ভেসে উঠল একটুখানি শাদা ফেনা—তারপরেই সেটা নীল জলে মিলিয়ে গেল।

রুদ্রনারায়ণের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে নতুন ক'রে নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। নৈরাশ্যের উর্বর জমিতেই আশালতা গজিয়ে থাকে। দেখতে দেখতে কত্তামশাইয়ের সমস্ত দেহমন আশালতার জালে জড়িয়ে গেল। রুদ্রনারায়ণের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছেন তিনি। বলছেন: রুদ্রনারায়ণ, কোথায় তুমি?

—আমি তোমার পায়ের তলায় পাতাল-গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছি, আমায় টেনে তোলো।

তুমি কোথায় আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার টর্চ তুমি নিয়ে গেছ। আর তুমি এখানে এসে করবেই বা কী?

—কেন! আমার মতো করিৎকর্মা লোক কিছুই করতে পারবো না! তার মানে?

—রুদ্রনারায়ণ, এ বড় কঠিন স্থান। কেবলই সংঘাত। রুদ্রনারায়ণ, তোমার জোড়া চোখের দৃষ্টিতে কিছুই পাবে না তুমি। তুমি দেখেছ বহুরূপীর মৃত্যু—আর দেখেছ আলোছায়ার জলতরঙ্গ খেলা। আমি পাই আমার দশ আঙুল দিয়ে কঠিন ধারালো মসৃণ বর্ণহীন জগৎ। সেখানে আছে বর্ণহীন কোলাহল—অশরীরী কণ্ঠস্বর। গন্ধ স্পর্শ শব্দ আর রূপ এর মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আমার জগতে নেই। দশ আঙুলে এসব পাওয়া যায় না।

—রুদ্রনারায়ণ, আমার অভিজ্ঞতার হিসেব লেখা পুঁটলিটা রেখেছ?

—সে লিপি পাঠ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই পুঁথিটা পুড়িয়ে দিয়েছি।

—রুদ্রনারায়ণ তুমি যাও, তোমার আমার মাধ্য আজ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা; সে বাধা অতিক্রম করা অসম্ভব। শুনছ, কি বলছি?

রুদ্রনারায়ণের কাছ থেকে কোনো জবাব পাওয়া গেল না। বোধ হয় পাতাল-গঙ্গার স্রোতে সে আর কোথাও ভেসে গেছে।

কর্ত্তামশাই এবার উঠে দাঁড়িয়েছেন। এইবার তাঁর অভিযান নতুন জগতের মধ্যে। যে-জগৎ কঠিন আঘাতে তাঁকে পীড়িত করেছে সেই জগতের সত্য পরিচয় নেবার জন্যই আজ তিনি দৃঢ়সংকল্প। প্রাণপণ শক্তিতে কর্ত্তামশাই সামনের দিকে চলবার চেষ্টা করছেন। অনেক ঠেলাঠেলির পর তিনি উপলব্ধি করলেন, যে-চেয়ারে তিনি বসেছিলেন সেইখানেই আছেন—একচুল এদিক ওদিক যেতে পারেন নি।

জমাট অন্ধকারের চাপে কর্ত্তামশাই হাঁপিয়ে ওঠেন। তিনি নিজে পথ ক'রে নিতে পারছেন না। এই অবস্থায় কর্ত্তামশাইয়ের দেহমন ক্লান্ত, অবসন্ন। ভাদ্রের ভিজে গুমোট গরমের মতো অবসাদ তাঁর দেহে মনে লেপটে রয়েছে।

চারদিকে পশুপক্ষীর কলরব তাঁর কানে আসে। এসব কলরবে তাঁর কোনো

উদ্বেগ নেই। কিন্তু মানুষের কোলাহল কানে এলে মনে হয় একটা উজ্জ্বল গোলাকার আলো। এই আলোর কথা মনে করলে অবসাদ তাঁর দ্বিগুণ হয়ে ওঠে।

বসে শুয়ে কত্তামশাইয়ের দিন কাটে। ক্রমে এই অভ্যস্ত জীবনের মধ্যেও বৈচিত্র্য দেখা গেল। কত্তামশাই বুঝলেন, বসে থাকার ক্লান্তি দূর করতে হলে টান হয়ে শুয়ে পড়া ভাল।

কত্তামশাই উঠি উঠি করছেন। কুর্সির পাশে রাখা লাঠিটা কত্তামশাই খুঁজতে যাবেন এমন সময় চটচটে, চিটচিটে, রোঁয়াওয়ালা একটা জিনিসের উপর হাত পড়তে 'এটা কি' বলে তিনি আঁতকে উঠলেন।

—আজ্ঞে, আমি শ্যাম।

—কে তুই! এখানে কি করতে?

—আজ্ঞে, গিন্নীমা আমাকে এখানে বসতে বলেছেন—আপনার কাজ করবো।

—রোঁয়াওয়ালা ওটা কী?

—আজ্ঞে ওটা আমার চুল।

—চুল! ও রকম!

কত্তামশাই নিজের চুলে হাত বুলিয়ে দেখলেন ছেলেটা মিথ্যে বলে নি।

—তুই কী করতে পারিস?

—আমি ভাত ফুটাতে পারি।

—তুই চা বানাতে পারিস?

—আজ্ঞে, গিন্নীমা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন।

—যা, চা ক'রে নিয়ে আয়।

খুট খুট ক'রে একটা আওয়াজ শুনলেন কত্তামশাই। এমন কত আওয়াজ তো হয়—সবদিকে কান দেবার কি দরকার। কত্তামশাইয়ের হাতের পাতা খাবি খাওয়া মাছের মতো টেবিলের উপর ঘুরছে দেশলাইয়ের সন্ধানে। এমন সময় বিভ্রাটে পড়লেন কত্তামশাই। কোথা থেকে খানিকটা গরম জল হুড় হুড় ক'রে তাঁর গায়ের উপর পড়ে গেল—ঝন ঝন ক'রে একটা আওয়াজ হল। কত্তামশাই হাউমাউ ক'রে উঠলেন। সকলে ছুটে এলেন। কত্তামশাই বলেন: কি হল? সবাই বলেন: ও কিছু নয়, চায়ের কাপ উল্টে গেছে।

এক বিভ্রাট থেকে আর এক বিভ্রাট। কত্তামশাইয়ের হাতের উপর দিয়ে কি

একটা বিশ্রী জিনিস কিলবিল ক'রে চলে গেল। কর্তামশাই কিছুই বুঝতে পারছেন না। গিন্নী বলেন : ও কিছু নয়, শাড়ির আঁচল।

আর এক কাপ চা এসেছে। কর্তামশাইয়ের হাতটা নিয়ে কাপের গায়ে ঠেকিয়ে দিয়ে শ্যাম বলল : এই চা।

—বেশ চা।

শ্যাম কর্তামশাইয়ের চেয়ারের পাশে উবু হয়ে বসে থাকে। কর্তামশাইয়ের দরকার-মতো সে ঘর থেকে রান্নাঘর, রান্নাঘর থেকে বাগান ছুটোছুটি করে। তার কোনো ক্লান্তি নেই। কর্তামশাই বলেন : শ্যাম, তুই পড়তে জানিস? শ্যাম বলে : আমার কাছে গোপাল ভাঁড়ের গল্প আছে, পড়ব বাবু?

শ্যাম গোপাল ভাঁড়ের গল্প পড়ে। পড়ার ভঙ্গিতে কর্তামশাইয়ের হাসি পায়। মাঝে মাঝে হো হো ক'রে হেসে ওঠেন আর বলেন : শ্যাম, তুই আমাকে খুব হাসালি। হাসতে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। বলে কর্তামশাই আবার গম্ভীর হন।

ক-দিন থেকে শ্যামের মনে সুখ নেই। বাটিঢাকা গুবরে পোকার মতো একটা কৌতূহল শ্যামের ভেতরে ঘুর ঘুর করে ঘুরছে। শেষপর্যন্ত শ্যাম আর নিজেকে সামলাতে পারল না। একদিন বলল : বাবু ঐ কালো চশমাটা আপনি খোলেন না কেন? বেমক্কা ঠোক্কর খেলে মানুষ যেমন ক'রে লাফিয়ে ওঠে, ঠিক তেমন ক'রে কর্তামশাই লাফিয়ে উঠে বললেন : আস্কারা পেয়ে মাথায় উঠেছিস? বেয়াড়া ছেলে কোথাকার, ডেঁপোমো করতে আর জায়গা পাও নি! চলে যা এখান থেকে।

শ্যাম : বাবু আর করব না।

সকাল-বিকেল-সন্ধে সবই কর্তামশাই জানতে পারেন এক একদিন। তবে সবদিন সময়টাকে তিনি ঠিক আয়ত্তে আনতে পারেন না। শ্যাম কর্তামশাইয়ের সামনে চায়ের পেয়ালা রেখে যথানিয়মে বললে : বাবু চা।

—এখুনি চা দিলি যে? এখনো তো নটা বাজে নি?

—আজ্ঞে দশটা বেজেছে।

—কই ট্রেনের আওয়াজ তো পাই নি!

—আজ্ঞে আজ হরতাল। ট্রেন বন্ধ।

কত্তামশাইয়ের সামনে থেকে সেদিনের ন'টা-বাজা সকালটা হারিয়ে গেল।

একটা কুক্ পাখি ডেকে উঠলে তিনি ধড়ফড় ক'রে উঠে বসেন। বোঝেন সকাল হয়েছে। তারপর কাক-কোকিলের পালা। সাইকেল নিয়ে দুধওয়ালা যায়, ফেরিওয়ালা আসে—সঙ্গে সঙ্গে কত্তামশাইয়ের জগতে ঘণ্টা বেজে ওঠে।

বিকেল হলে তিনি একটু বাইরে বসেন। কিন্তু আজ তিনি অপেক্ষা ক'রে ক'রে হয়রান হয়ে গেছেন।

—কই শ্যাম, বিকেল তো হল না?

—আজ্ঞে, বিকেল তো হয়ে গেছে!

—কই ওদের বাড়ির ঝিয়ের বাসন মাজার আওয়াজ তো পেলাম না!

—আজ্ঞে ওদের ঝি পালিয়ে গেছে।

মানুষের মতি-মেজাজের কোনো ঠিক নেই, ক্রমেই কত্তামশাই একথা বুঝেছেন। তাদের উপর নির্ভর ক'রে বড় বড় সময় হাতছাড়া হয়ে যায়। প্রকৃতি তাঁকে এমন ক'রে ঠকায় না। প্রকৃতির একটা নিয়ম আছে। কাকগুলো সারাদিন কা কা ক'রে বেড়ায় বটে, তবু অন্য পাখিগুলোর সময়-অসময়ের জ্ঞান আছে। কুকুর, সে-ও সব সময় লাফিয়ে বেড়াচ্ছে না—চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছে না। মৌচাকের খোপে খোপে যেমন মধু রয়েছে তেমনি সময়ের খোপে খোপে প্রকৃতির ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। মানুষ ক্রমে এই নিয়মের উপর উৎপাত শুরু করেছে। লম্বা গাছকে বেঁটে করছে—বেঁটে গাছকে লম্বা করছে। লাল ফুলকে নীল করছে—নীল ফুলকে লাল করছে। তবু প্রকৃতির আইন একেবারে ভেঙে যায় নি। উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের যে সমস্ত সৌভাগ্যবান যথাস্থানে জন্মেছে ও নির্ধারিত স্থানে মরেছে প্রকৃতি তাদের যথাস্থানে ফসিল ক'রে রেখে দিয়েছে। তারা জাদুঘরের কাঁচের আলমারিতে অমর হ'য়ে আছে।

কত্তামশাই চট্ ক'রে বুঝে নিলেন ফসিল হওয়ার সাধনাই সত্যকারের সাধনা। তাঁর মেয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শিক্ষা পাবার জন্য কোথা থেকে একটা প্রস্তরীভূত গাছের টুকরো এনে রেখেছে। তারপর সে চলে গেছে সংগীত শিক্ষা করতে। ফসিলটা বেওয়ারিশ কাগজপত্রের মধ্যে পড়ে আছে। শ্যাম টেবিল সাফ ক'রে ফসিলটা রেখে দিল। ফসিলের উপর হাত রেখে কত্তামশাই ফসিল হবার সাধনা শুরু করলেন।

চুল রুক্ষ—জামা কাপড়ে ইস্তিরি নেই—মেজাজ তিরিক্ষি। চিৎকারের চোটে দেওয়ালে ফাটল ধরবার উপক্রম। গিন্নীমা বলেন : এত চেঁচাও কেন ? শ্যাম বলে : বাবু কি চাইছেন ? কর্তামশাই বলেন : আমার সাধনায় কেউ ব্যাঘাত কোরো না। চা-সিগারেটের মাত্রা এতই বেড়েছে যে কর্তামশাই ক্ষুধামান্দ্য রোগে ভুগছেন—অন্নে রুচি নেই। কোনো রকমে কিছু খাদ্য গলা দিয়ে নেমে গেলেই হল—স্বাদগন্ধের প্রয়োজন নেই। তপস্যায় দ্রুত উন্নতি অনুভব করছেন। উন্নতির সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে। হাতপায়ের হাড় মাংস ভেদ ক'রে ঠেলে বেরিয়ে আসছে। হাঁটুর উপর হাত বুলিয়ে কর্তামশাই দেখেন ফসিল হতে আর বেশি বিলম্ব নেই। মনেও কিঞ্চিৎ গর্বের ভাব দেখা দিয়েছে। দশ আঙুলে এখন আর নতুন জিনিস পাবার ব্যগ্রতা নেই। হাতের পাতায় ফসিলের ছাপ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ! এমনি যখন অবস্থা তখন একদিন শ্যামের উল্লসিত কণ্ঠস্বর কর্তামশায়ের কানে এল : বাবু মস্ত একটা ফড়িং ! ফড়িংটা ইতিমধ্যে কর্তামশাইয়ের নাকের উপর এসে বসেছে এবং মুহূর্ত মধ্যে লাফ দিয়ে পিঠ বেয়ে উপস্থিত হয়েছে দেয়ালটার উপর। শ্যাম কিছুতেই তাকে আয়ত্তে আনতে পারছে না। যতবারই এসে থাবা মেরে ফড়িং ধরতে যায় ফড়িং নাগালের বাইরে—কখনো বিছানায়, কখনো শ্যামের মাথার উপর উড়ে গিয়ে বসে। শ্যামের দাপাদাপির মধ্যে ফড়িংরূপী মেনকা কর্তামশাইয়ের তপস্যার বিঘ্ন ঘটিয়ে তীরের মতো বেরিয়ে গেল সবুজ মাঠটার দিকে। ফড়িংয়ের লাফালাফির সঙ্গে কর্তামশাইয়ের অন্ধকারটাও যেন একটু নড়ে চড়ে উঠল।

ফসিল হবার সাধনায় নিরাশ হয়ে কর্তামশাই বললেন : শ্যাম এই পাথরটা ফেলে দে। কাল থেকে ভাল ভাল ফুল নিয়ে এসে আমার টেবিলে রাখবি।

শ্যাম মহা উল্লাসে ফুল সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। সকালে চায়ের সময় চা মেলে না। শ্যাম ঘরে ফিরলে কর্তামশাই চেঁচিয়ে ওঠেন : কোথায় গিয়েছিলি ?

—আজ খুব সুন্দর ফুল এনেছি !

শ্যাম লাল নীল হলদে কতরকম রঙের ফুল নিয়ে আসে। নিখুঁতভাবে বর্ণনা দিয়ে যায় রঙের, আর মাঝে মাঝে আবেগের আতিশয্যে বলে ওঠে : বাবু কি সুন্দর !

রং কর্তামশাইয়ের চোখেও ধরছে না, মনেও ছাপ ফেলছে না। কেবল কতকগুলো ধারণার সাহায্যে বুঝবার চেষ্টা করেন মাত্র। ভাবের মাছি ভন ভন ক'রে ঘুরে বেড়ায়। মাছির এই ভনভনানি কর্তামশাইয়ের আর ভাল লাগে না। বিরক্ত

হয়ে ওঠেন। কিন্তু ফুলগুলো যখন হাতে নিয়ে আঙুলের দৃষ্টিতে দেখেন তখন তিনি মসৃণ চিক্কণ কোমল ফুলের স্পর্শে আনন্দ পান। এক ফুলের সঙ্গে অন্য ফুলের আকারগত পার্থক্যে ফুলের জগৎ তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শ্যামের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তিনিও বলে ওঠেন : কি সুন্দর ! রূপে রঙে অখণ্ড বাস্তবতা কত্তামশাইয়ের হাতে এসে টুকরো হয়ে যায়—যেমন টুকরো হয়ে গিয়েছিলেন একদিন তিনি।

একটি ফুল হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন তিনি। যেমন মৃদু ফুলের গন্ধ তেমনি মৃদু মসৃণ পাপড়ির প্রতিহত শক্তি। শ্যাম রঙের বর্ণনা শুরু করতেই এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিলেন, অনেকগুলো ফুল টেবিলের উপর ছড়িয়ে দিয়ে অবাক হয়ে কত্তামশাই দশ আঙুলে অনুভব করেন, ফুলের ফাঁকে ফাঁকে টেবিলের আবেদন নতুন রকম লাগছে। টেবিল আর ফুল দুই মিলে অন্ধকারের এক নতুন অভিব্যক্তি তাঁর সামনে উপস্থিত হল।

আজ তিনি বুঝলেন আলোর সঙ্গে রং, রঙের সঙ্গে সৌন্দর্যের জগৎও তাঁর কাছে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আলোছায়ার জলতরঙ্গ হারিয়ে ফেলেছেন কত্তামশাই। ফিরে পাবার চেষ্টাও বারংবার ব্যর্থ হয়েছে। আজ তিনি শুনতে পাচ্ছেন অন্ধকারে আকারের ঝংকার। সুন্দর না হোক প্রাণস্পন্দনের মতো তাঁর কাছে তা সত্য। এই নতুন প্রাণের স্পন্দনে সামনের অন্ধকার ঝিকমিক ক'রে উঠল। অতীতের লোকসান অনেকখানি তিনি ভুলে গেলেন। নিরেট অন্ধকারের মধ্যে গভীরতার সাক্ষাৎ পেলেন কত্তামশাই।

কত্তামশাই যখন নতুন উপলব্ধিতে বিভোর সেই সময় মনের মধ্যে গুন গুন ক'রে কে বলে উঠল : কত্তামশাই, হাতে যা পেলে তা তো পেলে, এখন একবার ভেবে দেখ তোমার উপলব্ধি আসল না নকল। একবার বুঝে দেখ, অভিধান দেখ, পাঁজি পড়—তা না হলে সত্য-মিথ্যা যাচাই হবে কি ক'রে? এই বলে কত্তামশাইয়ের মন একটু মুচকি হেসে বিদায় নিল।

কত্তামশাইয়ের ঘরে মহা গণ্ডগোল। স্নান ক'রে এসে তিনি তাঁর ঘরের টেবিল চেয়ার বিছানা কিছুই খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি লাঠি এগিয়ে ঠোকা দিয়ে

দেখেন, নিজে ঘুরপাক খান, শক্ত নরম নানা জিনিসে হোঁচটও খাচ্ছেন। হাওয়ায় দোলা পর্দার ঝাপটা খেয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন : এসব কি? অনর্গল চিৎকার ক'রে চলেছেন : শ্যাম কোথায় গেল! ঘুঁটে-পেঁয়াজ-তেল-সাবানের গন্ধওয়ালা শ্যাম কোথায় গেলি!

পাশে দাঁড়িয়ে শ্যাম নিচু গলায় বলে যাচ্ছে : বাবু, আমি এই যে আছি। সে জানে একটুখানি ধরে নিয়ে গেলেই কর্তামশাই সব খুঁজে পাবেন। কিন্তু তাঁর গায়ে হাত লাগলে আরও বিভ্রাট ঘটতে পারে, এই ভেবে শ্যামের ভয়ও হচ্ছে।

কর্তামশাইয়ের নিজের গলার চিৎকারে নিজের কানেই তালা লেগে যাচ্ছে। শ্যামের কথা একটুও তিনি শুনছেন না। অবস্থা বুঝে নিরুপায় শ্যাম একটা দুঃসাহসিক কাজ ক'রে ফেলল। কর্তামশায়ের হাত ধরে টেনে এনে তাঁকে হাতলওয়ালা চেয়ারে বসালো : বাবু, এই আপনার চেয়ার।

কর্তামশাই ধপ্ ক'রে চেয়ারের মধ্যে ঢুকে গিয়ে হাত দু-খানা টেবিলের উপর রেখে বলল : আঃ, বাঁচালি! প্রাণটা টা-টা করছে, একটু চা দে। হ্যাঁরে শ্যাম, এতক্ষণ এই সব খুঁজে পাচ্ছিলাম না কেন?

—আজ্ঞে, আপনি যখন চান করতে গেছিলেন তখন ঘরটা আমি ভাল করে গুছিয়েছি। সবই আছে এর মধ্যে।

তাই তো, বলে কর্তামশাই উঠে দাঁড়ালেন। ভাল ক'রে এবার ঘরের আসবাব-পত্রের স্থান চিনে নেবার জন্য। এতদিন তিনি দেখেছেন ঘরখানা লম্বা, এখন জানছেন ঘরখানা চৌকা। কি ক'রে এমন হল! তিনি এদিকে যান, দেয়ালে ধাক্কা খান, ওদিকে যান খাটে ধাক্কা খান। তিনি চেঁচিয়ে শ্যামকে ডেকে বলেন : হ্যাঁরে, এই সব কি করেছিস?

—আজ্ঞে, আপনার টেবিল-চেয়ারগুলো ঘরের মাঝখানে রেখেছি। আপনি হাওয়া পাবেন বলে।

কর্তামশাই বলেন : ভালই করেছিস শ্যাম, আমার পুরনো ঘরখানা নতুন হয়ে গেল।

মশারির মধ্যে টান হয়ে শুলেই অদৃশ্য হাত টেলিভিশনের সুইচ টিপে দেয়, আর কর্তামশাই দেখতে পান কত রকমের কত যুগের অতিকায় জীবজন্তু, কত লুপ্ত লিপি,

কত পরিচিত মুখ! মাঝে মাঝে অদ্ভুত-কিম্ভূত জিনিসও পর্দায় পড়ে। তিনি চমকে ওঠেন। আজও তেমনি একটা গভীর খাদের সামনে এসে তিনি চমকে উঠে বসেছেন বিছানার উপর। রাত্রি মাঝ সমুদ্রের মতো স্থির। কা-কা ক'রে একটা শব্দ উঠে আবার নিঃশব্দতার মধ্যে তলিয়ে গেল। কত্তামশাই ভাবেন, আজ কি তবে কাকজ্যোৎস্না? জ্যোৎস্নারাত অনেকদিন দেখেন নি। বালির চর—বড় বড় ঘন পাতাওয়ালা জামগাছ—আর জামগাছের চেয়েও কালো তার ছায়া। তিনি অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন—নিশ্চল ছবি। ভারি ইচ্ছে হল একবার চাঁদের আলোয় বেরিয়ে আসেন।

মশারি তুলে হাতটা জানলা দিয়ে বাড়িয়ে দিলেন। শীতল রাত্রি। আবার হাতটা নিয়ে এলেন নিজের কোলের কাছে। মনে হল হাতটা যেন চাঁদের আলোয় ভিজে গেছে। পাখির কোলাহলে কত্তামশাই উঠে পড়েছেন। শ্যাম এসেছে চা নিয়ে।

কত্তামশাই বললেন: হ্যাঁরে এটা কি শুক্লপক্ষ?

—আজ্ঞে, কাল তো অমাবস্যা গেছে।

—অমাবস্যা!

কাকজ্যোৎস্নার উপর অমাবস্যার ছায়া পড়ল। আবার তিনি বললেন: অমাবস্যা!

সকালের রোদ্দুর কত্তামশাইয়ের বিছানার উপর দিয়ে গড়িয়ে এসে পড়েছে শান-বাঁধানো মেঝের উপর। কত্তামশাইয়ের চুলে জামায় হাতে পায়ে রোদ্দুরের টুকরো চিক্‌-চিক্‌ করছে। কেবল যে অঞ্চলে কত্তামশাই বাস করেন সেখানে আলোর কোনো চিহ্ন নেই। কত্তামশাইয়ের এজন্য মনে কোনো ক্ষোভ নেই। আলোর এখন আর তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। অন্ধকার জগতে প্রাণের স্পন্দন, নতুন সৌন্দর্য তাঁর হাতের আয়ত্তে এসেছে। হারানো ঘরখানাকে নতুন ক'রে ফিরে পেয়েছেন। শ্যামের সাহায্যে সত্যের পরীক্ষা করতে না গেলে হয়ত কাকজ্যোৎস্নার আলো তাঁর জীবনে শাশ্বত হয়ে থাকত। একদিন মন তাঁকে সতর্ক ক'রে দিয়ে গিয়েছিল, বলেছিল, সত্যমিথ্যার যাচাই ক'রে নিতে একবার ভেবে দেখতে। তাই কত্তামশাই ঠিক করলেন সত্যমিথ্যা যাচাই ক'রে নেবেন ভাবনার পথে।

নতুন ভাবনার ধাক্কায় পুরনো ভাবনাকে হটিয়ে দেবার চেষ্টা অনেকদিন থেকে করছেন তিনি—এইসব ভাবনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আর একটা ভাবনায়

পৌঁছান যায় কি না। ক্রমে ছোট বড় অনেক ভাবনা দানা বেঁধে একটা মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে কর্ত্তামশাইয়ের সামনে। কতরকমের তাদের চেহারা—কতই না তাদের এগিয়ে আসবার ঢঙ! কেউ আসে ঢাল-তলোয়ার উঁচিয়ে 'লড় লেঙ্গে' বলতে বলতে। কেউবা চেপে বসে ঘাড়ের উপর সিন্দবাদের বুড়োর মতো—নামতেই চায় না। কতকগুলো ভাবনা কাতুকুতু দিতে থাকে, সেগুলো কর্ত্তামশাইয়ের মোটেই পছন্দ নয়। তাও সহ্য হয়, কিন্তু গেঁজে ওঠা ভাবনাগুলো যখন তাঁর সামনে ঘুরে বেড়ায়, ফেলে দিতে পারেন না। পিচকে যায়—পচা দুর্গন্ধ। সেগুলো থেকে মুক্তি পাবার পথ আজও তিনি ভেবে পান না। আজ তিনি ভাবনার বেড়াজাল থেকে যেমন ক'রে হোক বেরিয়ে আসবেন ঠিক করলেন।

তিনি ভাবনার মালিক, না, ভাবনারাই তাঁকে ঘানিতে ফেলে ঘোরাচ্ছে—এর একটা মীমাংসা করবার জন্য তিনি ঘুরে একটা স্থির আসন নেবার চেষ্টা করছেন। অতর্কিতে একটা মস্ত হাঁ-করা ভাবনার মধ্যে টেবিল চেয়ার সমেত কর্ত্তামশাই তলিয়ে গেলেন। ভাবনার গতি কি প্রচণ্ড হতে পারে এইবার তিনি বুঝতে পারছেন। যেমন অতর্কিতে ভাবনার মধ্যে তিনি তলিয়ে গেছিলেন, তেমনি আচমকা তিনি বেরিয়ে এলেন এক নতুন স্থানে। সামনে দেখেন এক সুন্দর উদ্যান। উদ্যানের ভিতর প্রবেশ ক'রে তিনি দেখলেন বাগানে চেনা-অচেনা নানা ফুলের সমাবেশ। একটি গাছে ফুল ফুটে আছে—তাঁর অতি প্রিয়, অতি পরিচিত মধুর গন্ধযুক্ত ফুল। নতুন পরিবেশে পরিচিত ফুলটি তিনি তুলে নেবার জন্য হাত বাড়ালেন। মুহূর্তের মধ্যে ফুলবাগান সবই অদৃশ্য হল—পরিবর্তে দেখা দিল এক জীর্ণ অট্টালিকা, দেখলেন দ্বার মুক্ত। ভেতরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন সারি সারি ঘর। কিন্তু সব ঘরের দরজায় তালাবন্ধ। তাঁর মনে হল ঘরের মধ্যে যেন কিছু আছে। তিনি চলেছেন এই তালাবন্ধ সারি সারি ঘরের পাশ দিয়ে। এক জায়গায় এসে তিনি দেখলেন—মস্ত একটা দরজা, কিন্তু তালা নেই। দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলেন। দেখেন বিরাট ঘর—কিন্তু কোথাও কিছু নেই। কেবল দেখতে পেলেন এক বিরাট আয়না। আয়না দেখলে সবারই ইচ্ছে হয় নিজের চেহারাটা দেখে নিতে। কর্ত্তামশাইয়ের সে ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠল। তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন আয়নার সামনে নিজেকে দেখবেন বলে। কারুকার্যখচিত ফ্রেমে আঁটা সুন্দর বিরাট আয়না—কিন্তু সেখানে কোনো প্রতিবিম্ব নেই।

এইবার কর্ত্তামশাই দেখলেন আয়নার উপর কিসের যেন ছায়া—তাঁর নিজের

নয়। কিন্তু, এ কি! এ যেন এক নগ্ন নারীমূর্তি! তিনি পেছতে পারছেন না, মুখ ফিরিয়ে নেবার শক্তিও নেই। অপলক চোখে চেয়ে আছেন সেই নগ্ন নারীমূর্তির দিকে।

কত্তামশাই নির্নিমেষ চেয়ে আছেন, ছায়ামূর্তিটির দিকে। সর্বাঙ্গ দিয়ে তাঁর 'ছি-ছি' রব উঠছে, কিন্তু চুম্বকের আকর্ষণে তিনি যাচ্ছেন আয়নার দিকে—আবার পিছিয়ে আসছেন। বলছেন : এ কি কেলেঙ্কারী! মনে হয় চেনা যেন মুখ। না এ অন্যায়, এ অন্যায়। কত্তামশাই উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন : এ কে! লাস্যময়ী, হাস্যময়ী, নগ্ন নারীমূর্তির ঠোঁটে অপরূপ হাসি।

—এতদিন ধরে যার কথা বসে বসে ভাবছিলে, আমি সেই।

—অসম্ভব! এসব খারাপ কথা আমি কখনো ভাবি নি।

—ভণ্ড!

—আমি ভণ্ড?

—কেবল ভণ্ড নও, তুমি কাপুরুষ।

—কি? আমি কাপুরুষ? আমি ভণ্ড?

বলেই কত্তামশাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন নারীমূর্তির দিকে। কিন্তু তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন।

ক্রোধে প্রজ্বলিত, লক্ষ্যভ্রষ্ট কত্তামশাই তখন ভয়ংকর আকার ধারণ করেছেন। চারদিকে দেখছেন বিভিন্ন মূর্তি, কিন্তু কোনোটাকেই তিনি আয়ত্তে আনতে পারছেন না।

দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে কত্তামশাই ছুটে বেড়াচ্ছেন বন্য মহিষের মতো। অবসন্নপ্রায় কত্তামশাই থমকে দাঁড়িয়েই দেখতে পেলেন নিজের প্রতিবিম্ব সেই আয়নাতে, যেখানে তিনি দেখেছিলেন লাস্যময়ীকে।

হাতে তখন তার একখানা রক্তাক্ত খাঁড়া।

কত্তামশাই যথারীতি চেয়ারে বসে আছেন। মনে তাঁর পরম শান্তি। মনে হচ্ছে যেন তিনি বিশ্বরূপ দর্শন ক'রে এলেন। উদ্বেগের কোনো তরঙ্গ উঠছে না তাঁর মনে। কেবলই মনে পড়ছে সমস্ত ঘটনা—জীর্ণ বাড়ি—ঝোলানো তালা—আয়না; কি এর অর্থ!

ভোজবাজির মতো পূর্বের ঘটনাগুলো ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে। কেবল মনে পড়ছে শেকল জড়ানো তালাবন্ধ ঘরগুলোর কথা। ঐ ঘরের মধ্যে কি আছে, কি নেই ভাবতে গিয়ে তিনি অনুভব করেন তাঁর ভেতরেও মস্ত একটা তালা। ঐ জীর্ণ ঘরগুলোর মতো তিনিও যেন একটা তালাবন্ধ ঘর। ভেতরে কি আছে কি নেই তা আজও তিনি জানতে পারেন নি!

কর্তামশাই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বিছানায় শুয়ে আছেন। স্ত্রী কন্যা শুভানুধ্যায়ী বন্ধু সকলেই তাঁর আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, বসে কথা কয়। সে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

কর্তামশাই সেরে উঠে যথাস্থানে এসে বসেছেন। শুয়ে থাকতে এখন আর ইচ্ছে করে না। নানারকম কুপথ্যের কথা ভেবে জিবটা বেশ রসাল হয়ে ওঠে। রোগ মুক্তির এ এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।

স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছেন। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি কেমন একটা মমত্ব অনুভব করছেন। মনে অহেতুক আনন্দ ফোয়ারার মতো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। শ্যাম ডাকছেঃ বাবু, গিন্নীমা এই ওষুধ আপনাকে খেয়ে নিতে বললেন।

কর্তামশাই ওষুধ খেয়ে ঢক ঢক ক'রে খানিকটা জল গলায় ঢেলে দিলেন। শ্যাম দেখছে যে ওষুধ খেয়েও কর্তামশাইয়ের কপালের চামড়া কুঁচকে গেল না। এই সংকেত থেকেই শ্যাম বুঝে নিল কর্তামশাইয়ের মেজাজ আজ বেশ ভালো।

কর্তামশাই জিজ্ঞেস করেন : কি শব্দ হচ্ছে রে?

—বাবু, ছাদ পিটোচ্ছে। পুবদিকে একটা বাড়ি হচ্ছে, ঐ জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। এদিক দিয়ে পুবের রোদ্দুর আর আসবে না।

—অ্যাঁ! বন্ধ হয়ে গেল!

—মস্ত বাড়ি হচ্ছে।

—আর কোনোদিকে জানলা খোলা নেই?

—আজ্ঞে, পশ্চিমদিকে জানলা ও দরজা খোলা রইল। ওখান দিয়ে বিকেলের রোদ আসবে।

—রোদ তো আসবে! তাহলেই হল।
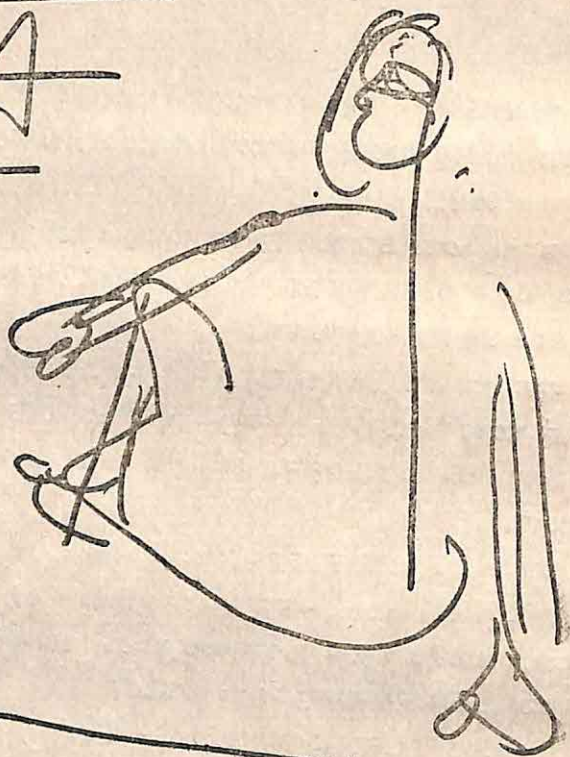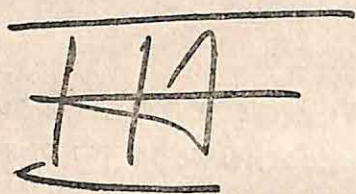
শ্যাম কর্ত্তামশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আজ তার বাবুকে আর তেমন ভয় করছে না।

—বাবু, আমি পুতুল বানিয়েছি।

—পুতুল, কই দেখি!

এই বলে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিতেই একটা ছোট জিনিস হাতে পড়ল। কর্ত্তামশাই আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন নিখুঁত মসৃণ ছোট্ট একটি গরু।

—তুই করলি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি দিয়ে করলি?

—আজ্ঞে মোম দিয়ে।

—আমায় একটু মোম দে, আমিও পুতুল করব।

কর্ত্তামশাইয়ের দুপুরের নিদ্রা ছুটে গেছে। শ্যাম আর কর্ত্তামশাই বসে বসে পুতুল বানান। তিনি বসেন চেয়ারে, শ্যাম বসে মাদুরে, এই যা তফাত। হু হু ক'রে দিন কেটে যায়। কখন ট্রেন গেল, ফিরিওয়ালা কি হেঁকে যাচ্ছে, এ সব শব্দ আর কর্ত্তামশাইয়ের কানে আসে না। নমনীয় মোম আঙুল দিয়ে টিপে কখনো লম্বা কখনো গোল তিনি যেমন ইচ্ছে করছেন।

শ্যাম বলে : বাবু একটা পুতুল করুন।

মোম টিপতে টিপতে ক্রমে ক্রমে আঙুলগুলো বেশ সড়গড় হয়ে উঠেছে। ক্রমে ইচ্ছার ছাপ মোমের উপর পড়তে লাগল। ছাপে ছাপে আর একটা আকার বেরিয়ে আসতে লাগল। এখন পুতুলগুলো দেখে শ্যাম চিনতে পারে, কোনটা জন্তু কোনটা মানুষ।

একদিন কর্ত্তামশাই বললেন : হ্যাঁরে দেখি তোর গোরুটা।

—আজ্ঞে সেটা ভেঙে ফেলেছি। একটা কুকুর করব?

—ভেঙে ফেলেছিস?

—মোম আর নেই, কিন্তু কুকুর করতে খুব ইচ্ছে করছে। আমাদের বাড়িতে একটা কুকুর আছে।

কর্ত্তামশাইয়ের পুতুল বানাতে বানাতে মোম ফুরিয়ে গেছে। শ্যামের কাছেই তাঁর

শিক্ষা। পুরনো পুতুল ভেঙে আবার তিনি নতুন পুতুল গড়ে তোলেন। পুতুল গড়বার জিনিসের অভাব মিটেছে। কত্তামশাই পুতুল গড়েন আর সাজিয়ে রাখেন। এক হাতে পুতুল টিপে যান, আর এক হাতে পুরনো পুতুলগুলোর ওপর হাত বোলান।

একদিন কত্তামশাইয়ের মনে হল যেসব পুতুল তিনি এত যত্ন ক'রে তৈরি করছেন সেগুলো ঠিক হচ্ছে, না ভুল হচ্ছে, কি ক'রে এ সমস্যার সমাধান হবে। তিনি যা দেখেন তা তো অন্যে দেখে না, অন্যে যা দেখে তিনি তা দেখেন না। এতদিন পরে আজ তাঁর মনে হল একজন মনের মতো বন্ধু পেলে তাঁকে দেখিয়ে পুতুলগুলো যাচাই ক'রে নিতেন।

জাল ফেলে জলের মাছ ডাঙায় তোলা যায়, কিন্তু জাল ফেলে বন্ধু পাকড়াও করা যায় না। ভাগ্যচক্রে দৈবাৎ কখনো সত্যিকারের বন্ধু জোটে। কিছুদিন থেকে চাটুজ্জের সঙ্গে কত্তামশাইয়ের বন্ধুত্ব জমে উঠেছে।

চাটুজ্জে রোদ-জলে সংসারবৃক্ষের পরিপক্ক ফল—কোথাও দরকচা নেই, যাকে বলে নির্খিচ বৃদ্ধ। কেচ্ছা থেকে শুরু ক'রে ভালমন্দ গভীর তত্ত্বকথা সবই দু-জনের মধ্যে হয়। অনেক প্রশ্ন কত্তামশাই করেন কেবলমাত্র চাটুজ্জের রসাল উক্তি শোনবার জন্য। কথায় কথায় একদিন কত্তামশাই প্রশ্ন করলেন : চাটুজ্জে, তোমার কোনো-দিন ভগবান দর্শনের ইচ্ছে হয় নি ?

—হ্যাঁ, একবার হয়েছিল—দেখেওছি।

—তুমি ভগবান দেখেছ ?

—হ্যাঁ, চাক্ষুষ। তাহলে তোমায় বলি।...

অনেকদিন আগে আমি একবার তীর্থ দর্শনে গেছিলাম। তীর্থস্থানটা ঠিক কোথায় তা এখন আমার আর মনে নেই। সেখানে কত দেবদেবীর পায়ে যে ফুল চড়ালাম ! গাঁটের পয়সা পাণ্ডারা শুষে নিল। একদিন আমার পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করলাম—পাণ্ডাঠাকুর, অনেক তো মূর্তি দেখলাম। সত্যিকারের ভগবান আছে কি ? তোমরা কিছু বলতে পার ? বলতেই পাণ্ডাঠাকুর বলে কি—চলুন, আপনাকে দেখিয়ে আনি। কিন্তু পয়সা লাগবে।

যাই হোক যদি চোখাচোখি ভগবান দেখা যায় তাহলে পয়সা খরচ করতে আপত্তি নেই।

পাণ্ডা আমাকে নিয়ে গেল এক জায়গায়। দেখি দুই বুড়ো—জটাধারী ছাই মেখে মুখোমুখি বসে আছে। পাণ্ডা বলল—এইখানে দাঁড়ান, সব দেখতে পাবেন। কি দেখলাম জানো? সেই দুই বুড়োর মাঝখানে অনেকগুলো নুড়ি পড়ে আছে। একজন তার মুঠিখানা দেখিয়ে বলল, টক্কা না ফক্কা? অপরজন বলল, টক্কা। প্রথম-জন অমনি তার হাতের চেটোটা অন্যজনের নাকের কাছে ঘুরিয়ে বলল, ফক্কা। একজন যেই বলে, টক্কা—অন্যজন বলে, ফক্কা। এই সমানে চলল। কিছুতেই ঠিক হয় না, টক্কা না ফক্কা।

পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কতদিন ধরে এরা এরকম করছে? পাণ্ডা বলল, আমাদের পুঁথিতে লেখা আছে সত্যযুগ থেকে এ খেলা শুরু হয়েছে। আমাদের চোদ্দ পুরুষ থেকে এই খেলা সকলে দেখে আসছেন।

শুধালাম, কবে এ খেলা শেষ হবে?

পাণ্ডা বলল, আমরা জানি না বাবু, কবে এ খেলা শেষ হবে।

—তবেই বোঝ কত্তা, পাণ্ডা যা বলতে পারে না, তুমি আমি কি ক'রে বলব তা?

—এ চাটুজ্জে তোমার বানানো কথা।

—কে বললে বানানো কথা! তোমার হাতের পুতুলটা তোমার টক্কা—আমার হাতে দিলে সেটা ফক্কা হয়ে যাবে। এবার বুঝেছ?

—তাহলে তুমি ভগবান মান না?

—কে বললে! জানো কত্তামশাই বড় সমস্যার মধ্যে ঢুকলেই তুমি টক্কা-ফক্কার খেলা দেখবে। এই যে তুমি পুতুল করছ—তোমার এই মোমের মধ্যে কি আছে আমি কি জানি! হয়ত স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স ডিপার্টমেণ্টে এ খবরটা পাঠালে তারা হিসেব ক'রে বলে দিতে পারত কে ঠিক।

কত্তামশাই: এত হাসির রসদ চাটুজ্জে তুমি পাও কোথা থেকে? আমি তো তোমার মতো হাসতে পারি না!

চাটুজ্জে: এ হল আমার বরফগলা হাসি কত্তা। আর একদিন এসব কথা হবে। আজ আসি।

চাটুজ্জের শেষ কথাটা শুনে কত্তামশাইয়ের মনটা কেমন দমে গেল। পুতুলটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন আর ভাবছেন চাটুজ্জের কথা। এমন সময় বিনা নিমন্ত্রণে বটুক মাইতি এসে উপস্থিত। লোকটিকে কত্তামশাই সহ্য করতে পারেন

না। ভদ্রলোক পরের উপকার করার জন্য আঁকপাঁক ক'রে বেড়ান। মানুষ পেলেই তাকে উপদেশ দিতে শুরু করেন। বটুক মাইতি ঘরে ঢুকে বললেন : চাটুজ্জে এখানে এসেছিল না?

কত্তা : হ্যাঁ এসেছিল।

বটুক : সে কিছু বলল?

কত্তা : না, তেমন কিছু তো বলে নি!

বটুক : আপনি শোনেন নি তার উপযুক্ত পুত্র অ্যাকসিডেন্টে মারা পড়েছে!

কত্তামশাই আঁতকে ওঠেন, বলেন : কই আমি তো কিছু জানি না!

বটুক : ঐ তো মজা। রোজগেরে ছেলে মরল আর বাপ দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সান্ত্বনা দিতে গেলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। এমন মানুষ কখনও তো দেখি নি মশাই। আজ ক'মাস আমার ঘড়িটা চুরি গেছে, সেই কথা ভেবে রাত্রে আজও আমার ঘুম হয় না। কত্তামশাই, আপনারও ধাত আমি বুঝি না। ছেলেমানুষের মতো মোম টিপে টিপে আর কতদিন কাটবে? একটু পরকালের চিন্তা করলে হয় না?

কত্তামশাইকে পরকালের চিন্তা করার সুযোগ দিয়ে বটুক মাইতি চলে গেল। কত্তামশাই কিন্তু পরকালের চিন্তা করতে পারছেন না।

চাটুজ্জে ঘরে ঢুকে বললেন : আজ বেশ সমারোহ ক'রে চা খেতে হবে!

ছোট জলচৌকির উপর ট্রে নিয়ে চাটুজ্জে বসেছেন। শ্যামকে ফরমাস করছেন চায়ের সরঞ্জামের জন্য। পট থেকে কাপে চা ঢালার শব্দ পাচ্ছেন কত্তামশাই। উভয়েই নীরব। নীরবতা ভঙ্গ করলেন কত্তামশাই প্রথম। বললেন : চাটুজ্জে, তোমার একটা ব্যবহারে আমি খুব দুঃখ পেলাম।

—কি ব্যবহার?

—কয়দিন আগে তোমার এতবড় একটা বিপদ গেছে সেকথা তুমি আমায় বল নি কেন?

—আমার বিপদের সংবাদ তোমার কাছে পৌঁছল কি ক'রে? এ নিশ্চয়ই আমাদের বটুক মাইতির কাজ, তোমার আনন্দটা নিভিয়ে দিয়ে কি লাভ? আর যদি সান্ত্বনার কথাই বল, পুত্রশোক কি বাইরের সান্ত্বনায় ঘোচে! কত্তা, তোমার

একথা বোঝা উচিত। চরম দুঃখের সান্ত্বনা নিজেকেই খুঁজে পেতে হয়। স্ত্রী পুত্র কেউ নেই যে চরম দুঃখে সান্ত্বনা দিতে পারে।

চায়ের কাপে চামচ নড়ছে। ঠুং ঠুাং আওয়াজ। চায়ের কাপটা কত্তামশাইয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে চাটুজ্জে বললেন : এই নাও চা। ব্যাপারটা কি জান? ঐ যে কথায় আছে, বউ রেঁধেছে ঝালের ঝোল, খেতে যেন গুড় অম্বল। আমার ও তোমার ঐ এক অবস্থা। নাক দিয়ে চোখ দিয়ে জল ঝরছে, তবুও বলতে হচ্ছে 'ঈশ্বর কৃপাময়'।

অভ্যাস বা সংস্কার যাই নাম দাও—ওটা যদি বদলে ফেলতে পার, তাহলে ঝাল মিষ্টিতে কোনো তফাত থাকে না। কিন্তু বদলাতে পারছি কই? ছেলেকে খাওয়াব পরাব ঠিকই ভেবেছিলাম। কিন্তু পার্সেল ক'রে স্বর্গে তাকে পিণ্ডি পাঠাতে হবে, এ কথা কোনোদিন ভাবি নি কত্তা। তাই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে হবে শুনে কেমন জবুথবু হয়ে যাচ্ছি। জানি, কর্তব্য। কিন্তু—কাপটা দাও, আর এক কাপ চা দিই। তোমার কাপ-টাপগুলো আগের মতো পরিষ্কার নেই!

—আমিও লক্ষ করছি।

—যাক সেকথা পরে হবে। তুমি চা খাও, আমি চলি।

চাটুজ্জে অকস্মাৎ উঠে গেল।

কে এক সাধু পাড়ায় এসেছে। খবরটা হাওয়ায় উড়ে কত্তামশাইয়ের কানের মধ্যে প্রবেশ করল, কিন্তু আঁতে ঘা দিল না। মোমের তাল টিপে দিন তাঁর যেমন কাটছিল তেমনই কাটতে লাগল।

সেদিন সন্ধ্যায় কত্তামশাই একা ঘরে মস্ত একটা মোমের তালের উপর আঙুল চালিয়ে চলেছেন। তিনি বেশ দেখতে পাচ্ছেন একটা বেড়াল মোমের তালের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাকে খুঁজে পাচ্ছেন না। মোমের তালের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ক'রে কত্তামশাই হয়রান হয়ে যাচ্ছেন। এমন সময় বেড়ালের লেজটা তাঁর মুঠোর মধ্যে ধরা পড়ে গেল। এবার আর বেড়াল পালাতে পারবে না। কত্তামশাই মহানন্দে বেড়ালের ঠ্যাং, মাথা, ধড় সব টেনে বের করতে লাগলেন। বেড়ালের কান দুটো কোথায় গেল, এবার তারই সন্ধান করছেন কত্তামশাই। এমন সময় কত্তামশাইয়ের ধ্যান ভঙ্গ হল। মনে হল, তাঁর কাছাকাছি কে যেন রয়েছে।

কত্তামশাই জিজ্ঞেস করেন : ঘরে কে ? উত্তর পান : আমি তোমার চাটুজ্জে। সাধুজী এসেছেন তোমার পুতুল তৈরি দেখতে। তোমার সামনেই তিনি বসে আছেন।

কত্তামশাই : আমি কিছুই জানতে পারি নি কেন ?

চাটুজ্জে : যখন তুমি মোমের তাল নিয়ে ধস্তাধস্তি করছিলে সেই সময় আমরা এসে বসেছি। তোমার সঙ্গে এইবার সাধুবাবার পরিচয় করিয়ে দিই।

সাধুবাবা ; পরিচয় তো হয়েই গেছে বাবাজী, তোমার পুতুল তৈরি দেখতে এসেছিলাম। দেখছি, এ তো মল্লযুদ্ধ।

কত্তামশাই : আপনি ঠিকই বলেছেন। এ এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। মোমের মধ্যে আছে সব, তাদের টেনে বের করতে হিমসিম খেয়ে যাই। কোনো মন্ত্র-টন্ত্র যদি থাকত এগুলোকে টেনে বের করবার তাহলে বেশ হতো।

সাধুবাবা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বলেন : মন্ত্রশক্তিতেই তো তোমার এইসব হচ্ছে।

ইতিমধ্যে চাটুজ্জে পুরনো পুতুলগুলো তাক থেকে নামিয়ে সাধুজীর সামনে রেখেছেন।

সাধুজী : এ এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছ। যে মন্ত্রশক্তিতে এইসব সৃষ্টি হয়েছে তারই সাধনায় তোমার যেন বাধা না পড়ে, এই তোমায় আশীর্বাদ করি।

কত্তামশাইয়ের ইচ্ছে দু-চারটে ধর্মকথা শোনেন। কিন্তু সাধুবাবা ধর্মকথা কইতে নারাজ। তিনি কেবল প্রশ্ন করেন পুতুল নিয়ে। কথা কইতে কইতে কত্তামশাই হাতখানা টেবিলের উপর বাড়িয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশলাইয়ের বাক্সটা নিয়ে চাটুজ্জে বললেন, এই নাও। কত্তামশাই তাড়াতাড়ি হাতখানা টেনে নিয়ে বললেন, এখন থাক।

সাধুবাবা : বাবাজী তুমি সিগারেট খাবে তো খাও।

কত্তামশাই : আজ্ঞে না, আমি অনেকগুলো অন্যায় ক'রে ফেলেছি। আপনাকে প্রণাম করা হয় নি।

সাধুবাবা : প্রণাম পরে হবে। তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, তোমার ঘরে যদি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এসে উপস্থিত হন, আর বলেন, তোমার আসন তৈরি—এস আমাদের সঙ্গে—তখন তুমি কি জবাব দেবে ?

কত্তামশাই : এ তো আপনার অদ্ভুত প্রশ্ন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর আমার ঘরে আসতে যাবেন কেন ?

সাধুবাবা : যদির কথা হচ্ছে। যদি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর আসেন, আর তোমাকে ঐ কথা বলেন, তখন তুমি কি করবে ? কি জবাব দেবে ?

কর্তামশাই এবারও কোনো জবাব দিতে পারেন না।

সাধুবাবা : বলবে, হে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, একটু অপেক্ষা কর। আমার হাতের কাজ শেষ করি, তারপর দেখা যাবে।

কথাটা বলেই সাধুবাবা আর একবার উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠেন।

চাটুজ্জে : তোমার পুতুলগুলো যথাস্থানে রেখে গেলাম। সিগারেট দেশলাই তোমার সামনেই রইল।

সাধুবাবা : বাবাজী ঐ কথাই রইল।

তারপরেই দ্রুতপদে সাধুবাবা ও চাটুজ্জে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সাধুবাবার সঙ্গে আর একবার দেখা করবার ইচ্ছে হয়েছে শুনে চাটুজ্জে বললেন: বেশ তো, চল সাধুদর্শন ক'রে আসবে।

কর্তামশাই কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠতে নারাজ। চাটুজ্জে কর্তামশাইয়ের কোনো ওজর শুনলেন না। বললেন: জড়ভরত হয়ে থেকে কি লাভ? চল, মনে যখন ইচ্ছে হয়েছে, চল। তাছাড়া ভদ্রতাও তো আছে! একজন সাধু মানুষ যখন তোমার কাছে এলেন, তখন তোমারও যাওয়া উচিত।

জামা বদলে, ধুতি পাল্টে, লাঠি হাতে চাটুজ্জের সঙ্গে কর্তামশাই চলেছেন সাধুদর্শনে। কর্তামশাইয়ের মনে হচ্ছে অনেকখানি হাঁটা হল। চাটুজ্জের বাড়ি এত দূর তো নয়! চাটুজ্জে বললেন : অভ্যাস নেই কিনা! তোমায় ঠিক নিয়ে যাচ্ছি।

এবার কর্তামশাই ঠিক বুঝেছেন যে চাটুজ্জে তাঁকে তার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে না। কর্তামশাই বললেন : আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

—সাধুবাবা চলে গেছেন কিনা, তাই তোমায় একটু হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে এসেছি। সন্ধের এই হাওয়া সাধুসঙ্গের চাইতে কম পবিত্র নয়।

ফেরার পথে চাটুজ্জে বললেন : কর্তা, আকাশে আজ অনেক তারা! অন্ধকার আকাশে তারার ঝিকিমিকি দেখতে বেশ লাগছে। আচ্ছা তোমার আকাশে তারা নেই?

কর্ত্তা ঃ না, আমার আকাশে কোনো তারা নেই। সে আকাশ গাঢ় অন্ধকার।

চাটুজ্জে : খুঁজে দেখ, হয়ত একদিন ধ্রুবতারার সন্ধান পাবে তোমার ঐ আকাশে।

চাটুজ্জে কর্ত্তামশাইকে নিজের বসবার ঘরে এনে বসিয়েছেন। কর্ত্তামশাইয়ের হাতে একটা গেলাস ধরিয়ে দিয়ে চাটুজ্জে বললেন : ভাল ক'রে ধর, একটু হুইস্কি দেব। তোমার জন্য ছোট পেগ, আমার জন্য ডবল ডোজ।

দু-জন ধীরে ধীরে গেলাসে চুমুক দিচ্ছেন। চাটুজ্জের মুখে বিশেষ কোনো কথা নেই। এবার চাটুজ্জে মুখ খুললেন, বললেন : একটা কথা আছে। ঘাবড়ে যেও না ; তোমার শ্যামের গোঁফের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সে খবর বোধহয় রাখো না ? আর তোমার পাশের বাড়িতে মৃগনয়নী এসেছে— ভারি চিত্তাকর্ষক তার নির্লজ্জতা। কাজেই বাড়ির শান্তিভঙ্গ হতে পারে। ঘ্রাণশক্তিটা আর একটু প্রখর ক'রে তুললে বুঝতে পারবে, শ্যামের গায়ে মাথায় খুশবাই ভুর ভুর করছে, আর বাড়ির কাপ গ্লাস চামচে পেঁয়াজ রসুন আর আঁশটে গন্ধ ততই বাড়ছে।

চাটুজ্জে যখন কর্ত্তামশাইকে স্ব-স্থানে পৌঁছে দিতে এলেন তখন শ্যাম বাড়ি নেই। শ্যাম ঘরে ঢুকতেই উগ্র সেন্টের গন্ধ পাওয়া গেল। তিনি ধমক দেবার চেষ্টা করার পূর্বেই চাটুজ্জে তাঁকে থামিয়ে দিলেন।

চাটুজ্জের সতর্কবাণী কার্যকর ক'রে তুলবার পূর্বেই যৌবনের হাওয়া প্রচণ্ড বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে কর্ত্তামশাইয়ের অভ্যাসগত জীবনটাকে তছনছ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে।

ক্রমে কর্ত্তামশাই বুঝতে পারলেন শ্যাম কতটা উদ্দাম হয়ে উঠেছে। এ এক নতুন বিভ্রাট। নিজেরই আশ্চর্য লাগছে কর্ত্তামশাইয়ের যে এত অব্যবস্থার মধ্যেও তাঁর ভেতরটা অস্থির হয়ে উঠছে না। মনে পড়ল অনেক কাল পূর্বের কথা —যখন এর চেয়েও ভয়ঙ্কর তাণ্ডবলীলার মধ্যে তিনি ঘুরপাক খেয়েছিলেন। তখন তার ভেতরটা ছিল অস্থির, বাইরেটা স্থির। এখন ভেতরটা স্থির—বাইরেটা অস্থির।

চকিতে মনে পড়ে গেল সাধুবাবার কথা—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এলেও হাতের কাজ বন্ধ না করতে। সে কথাটার তাৎপর্য আজ তাঁর কাছে স্পষ্ট হল।

চাটুজ্জ্যে মশাইয়ের পুত্রের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া শেষ হবার পরে তিনি এলেন কর্ত্তামশাইয়ের কাছে। ঘরে ঢুকতেই বললেন: কর্ত্তা, এবার চললাম তীর্থ করতে।

চাটুজ্জের মুখের কথায় এটুকু বোঝা গেল তাঁর স্ত্রী কোনো তীর্থে গিয়ে থাকতে চান। তাঁকেই সঙ্গ দেবার জন্য চাটুজ্জে যেতে প্রস্তুত হয়েছেন। চাটুজ্জে বললেন: তোমার কোনো ভাবনা নেই, আমি জলধরকে বলে গেলাম, লোকটি ভাল। সে-ই তোমাকে সঙ্গ দেবে।

কর্ত্তামশাই তিক্তস্বরে বলে উঠলেন: এ তোমার কি রকম পরিহাস! জলধরের সঙ্গ ভাবতেই আমার আতঙ্ক। অকাল-বৃদ্ধ, কেবলই নিজের কথা বলে, আর কত রকমের ব্যামো আছে তারই ফিরিস্তি দিয়ে চলে।

—না না, জলধর লোক ভাল। তার মনে কোনো কু নেই। কতগুলো অভ্যাস পালটে দিতে হবে, এই আর কি!

—এই বুড়ো বয়সে জলধরের জন্য আমি অভ্যাস পালটাতে পারব না।

—আহা! অত উত্তেজিত হও কেন? মানুষে মানুষে আর ঝগড়া হয় কটা! যত ঠোকাঠুকি অভ্যাসে অভ্যাসে। এদিক দিয়ে আমি তোমাকে অনেক কিছু শেখাব! তবে এইবার উঠি কর্ত্তামশাই, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তোমার একটা পুতুল নিলাম। নতুন রকমের সাধনপদ্ধতি শিখব।

—তোমার কথা তুলে নাও চাটুজ্জে! শেখাবার দম্ভ আমি রাখি নে। এখানে আমার কোনো আত্মবঞ্চনা নেই।

কর্ত্তামশাই বুঝতে পারলেন চাটুজ্জে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল চাটুজ্জে ঘরের মধ্যেই রয়েছে। কর্ত্তামশাই বলে ওঠেন, চাটুজ্জে, তুমি এখনও যাও নি?

চাটুজ্জে: দেখছি তোমার চুলগুলো ধুতরো ফুলের মতো শাদা হয়ে গেছে।

কর্ত্তামশাই: চুলগুলো সব শাদা হয়ে গেছে?

চাটুজ্জে: হ্যাঁ, কালিমাবর্জিত শুদ্ধ শুভ্রতা! আচ্ছা, এবার চলি। চিঠিপত্র বিনিময়ের কোনো প্রয়োজন দেখি না। একদিন তুমি খবর পাবে আমি মরেছি, কিংবা আমি পাব তোমার মৃত্যুসংবাদ। যে আগে খবরটা পাবে তারই দুঃখ। কাজেই খবর না পাওয়াই ভাল।

দ্বিতীয় অংশ

ইতিমধ্যে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে ঋতু-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। কত্তামশাই বুঝতে পারেন বছর ঘুরছে। লোকের মুখে শোনেন সন-তারিখের কথা। বছরও কাটছে, আশেপাশের অবস্থাও বদলাচ্ছে। শ্যামকে নিয়ে গিয়েছে তার বাপ বিয়ে দিতে। শ্যাম এখনো মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যায়। বুক হাত পা এখন তার লোহার মতো শক্ত। কত্তামশাইকে পুতুলের কথা জিজ্ঞেস করে। তৈরি পুতুল নেড়েচেড়ে দেখে।

—কি রে এখন পুতুল গড়িস ?—কত্তামশাই শুধান।

—না বাবু, সময় পাই না, অনেক কাজ।

তার হাতে গড়া দুটো পুতুল তাকের উপর ছিল। সে তাকিয়ে দেখে।

—নিয়ে যা না তোর পুতুল । বাড়িতে তোর বৌকে দেখাবি।

—না বাবু, তারা এসব পছন্দ করবে না।

মোমের মতো শরীর ও মন নিয়ে শ্যাম এ বাড়িতে ঢুকেছিল। এখন তার শরীরটা যেমন কঠিন, ভেতরটাও তেমনি ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে আসছে। কত্তামশাই ভাবলেন, আর একটা ফসিল তৈরি হচ্ছে প্রকৃতি দেবীর হাতে।

একদিন চৈত্র-মধ্যাহ্নের ঘূর্ণি হাওয়ায় ঘুরতে ঘুরতে অন্ধকারে যে আসনে তিনি ছিটকে পড়েছিলেন, আজও তিনি সেই চেয়ারে বসে আছেন।

অনেকদিন হয়ে গেছে। কত্তামশাইয়ের ক্যালেণ্ডারে সন তারিখের চিহ্নগুলো ঠিকমতো না পড়লেও, পালিশ চটে-যাওয়া কুর্সি, সেলাই-ছেঁড়া গদি এবং মরচে-ধরা হাত-পায়ের কব্জাগুলোর সাক্ষ্য থেকে কত্তামশাই অনুমান করতে পারেন যে সময় কম বয়ে যায় নি।

বাগানে বড় আম গাছটার গা ঘেঁষে একটা অজানা বড় বড় পাতাওয়ালা গাছ লম্বা হয়ে উঠেছে—পুরনো আম গাছটা প্রায় ঢাকা পড়ে এসেছে। দশ আঙুলের স্পর্শে আম গাছকে অনায়াসে তিনি অনুভব করতে পারেন না। ঘরের সামনের রাস্তাটায় ঘাস গজিয়ে পাশের জমির সঙ্গে এক হয়েছে। সন্ধে বেলায় এক এক সময় ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ শোনা যায়।

কত্তামশাইকে যাঁরা চিনতেন তাঁরা অনেকেই আজ আর নেই। নতুন পায়ের শব্দ, নতুন কণ্ঠস্বর ও অপরিচিত কোলাহলের একটা প্রবাহ তাঁর চারদিকে ঘুরে চলেছে। তারই মধ্যে তিনি আছেন একাকী, স্থির। নতুনের জয়গান নিয়ে যারা ঘোরে ফেরে কত্তামশাইয়ের সম্পর্কে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। কত্তামশাইয়ের সাধ্য নেই এই কোলাহলের অংশ হয়ে ওঠা। উভয়ের মধ্যে কালের বিপুল ব্যবধান।

জলধর এখনো যাওয়া-আসা করে। দুরারোগ্য রোগে সে আক্রান্ত। তাই অসুখের কথা ভুলে থাকবার চেষ্টা করে। জলধর বলে : কত্তামশাই, আমি তো আজ আছি কাল নেই। তোমাকে সঙ্গ দেবার মতো কাউকে খুঁজে পাই না।

সঙ্গ দেবার উপযুক্ত লোক খুঁজতে খুঁজতে একদিন জলধর রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেল। জলধরের সঙ্গে সঙ্গে কত্তামশাইয়ের জীবনের অতীত ইতিহাস একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল।

শ্রাবণের শেষ বর্ষণ। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। বৃষ্টির আওয়াজে অন্যসব শব্দ মুছে গেছে। সকাল থেকে কত্তামশাই ভাবছেন কেষ্ট কখন আসবে—কখন একটু চা পাওয়া যাবে। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে কেষ্ট এসে পৌঁছাল না। সময় কত হল ? কটা বাজবে ? জানবার যতরকম উপায় কত্তামশাই উদ্ভাবন করেছিলেন তার কোনোটিই আজ কাজে লাগছে না। পোড়া সিগারেটের টুকরো গুণে কত্তামশাই সময়ের একটা অনুমান ক'রে থাকেন। কিন্তু আজ সিগারেট নেই, তাই সে অনুমানে পথ বন্ধ।

ঘরের মধ্যে অল্প অল্প পায়চারি করছেন। লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে কত্তামশাই ভাবছেন কেষ্ট কখন আসবে ! সময় কাটাবার একটা উপায় উদ্ভাবন ক'রে ফেললেন এই আপৎ সময়ে। দেশলাইয়ের কাঠিগুলো বাক্স থেকে বার ক'রে ছড়িয়ে ফেলেছেন টেবিলের উপরে—সেগুলো গুণে গুণে বাক্সে রাখছেন—আবার সেগুলো বাক্স থেকে বার ক'রে ছড়িয়ে দিচ্ছেন—আবার ভরে দিচ্ছেন বাক্সে। শরীরটা থেকে থেকে জানান দিচ্ছে চায়ের সময় হল। সিগারেট খাওয়া হল না। ক্ষুধার তাড়না অনুভব করছেন। নিশ্চিত অনেক বেলা হল। কই কেষ্ট তো এল না ! এমন সময় খস্ ক'রে একটা আওয়াজ—চিঠি। পোস্টম্যান বলে গেল বেলা প্রায় একটা।

বৃষ্টির জোর এখন যেন কিছুটা কম। শব্দের বৈচিত্র্য ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে কলাঝাড়ে—বৃষ্টির আওয়াজ জামগাছের ঘন পাতার উপর—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এতক্ষণে বুঝতে পারলেন তিনি।

বৃষ্টির জোর এখনো কতটা জানবার জন্য কত্তামশাই একখানা খবরের কাগজ জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে দিলেন বাইরের দিকে। কাগজের উপর বৃষ্টিধারার এক নতুন রকমের শব্দ। কলাপাতার উপর বৃষ্টিধারার থেকে অনেক তফাত। কিন্তু বেশিক্ষণ এই শব্দ শুনতে হল না—কাগজটা যে ভিজে কাদা হয়ে গেছে এটা বুঝতে পারলেন। বৃষ্টির জোর এখনো কমল না। প্রতিবেশীদের ঘর থেকে অল্প অল্প আওয়াজ আসছে। বৃষ্টির তেজও কমে এসেছে। দরজায় জোর আঘাত পড়ল—কেষ্টর কণ্ঠস্বর। দরজা খুলে দিতে কেষ্ট ঘরের মধ্যে দিয়ে রান্নাঘরে যেতে যেতে বলল: বাবু, সব্বনাশ! দেশ ভেসে গেল—দুর্ভিক্ষ-মহামারী—আর রক্ষে নেই।

কেষ্ট কত্তামশাইয়ের নতুন ভৃত্য। সবসময় তার কাঁধে একটা ট্রানজিস্টর ঝোলানো থাকে—কিন্তু তাতে ব্যাটারি নেই। কেষ্টর খবর শোনার বাতিক। খবরের সময় হলেই হাতের কাজ অসমাপ্ত রেখে সে ছুটে বেরিয়ে যায়। আজও কোনোরকমে কাজ সেরে সে বললে: বাবু, আজ ভীষণ খবর। আমি চললাম—।

কেষ্ট বেরিয়ে যেতেই হুড়মুড় ক'রে বৃষ্টি নামল। শেষবারের মতো কেষ্টর কণ্ঠস্বর কানে গেল: ফিউজ! ফিউজ! সব অন্ধকার! দুনিয়া অন্ধকার!

অন্ধকারের মধ্যে একা থেকে কত্তামশাই অভ্যস্ত। কিন্তু কোথাও আলো নেই মনে করতে তাঁর মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে অন্ধকারের উপর ব্যাঙের ছাতার মতো ছোট বড় নানা আকারের ভয় গজিয়ে উঠছে।

ভয়—কিন্তু কিসের ভয়ে তিনি শঙ্কিত তা বুঝে উঠতে পারছেন না। নানা কল্পনা মনে আসে। মুহূর্তের মধ্যে তা অলীক কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে পারছেন, কিন্তু ভয়ের হাত থেকে নিস্তার নেই। অদূরে বজ্রপাত হলে মানুষ যেমন মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়ে তেমনি বিহ্বলতার মধ্যে কত্তামশাই অনুভব করলেন মৃত্যুভয়। কালোর উপর অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিবর্ণ ছাতা-পড়া একটা ভয়—আর সব অন্ধকার।

মৃত্যুর কথা কে না ভেবেছে! যুগে যুগে মানুষ মৃত্যুর কল্পনা করেছে, কিন্তু তার সত্য পরিচয় কেউ-ই দিয়ে যেতে পারে নি। মৃত্যুর কল্পনা কালে কালে বদলেছে, কিন্তু এক বিষয়ে কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। মৃত্যু যে অতি শক্তিশালী সেটা

আকারে প্রকারে মানুষ কাব্যে শিল্পে মূর্ত ক'রে গেছে। এই প্রবল শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে এই জীর্ণ বৃদ্ধ কত্তামশাইয়ের সংগ্রাম করা যে বাতুলতা তা তিনি বুঝলেন।

আজ এই বর্ষার রাত্রে যদি মৃত্যু তাঁকে আক্রমণ করে তবে কেউ তা জানতে পারবে না। মৃত্যুর আকস্মিক আক্রমণে তিনি যদি চিৎকার করে ওঠেন, সে শব্দ কারো কানে যাবে না। সকলের অজ্ঞাতে তাঁর মৃত্যু ঘটবে, এ কল্পনায় তিনি আরও শঙ্কিত হয়ে উঠছেন। মাতালের মতো টলতে টলতে মৃত্যু যদি এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে! কিংবা একটা অতিকায় অজগর যদি হঠাৎ পা থেকে জড়িয়ে ওঠে তবে তিনি কি করবেন!

মৃত্যুভয়ের সঙ্গে অভ্যাসগত প্রয়োজনগুলোর দাবি ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। আহার ও শয়নের প্রয়োজন বোধ করছেন কত্তামশাই। যথাসাধ্য কিছু খেয়ে নিয়ে মশারির মধ্যে গিয়ে ঢুকতে পারলে হয়ত ভয়টা কেটে যাবে। ভয়ে জড়সড় হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ঘরের মাঝখানে। কোনোদিকে তিনি অগ্রসর হতে পারছেন না। সামনে কি আছে, কখন কিভাবে তাঁকে আক্রমণ করবে! থালার উপর থেকে কতগুলো কাঁকড়া বিছে খড়মড় ক'রে গা বেয়ে যদি উঠে পড়ে তবে কি করবেন তিনি! সময় কত? ঘরে ঘরে আলো জলল কিনা কিছুই জানবার উপায় নেই। সাহসে ভর করে লাঠি হাতে কত্তামশাই শোবার ঘরে এসে ঢুকেছেন। মশারির সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছেন। মশারির মধ্যে ঢুকতে ভয়টা যেন কমে গেল। পরমুহূর্তে সেই একই উদ্বেগ। যদি একটা অজানা জন্তু তাঁর বুকের উপর চেপে টুঁটি কামড়ে ধরে! শব্দ করবার সময়টুকুও তিনি পাবেন না। ভয়ের ভাবনা কখনো ভারি কখনো হাল্কা হতে হতে কত্তামশাই এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

কত্তামশাইয়ের ঘুম ভেঙে গেছে। কে যেন তাঁকে নাম ধরে ডাকছে! নির্ভাবনায় কত্তামশাই যথারীতি প্রশ্ন করলেন: কে? একই কণ্ঠস্বর বলছে: ওঠো, বসো। তোমাকে সঙ্গ দিতে এসেছি। আমি নিয়তি। কপাল চাপড়ে অনেকে আমায় অদৃষ্টও বলে থাকে—সে নামেও তুমি আমায় ডাকতে পারো। কিন্তু আজ আমি বাণীরূপে তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছি, তোমার ভয় দূর করবার জন্য।

কত্তামশাই বুঝতে পারছেন না, তিনি জেগে আছেন, না স্বপ্ন দেখছেন।

—কত্তমশাই, স্বপ্ন নয়। একেবারে খাঁটি সত্য। আমি তোমার সামনে উপস্থিত। এত ভয় পেয়েছিলে কেন সে কথা জানতে এসেছি। আরও কিছু কথা আছে।

কত্তামশাই আবার ভাবেন—এ কোনো চোরের চালাকি নয় তো!

—চোরের চালাকি নয় কত্তামশাই, নিতান্তই বাস্তব ব্যাপার। নিয়তি তোমার কাছে উপস্থিত।

—আমি কি ভাবছি তুমি বুঝলে কি ক'রে?

—তাহলে আর আমার নাম নিয়তি কেন?

—এই গভীর রাতে তোমার আগমনের কারণ? ভয় পেয়ে তোমার বেদীতে তো আমি ফুল চড়াই নি!

—আমার পূজায় ফুল বিল্বপত্র লাগে না। রিক্ত হস্তে, অবনত মস্তকে, আমার দীপ-নেভা মন্দিরে প্রদক্ষিণ ক'রে ঘুরছে কঙ্কালের দল। আমি চাই অধীনতা। তুমি কি এসব দেখ নি!

কত্তামশাই: পুরনো কথার পুনরাবৃত্তিতে কি লাভ?

নিয়তি: মনে হচ্ছে এখনো তোমার অহংকার ভাঙে নি!

কত্তামশাই: মানুষ যে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই তো তোমাকে বারংবার উপেক্ষা করছে মানুষ। এসব কথা বাদ দাও। বল, কিসের জন্য আজ এখানে এসেছ?

নিয়তি: একটি সংবাদ দিতে আমি উপস্থিত হয়েছি। তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে, আমার সঙ্গে যাবার জন্য।

কত্তামশাই: তুমি যেই হও, এখন আমি কোথাও নড়বো না। আমার অনেক কাজ।

নিয়তি: কি কাজ জানতে পারি কি?

কত্তামশাই: শাশ্বত সৃষ্টি সাধনায় আমি নেমেছি। এ কাজে অনেক সময় দরকার।

নিয়তি: তুমি করবে শাশ্বত সৃষ্টি! শাশ্বত সৃষ্টির জন্য অন্য রকমের মতি মেজাজ দরকার। যারা শাশ্বত সৃষ্টি করে তারা দেশলাই কাঠি গুনে হাই তুলে দিন কাটায় না। আর চা-সিগারেটের জন্য তারা তোমার মতো অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে না। আর তোমার মতো মৃত্যুভয়ে তারা আড়ষ্ট হয়েও পড়ে না। শাশ্বত সৃষ্টি তোমার কর্ম নয়। আমি সঙ্গে থাকলে চিত্রগুপ্তের অফিসে তোমাকে ফ্যাসাদে পড়তে হবে না।

—ভুল স্বীকার করছি, কিন্তু সংকল্পে আমি অটল। শাশ্বত সৃষ্টি, অমর কীর্তি না রেখে আমি যাব না। তবে একটা কথা তোমার কাছে জানতে চাই। মৃত্যুভয়ে এত আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম কেন? আমি তো সহজে ভয় পাই না। একা থাকতে তো অভ্যস্ত। অন্ধকার তো আমার জগতের আলো।

—চিরকাল ফুটে থাকবার আকাঙ্ক্ষা যাদের মনে থাকে, তারাই তোমার মতো মৃত্যুভয়ে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। যারা শাশ্বত সৃষ্টি করে তারা ফুটে ওঠে মৃত্যুর দিকে পাপড়ি মেলে দিয়ে। এ কাজ বড় কঠিন কত্তামশাই। তাই বলছি প্রস্তুত হও।

—যতই কঠিন হোক, তপস্যার পথে আমি সব বাধা জয় করব। কেবল তোমার কাছে সময় চাই।

—খ্যাতি-প্রতিপত্তি, ধন-জন-আয়ু, যৌবন পেলে অনেক কিছু করা যায়—ভেবে দেখ।

—আমি ভেবেই বলছি।

—শাশ্বত সৃষ্টি তোমার কর্ম নয়, তোমার ভাবনা দেখেই বুঝছি। দগ্ধ জঠরের কি ব্যবস্থা করবে? দানাপানি তো চাই। একটু আশ্রয়ও চাই। কাজ করতে হলে শির-দাঁড়া সোজা রাখবার দরকার। মরচে-ধরা হাত-পায়ের কব্জা নিয়ে কি শাশ্বত সৃষ্টি হবে? যাই হোক, তোমার আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই, তাই তোমাকে শাশ্বত সৃষ্টির কিছু পরিচয় দিয়ে যাব। এসো আমার সঙ্গে!

কত্তামশাই দেখছেন আদি-অন্তহীন প্রবাহ। প্রবাহের কূলে কূলে গ্রাম-নগর, বন-উপবন। দূর্বাশ্যামল তৃণশয্যার উপর শিশুরা খেলা করছে। নরনারী সংসার করছে। আবার জলের স্রোতে সব তলিয়ে যাচ্ছে। দেখা দিচ্ছে নতুন দৃশ্য, নতুন কলরব। কান্নার হাহাকার—হাসির ফুলঝুরি। প্রবাহের বাঁকে বাঁকে কালবিজয়ী মানুষের অমর কীর্তি। যেসব মানুষ অমরত্ব ঘোষণা ক'রে গেছেন তাঁরাও এই প্রবাহ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারছেন না। অতীতকে মুছে দিতে এগিয়ে আসছে নতুনের অভিযান। যার মৃত্যু নির্ধারিত তাকেই মারবার জন্য উল্লাস। হাত বাড়িয়েছে মানুষ এই প্রবাহ থেকে নিশ্চিহ্নপ্রায় স্মৃতিকে রক্ষা করবার জন্য। ভাঙা মঠ-মন্দিরের পেছনে তৈরি হচ্ছে নতুন মঠ-মন্দির—কিন্তু কিছুই স্থায়ী নয়। কেবল কেউ দীর্ঘায়ু, কেউ স্বল্পায়ু।

জলে আকাশে আর কোনো পার্থক্য বোঝা যায় না। শঙ্খের আবর্তের মতো ছোট

বড় অতিকায় জলোচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে, মনে হয় যেন নীহারিকাপুঞ্জ গর্জন ক'রে নেমে আসছে পৃথিবীর দিকে। জলোচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ছে নক্ষত্রের মতো। আকাশে শব্দ-গতি-বিচ্ছুরণ কিছুই নেই।

আকাশে শরৎ-মধ্যাহ্নের মেঘগর্জনের মতো মহৎ বাণী উচ্চারিত হচ্ছে। প্রতিধ্বনি বলছে, নাই—নাই!

দেখলে কত্তামশাই, কি ক'রে শাশ্বত সৃষ্টি করতে হয়!

কত্তামশাই প্রশ্ন করেন : এই প্রবাহের আদি-অন্ত নেই?

নিয়তি : আছে বৈকি, যেখানে কিছু নেই সেই স্থান থেকে এই কীর্তিনাশার উদ্ভব। আর যেখানে কিছু থাকবে না সেখানে এই প্রবাহের সমাপ্তি।

এইবার শুরু কর তোমার শাশ্বত সৃষ্টির সাধনা।

তোমার সাধনার পথে বাধাবিপত্তি অনেক। তার সমাধান নিহিত আছে এই বস্তুটির মধ্যে। এটি তুমি রাখ।

এই বলে নিয়তি কত্তামশাইয়ের হাতে সুন্দর একটি পাত্র রেখে অদৃশ্য হলেন। কত্তামশাই হাতে ধরে পাত্রটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন পাত্রের বাইরে অপূর্ব কারুকার্য, পাত্রের ভেতর মসৃণ চিক্কণ।

বাইরে ভেতরে পার্থক্য অনেক। টোকা দিলে পাত্র বেজে ওঠে, তখন বাইরের ভেতরের পার্থক্য অদৃশ্য হয়। উপুড় করলে কারুকার্য-খচিত পাত্র মনে হয় যেন পর্বতের চুড়ো। ভেতরের সীমাহীন শূন্যতার প্রতিবিম্ব। এইবার কত্তামশাই উপলব্ধি করলেন শাশ্বত সৃষ্টির রহস্য। একদিকে কীর্তির পূর্ণাঙ্গ পরিচয়, অপরদিকে সৃষ্টির অনির্বচনীয়তা। মনে পড়ে গেল রুদ্রনারায়ণকে। মুহূর্তের মধ্যে তিনি উপলব্ধি করলেন, দুজনে ভিন্ন হয়েও এক, এক হয়েও ভিন্ন।

কত্তামশাই শাশ্বত সৃষ্টি করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আসন পেতেছেন। কিন্তু আসনে বসলেই বিভ্রাট। আসনের তলায় কি একটা নড়ে বেড়ায়! পিঁপড়ের উপদ্রব। সুস্থির হয়ে বসবার উপায় নেই। কত্তামশাই ভাবেন, এতদিন তো ছিলাম ভাল। কিন্তু এ কি ক'রে গেল নিয়তি! শেষপর্যন্ত পিঁপড়ের দৌরাত্ম্য, নানা অস্বস্তি সত্ত্বেও কত্তামশাই চেপে বসেছেন তাঁর আসনে। বিরক্তিকর অসুবিধাগুলো কোথায় মিলিয়ে গেল।

আঙুলের চাপে চাপে মোমের মূর্তি তৈরি হয়ে উঠছে। কত্তামশাই নিজেই বিস্মিত হন তাদের অভাবনীয় অপ্রত্যাশিত রূপ দেখে। এতদিন তিনি পুতুল গড়েছেন নিজের ব্যক্তিত্বের ছাপ ফেলে ফেলে। আজ একই মোমের তালে প্রকাশ পাচ্ছে তার অস্তিত্ব।

কত্তামশাই ভাবেন, একি আনন্দ! আগে এ জিনিস আমি পাই নি। ভুলে গেছেন কত্তামশাই জীবনসংগ্রামের কথা—ভুলে গেছেন মৃত্যুভয়। তিনি প্রত্যক্ষ করছেন কালপ্রবাহ। তাই তিনি জানেন পুতুল মোমেরই হোক আর লোহারই হোক, তার লয় অনিবার্য। কিন্তু এই যে আনন্দ, এই যে উপলব্ধি, তারও কি লয় হবে? আনন্দের মধ্যেও তাঁর মনে বিষাদের তরঙ্গ জাগে। কালপ্রবাহ অদৃশ্য হয়ে যায়। কেবল শুনতে পান একটা হাহাকার ধ্বনি। সব মুছে যাবে, কেবল কি এই হাহাকার থাকবে!

তাঁর আনন্দের চিহ্ন রয়ে গেছে মোমের পুতুলে। তিনি তারই উপর হাত বুলিয়ে ভাবেন সমস্ত উৎসর্গ ক'রে এই যে আনন্দের চিহ্ন রেখে যায় মানুষ তারও কি লয় হবে! সবই তলিয়ে যাবে সত্য, কিন্তু তীব্র উপলব্ধি বোধহয় তলিয়ে যাবে না। এই হল জীবন-পাত্রের শাশ্বত পরিচয়—এরই নাম সৃষ্টি।

খ্যাতির মৃদুগুঞ্জন কত্তামশাইয়ের কানে আসে। কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ মধ্যে মধ্যে শুনতে পান। এসব ছোটখাটো ব্যাপারে এখন আর কত্তামশাই বিচলিত হন না। কিন্তু যত গোলমাল স্তাবকদের নিয়ে, বিনা নিমন্ত্রণে গটগট ক'রে ঘরে ঢুকে যায়। কত্তামশাইয়ের পুতুলগুলো চটপট তুলে নেয়, বলে: পেডাস্টাল নেই কেন? মিউজিয়মের নম্বর দেওয়া নেই। ভালমন্দ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

কত্তামশাইয়ের জ্ঞানভাণ্ডার কত গভীর তারা জেনে নিতে চায়। কত্তামশাই বলেন: আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য।

কত্তামশাই কিছুই পড়েন নি, কিছুই জানেন না—এই সংবাদে স্তাবকরা বিস্মিত হয়ে বলে: তবে পুতুল করেন কেমন ক'রে?

একদল যায় আর একদল আসে। ঘুরে ফিরে সেই একই প্রশ্ন—এই সব পুতুলের মানে কি! এ সব ক'রে কি হবে?

কত্তামশাই ক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ঠাকুর-দেবতার নাম তাঁর জিভে আসে না।

তবু তিনি নিরুপায় হয়ে বলে ওঠেন : হে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, কে কোথায় আছ আমায় রক্ষা কর।

এক হাতে পুতুল আর এক হাতে সিগারেট, মাঝখানে চায়ের কাপ নিয়ে চেয়ারে বসে তিনি একই প্রার্থনা করে চলেছেন। বলছেন, আর তো পারি না! ঘরের মধ্যে মানুষের ভিড়ে গুমোটের মতো গরম। উৎকট সব গন্ধ। আর পারা যায় না।

একদিন ঘরের মধ্যে ভিড় জমেছে প্রচুর। প্রশ্নবানে কত্তামশাই জর্জরিত। যে জিনিসে সংসারের কোনো সমস্যার সমাধান হয় না সে রকম জিনিস কেন তিনি করছেন—এর জবাব চায় তারা। কত্তামশাই কি জবাব দেবেন ভাবছেন, এমন সময় অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। কোথা থেকে বিকট আওয়াজ—গেট আউট। তারপর ফুলস্টপ বিবর্জিত একই শব্দ—বেরিয়ে যাও, গেট আউট। পড়িমরি ক'রে স্তাবক-বৃন্দ যে যেখানে পারলেন ছুটে পালালেন। ঘর খালি। এবার তিনি শুনছেন অদ্ভুত ধরনের কণ্ঠস্বর : সমস্যার সমাধান কি ক'রে করতে হয় দেখলে? কত্তামশাই বলেন : কে আপনি? আমাকে এই মহাবিপদ থেকে রক্ষা করলেন!

আমি মা সরস্বতীর তোতা। তোমার দুঃখ দেখে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তোমায় রক্ষা করতে। এই হল তোমার মন্ত্র। এই মন্ত্র উচ্চারণ করলে কেউ তোমার ঘরের চৌকাঠ মনের চৌকাঠ পেরোতে পারবে না।

আপনার দিব্য দেহ একবার দেখবার ইচ্ছা।

তোতা টেবিলের ওপর নড়াচড়া করছে আর বলছে : দেখ, কিন্তু বেশি টেপাটেপি করো না। কামড়ে দেব।

তোতা বলে : এবার তো দেখা হল, আমি চললাম। কিন্তু মন্ত্র ভুলো না। বলেই মা সরস্বতীর তোতা উড়ে চলে গেল। কত্তামশাই মা সরস্বতী প্রেরিত মন্ত্রটি আউড়ে নিলেন।

কত্তামশাইয়ের কাজে এখন আর কোনো বাধা পড়ে না। বেশ কাজ ক'রে যাচ্ছেন। মোমের পুতুল বানিয়ে চলেছেন। ঘরের চৌকাঠ আর কেউ মাড়ায় না। কিন্তু মনের চৌকাঠ পেরোবার জন্য উঁকিঝুঁকি মারে কেউ কেউ। কিন্তু মন্ত্র যে জীবন্ত, মনে মনে উচ্চারণ করলে কত্তামশাই তা উপলব্ধি করেন।

সকালবেলা বেশ সেজেগুজে কত্তামশাই পুতুল গড়তে বসেছেন, এমন সময় তাঁর মনে হল যেন দুই মূর্তি তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে! মূর্তিরা কত্তামশাইকে সম্বোধন করে বলছে : আমরা শাশ্বত সৃষ্টি ও অমর কীর্তি দুজনে এসেছি—আমাদের কাছে বর প্রার্থনা কর। কি বর চাইবেন ভাববার আগেই জিভ থেকে বেরিয়ে গেল : —গেট আউট। এ কি হল! কত্তামশাই হায় হায় ক'রে উঠলেন—আমার সারা জীবনের তপস্যা এইভাবে নষ্ট করলাম! স্বয়ং শাশ্বত সৃষ্টি অমর কীর্তিকে এই রকম ক'রে বিদায় করলাম! আমার কি হবে! খুব দুঃখ করবার চেষ্টা করেও কত্তামশাইয়ের তেমন দুঃখ হচ্ছে না—পরিবর্তে বেশ হাল্কা মনে হচ্ছে নিজেকে।

এক সময় খেলা করতে করতে খেলাচ্ছলে পুতুল গড়েছিলেন। সেগুলো বেশ হাল্কা, সহজ তার ভঙ্গি। তারপর কোন অশুভ মুহূর্তে তাঁর এই শ্বাশত সৃষ্টি করবার আকাঙ্ক্ষা জাগল। পুতুলগুলো ভারি হয়ে উঠেছে নানা তথ্যের ভারে। শাশ্বত সৃষ্টি করতে গিয়ে কত্তামশাই সেই বর ভুলে যাচ্ছিলেন। বিশ্বকর্মার তৈরি অমর বাটিটা অনেকদিন তিনি হাতে নেন নি। বাটিটার কথা মনে পড়তেই টেবিলের উপর হাত বাড়ালেন। কিন্তু বাটিটা নেই! যাক তাহলে সবই গেল। কেবল কীর্তিনাশার সেই রবই স্পষ্ট হয়ে উঠছে তাঁর সামনে। এত লোকসানের পরও মনে কেন নৈরাশ্য জাগছে না। এখনো তীব্র ইচ্ছা সৃষ্টি করবার। শাশ্বত সৃষ্টি অমর কীর্তি কিছুরই দরকার নেই—সে যাই হোক একটা কিছু সৃষ্টি করা। আনন্দের তালে তালে আঙুলগুলো চালিয়ে যাওয়া। কত্তামশাই এর বেশি কিছু চাইছেন না।

মোম ফুরিয়ে গেছে। হাতের কাছে একটা কাগজ পেয়ে সেটা নাড়াচাড়া করতে করতে একটা মোচড় দিলেন তিনি। সামান্য কাগজ অকস্মাৎ অসামান্য আকার নিয়ে উপস্থিত হল। কত্তামশাই বিস্ময়ে অভিভূত। আবার আর একখানা কাগজ টেনে নেন। এখানে-সেখানে আঁকাবাঁকা তেকোনা মোচড় দেন, আর নতুন, অভাবনীয় অপ্রত্যাশিত আকার বেরিয়ে আসে। কত্তামশাইয়ের আনন্দের সীমা নেই। একদিন পুতুল করতে যে আনন্দ পেয়েছিলেন তারই মতো আনন্দ আজও পাচ্ছেন—কিন্তু দুই এক হয়েও এক নয়।

ধীরে ধীরে কত্তামশাই বুঝতে পারছেন শাশ্বত সৃষ্টি করবার আকাঙ্ক্ষা থেকে তিনি

অনেককিছু জেনেছেন—যে জ্ঞান যে উপলব্ধি আজ অনায়াসে এই মোচড়-দেওয়া কাগজগুলোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে।

শাশ্বত সৃষ্টির কথা কত্তামশাই ভুলে গেছেন। মোচড়-দেওয়া কাগজে, টিপে দেওয়া মোমের তালে আবর্ত আর বিচ্ছুরণ– ঠিক যেমন তিনি দেখেছিলেন একদিন কীর্তিনাশার ঝড়ের মধ্যে। যেমন পেয়েছিলেন নিয়তির দেওয়া পাত্রে। তেমনি আজ তাঁর সৃষ্টি বাইরে ভেতরে ভিন্ন হয়েও অভিন্ন।

কত্তামশাই যখন কাগজে মোচড় দিতে দিতে সবকিছু ভুলে গেছেন সে সময় নিয়তি এসে দাঁড়ালো তাঁর সামনে—কত্তা, হল তোমার শাশ্বত সৃষ্টি ? তোমার প্রতিজ্ঞা যে কাজ শেষ না ক'রে তুমি কোথাও যাবে না। তাই তোমার জন্য আমি প্রতীক্ষা করেছিলাম। কাজ শেষ হয়েছে, এবার ওঠো।

—যেতে হবে তা বুঝি। কিন্তু সৃষ্টির আনন্দ সবে উপলব্ধি করেছি মাত্র। আর একটু সময় পাওয়া যাবে না ?

—তুমি যা চাইছ তা অসম্ভব। এই ভাঙাগড়ার আনন্দের কোনো শেষ নেই। এর কোনো মন্দির নেই, যেখানে তুমি একদিন হেঁটে গিয়ে উঠবে। তোমার উপলব্ধির সঙ্গে এই আনন্দের ব্যাপকতা। অমরত্ব পেলেও তোমার কাজ কোনোদিন শেষ হবে না।

—শাশ্বত সৃষ্টি অমর কীর্তি ওসব আমার আর হল না। সেসব জলাঞ্জলি দিতে আমি বাধ্য হয়েছি। একথা বলে কত্তামশাই নিয়তিকে সব ব্যাপারটা বললেন।

সব ব্যাপার শুনে নিয়তি বললে : যা হয়ে গেছে তার জন্য আর অনুতাপ ক'রে কি লাভ ? তোমার সেই বাটিটাও তো দেখছি না!

—নিশ্চিত মা সরস্বতীর সেই তোতা চুরি ক'রে নিয়ে গেছে।

—তোতা কেন চুরি করতে যাবে! সরস্বতীর ভক্তদের ও বদ অভ্যাস আছে চিরকালের। এখন বল তুমি এসব কি করছ ?

—দেখ না কি করছি—বলে কতকগুলো কাগজ নিয়তির দিকে এগিয়ে দিলেন কত্তামশাই।

নিয়তি : আমার রসবোধ তেমন নেই, তবে তোমার জিনিসগুলো দেখতে বেশ ভালই লাগছে। পুতুলগুলো তো বেশ করেছ। কত্তামশাই, চোখে কালো চশমা দিয়ে এসব কর কি ক'রে ?

কত্তামশাই : আমার জগতে যে আলো আছে, সেই আলোতে এইসব আমি করতে পারি।

—তুমি তো দেখছি মহাপুরুষের মতো কথা বলছ। নিজের আলোর কথা তো মহাপুরুষরা বলে থাকেন।

—না. না, মহাপুরুষ আমি একেবারেই নই। খুব সামান্য আমার এই আলো। যতক্ষণ পুতুল করি, কাগজ মুড়ি, ততক্ষণ এই আলো থাকে। কাজ শেষ হলেই সব অন্ধকার হয়ে যায়।

—কত্তামশাই, তুমি বলছ কি! এ তো শাশ্বত সৃষ্টির সব লক্ষণ!

—তোমায় তো বললাম, ওসব আমি বহুদিন বিদেয় ক'রে দিয়েছি।

—কীর্তি তো রেখে গেলে, কিন্তু তোমার নাম তো থাকবে না!

—আমার নাম থাকবে না! তবে কি থাকবে?

—কেন, তোমার এই কীর্তি নানাজন উপভোগ করবে, আনন্দ পাবে, বিস্ময়ে স্মরণ করবে—অনুসন্ধান করবে স্রষ্টাকে, কিন্তু নাম খুঁজে পাবে না।

কত্তামশাই আবার প্রশ্ন করেন : আমার এই তপস্যালব্ধ সৃষ্টি থাকবে, আর আমার নাম থাকবে না, এমন বেয়াড়া আইন কে করেছে?

—তুমি তো নাম চাও না বলেছিলে। খ্যাতি-প্রতিপত্তি তুমি কিছুই চাও নি। তুমি চেয়েছিলে শাশ্বত সৃষ্টি করতে। তোমার তো আনন্দিত হবার কথা।

—যতক্ষণ সৃষ্টি করেছি ততক্ষণ নামের কথা মনে আসে নি। কিন্তু নাম মুছে যাবে ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। স্রষ্টার আনন্দ এই মুহূর্তে যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না। নামই যদি লোকে ভুলে যায় তাহলে আমার থাকে কি?

—তোমার সেই ব্যাধি এখনো সারে নি। 'রুদ্রনারায়ণ' 'কত্তামশাই' দুই নামের ঠোকাঠুকিতে অনেক দিন হা-হুতাশ করেছ।

—আজ আর হা-হুতাশ করি না। যদি সব নাম মুছে যায় তো থাকে কি? আমি তবে কে!

—তোমার প্রশ্নের জবাব তো আমি দিতে পারি না। বিশ্বকর্মা তো এমন সৃষ্টি করেন নি যেখানে একটিকে দেখে আর একটিকে জানতে পারা যায়। এ প্রশ্নের মীমাংসা প্রত্যেককে নিজে নিজেই করতে হয়। এসব কথা তুমি কখনো ভাব নি বুঝি!

—কখন ভাবব! এইসব করতেই তো জীবন কেটে গেল।

—তোমার পুতুলগুলোর তো নাম নেই। লোকে কি ক'রে চিনবে! বিশ্বকর্মার সৃষ্টির সঙ্গেও এর কোনো মিল নেই। মোমের তাল, কাগজের টুকরো, যা দিয়ে তুমি পুতুল করছ তার সঙ্গেও তো তোমার পুতুলের হুবহু কোনো মিল নেই। এরা মোমের তালও নয়, কাগজও নয়। এদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। নাম ছাড়াও এরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাহলে তুমি এত ভাব কেন?

—নাম নেই কেন? নাম দিয়েই তো ওগুলো অন্য সবকিছুর থেকে স্বতন্ত্র। সব নাম যদি মুছে যায় তবে সৃষ্টিরও প্রয়োজন থাকে না। সব একাকার। একটা দুর্লঙ্ঘ্য আইন থাকতে পারে, কিংবা হয়ত তাও নেই। আমি নামরূপের কারবারী। যেখানে সব একাকার সেখানে যেতে আমার আশঙ্কা!

—তোমার সৃষ্টিও তো আইন ও আইন-নেই এই দুয়ে মিলে হয়েছে। সে-ও তো প্রায় একাকারের প্রান্তে শাশ্বত হয়েছে।

—আমি বুদ্ধি দিয়ে যা বুঝি আমার বেশিক্ষণ মনে থাকে না। রূপের জগতে যা শাশ্বত তাই আমি এতদিন উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি আমার দশ আঙুল দিয়ে। আমি অনুভব করতে পারি, ভাবতে আমি জানি না।

নিয়তি: তবে তাই হোক। তোমার পথেই তুমি এগিয়ে চল। তোমার সৃষ্টি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাক। আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম।

কর্ত্তামশাই: তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হবে না? বড় নিঃসঙ্গ হয়ে যাব।

নিয়তি: নিঃসঙ্গতাই তোমাকে সৃষ্টির শাশ্বত রূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে, তবে তার আইন আমারও চেয়ে মমত্বহীন। তার দুর্লঙ্ঘ্য আইন অতিক্রম করার সাধ্য কারো নেই।

কর্ত্তামশাই: দুর্লঙ্ঘ্য আইনের সামনে উপস্থিত হবার আগে তোমায় একবার দেখবার ইচ্ছে হয়।

নিয়তি: কেন, আমার ছায়া তো তোমার কালো চশমার উপর পড়েছে—দেখতে পাচ্ছ না?

ক্যালেণ্ডারের বড় বড় অক্ষরে তারিখগুলো পিছিয়ে যায় ধূলিমলিন অতীতের দিকে। কত্তামশাই এগিয়ে চলেন জীবনের আঁকাবাঁকা পথ ধরে সামনের দিকে। বিস্ময়ের পর বিস্ময় উদ্ঘাটিত হয় তাঁর সামনে। কর্মের সঙ্গে সৃষ্টি, সৃষ্টির সঙ্গে আনন্দ এক হয়ে কত্তামশাইয়ের মন পুলকে ভরে ওঠে। অক্ষয় কীর্তি রেখে যাবার কথা এখন তাঁর মনে পড়ে না। ভুলে গেছেন তিনি চন্দ্র-সূর্য-তারা ভরা আকাশের কথা। ভুলে গেছেন রামধনুর রং। কেবল একটি অখণ্ড মুহূর্ত এবং তারই উপর প্রতিফলিত ক্ষুদ্র আলোকরশ্মি। যে আলোর সাহায্যে এ পর্যন্ত তিনি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।

এইভাবে চলতে চলতে এক সময় ঝাঁকুনি দিয়ে পথ থেমে যায়। অগ্রসর হবার উপায় নেই। সামনে তাঁর বলি-চিহ্নিত জীর্ণ অনুর্বর বর্তমান। এই অপ্রত্যাশিতের সম্মুখে এসে কত্তামশাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন।

অনুর্বরতাকে উর্বর ক'রে তোলার কোনো উপায় খুঁজে পান না। হতাশার সামনেও তিনি আশা ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন। সৃষ্টির শক্তিতে এই জড়তাকে সজীব সতেজ ক'রে তুলবেন, এই সংকল্প নিয়ে তিনি আসন গ্রহণ করলেন।

কত্তামশাইয়ের দশ আঙুলের আশ্চর্য কৌশল প্রকাশ পায়, জ্ঞানের গরিমা ফুটে ওঠে, কেবল সজীবতাকে ফিরিয়ে আনতে পারেন না তিনি। ইচ্ছে আছে, সংকল্প আছে, কিন্তু পূর্বের সেই দৃঢ়তা নেই। তাঁর সৃষ্টি কেবলই অতীতের আকর্ষণে একই পথে ঘুরে চলে। বিকারগ্রস্তের মতো কত্তামশাই অন্ধকারের মধ্যে প্রশ্ন করেন এই কি জীবনের চরম প্রাপ্তি! এই কি সাধনার সিদ্ধি!—বিশ্বাসে অবিশ্বাসে দোলায়মান তাঁর দেহমনবুদ্ধি ক্রমেই জট পাকিয়ে ঘুলিয়ে যাচ্ছে। মাথার মধ্যে হাতুড়ির ঘা দিয়ে চিন্তাশক্তিকে কে যেন ভেঙেচুরে দিচ্ছে। অস্বাভাবিক তৃষ্ণায় তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন, জীবন-মৃত্যু-অমরত্ব সবই তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। অস্তিত্বের মধ্যে একবিন্দু জলের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছু নেই। গাছ-মাটি-পশু-পাখি-পাহাড়-পর্বত-আকাশ-পাতাল জুড়ে এই তৃষ্ণার হাহাকার। এর থেকে কত্তামশাইয়ের 'আমি'র হাহাকার অভিন্ন। কিসের এই তৃষ্ণা! কোথায় এর শেষ! কত্তামশাইয়ের সম্বিৎ লুপ্তপ্রায়।

এমন অবস্থায় মসৃণ নিটোল আহ্বান তিনি শুনলেন। কে যেন তাঁকে বলছে: এই নাও তোমার তৃষ্ণার জল।

এক নিঃশ্বাসে জলপান ক'রে তিনি বলেন : কে তুমি ?

অশরীরী হেসে উঠে বলে : আমি হ্লাদিনী। তোমার তৃষ্ণার জল নিয়ে এসেছি। কিন্তু দেখছি এখনো তোমার তৃষ্ণা মেটে নি। বুড়ো হলে, এখনো কি তুমি জল খেতে শিখলে না ? এই নাও আর একপাত্র জল—ধীরে খাও, তৃষ্ণা মিটবে।

হ্লাদিনীর দেওয়া জল খেয়ে কত্তামশাই বেশ সুস্থ বোধ করেন। প্রশ্ন করেন : হ্লাদিনী তুমি কোথায় থাক ? আগে তুমি আমার কাছে আস নি কেন ?

হ্লাদিনী বলে : তোমার ঘরে অনেকবারই আমি নিঃশব্দে এসেছি, গেছি। কখনো তোমাকে এমন তৃষ্ণার্ত দেখি নি। আজ তুমি তৃষ্ণার্ত জেনে আমার পাত্র ভরে এনেছি। তৃষ্ণা মিটেছে ? নাও আর একটু জল খাও।

কত্তামশাই জলের পাত্র ধরে আছেন, হ্লাদিনী জল ঢালছে—যেন বহু দূরের ঝরনার ঝির ঝির শব্দ ! পাত্র থেকে উপছে-পড়া জল তাঁর হাতের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। কত্তামশাই পাত্র নিঃশেষ ক'রে বলেন : বড় মিষ্টি তোমার জল। মাটির সোঁদাগন্ধ-ওয়ালা এমন শীতল জল আমি আর কখনো খাই নি। আমি তৃপ্ত, আর আমার তৃষ্ণা নেই।

ফুল ফোটানো হাসি হেসে হ্লাদিনী বিদায় নেয়।

হাসির আলোতে কত্তামশাই দেখতে পেলেন অপরূপ এক দৃশ্য। তাঁর পদচিহ্ন লেখা অসংখ্য পথ চলে গেছে নানাদিকে ! পথের উপর দিয়ে দৌড়ে চলেছে নিজের শৈশব। উদ্বেগহীন তার চিত্ত। আরো দূরে রুক্ষ জমির উপর তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে তার সবুজ পাতা মেলে। তালগাছের সংকীর্ণ ছায়ায় দেখতে পেলেন যুগল মূর্তি, হাতে তাদের ফুলের গুচ্ছ। রৌদ্র-ছায়ার জালিকাটা বিস্তৃত মাঠের উপর দিয়ে পথ ছুটে চলেছে। পথের প্রান্তে বিস্মিত চোখে কত্তামশাই দেখলেন সেই দিগন্তবিস্তৃত নীল চন্দ্রাতপ। নিচে বসে আছে রুদ্রনারায়ণ—যেন পটে-আঁকা ছবি।

হাসির আলো নিভে আসে, আনন্দের ধবলগিরি কুয়াশায় ঢাকা পড়ে। কালো ড্রাগন তার দীর্ঘ পিচ্ছিল দেহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কত্তামশাইয়ের উপর। ড্রাগন হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, বলে : খুলে দাও তোমার রূপরসের ভাণ্ডার, নিয়ে এসো তোমার সকল সঞ্চয়।

কত্তামশাই কাতরকণ্ঠে প্রশ্ন করেন : কে তুমি ? আমাকে কেন তুমি বঞ্চিত করতে চাও ? আমার রূপরসের সঞ্চয় আমার শিল্পসৃষ্টিতে মিশে গেছে। আমার ভাণ্ডারে

আছে কতকগুলো শুষ্ক পাত্র, বিস্বাদরসের তলানি। তা থেকে আমায় বঞ্চিত ক'রে তোমার কি লাভ? কে তুমি?

ড্রাগন : জীর্ণ পাত্রে ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রে রেখে তোমারই বা কি লাভ?

কত্তামশাই : বহুদিনের সঞ্চয় ফেলে দিলে আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাব।

ড্রাগন : ভিখারীর মতো জীর্ণ বস্তু আঁকড়ে না রেখে নতুন রস নতুন সৌন্দর্য নতুন পাত্রের সন্ধান করতে পারো না?

কত্তামশাই : কোথায় আছে নতুন রস, সৌন্দর্য! কোথায় পাব নতুন পাত্র!

ড্রাগন : আমার যাবার সময় হল। রইল তোমার শব্দের ভাণ্ডার।

কত্তামশাইকে নিঃস্ব ক'রে ড্রাগন অদৃশ্য হয়।

কত্তামশাইয়ের বুকের মধ্যে বেজে চলে ডমরুর শব্দ। জীর্ণ ভগ্নপ্রায় শব্দের সঞ্চয়কে অবলম্বন ক'রে কত্তামশাই ভেসে যান আকারহীন বর্ণহীন অসীম শূন্যতার মধ্যে।

কীর্তিকর
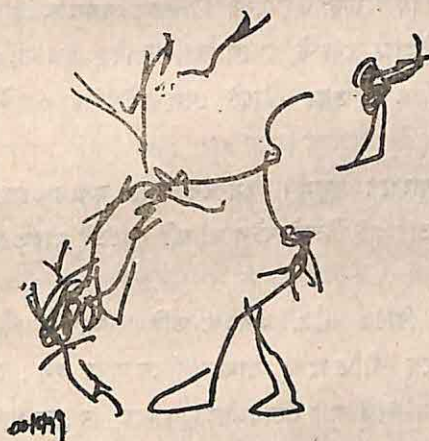
শান বাঁধানো মেঝের উপর হাত থেকে ফসকে যাওয়া কাচের গেলাসটা পড়বা-মাত্রই ভেঙে খান্ খান্ হবে এ বিষয়ে আমাদের কারও মনে কোনো সন্দেহ নেই। ভাঙা গেলাসের দিকে তাকিয়ে আমাদের মনে কোনো দুর্ভাবনা জাগে না, তাই অনায়াসে কাঁচের টুকরোগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করি। যদি ফস্‌কে যাওয়া গেলাসটা মাটিতে পড়ে একটা চিড় খেয়ে দাঁড়িয়ে যায়, তবেই হয় ভাবনার কারণ। ফাটা গেলাস ব্যবহারেও লাগে না, একেবারে জঞ্জাল বলে ফেলেও দেওয়া যায় না।

কীর্তিকরের অবস্থা যখন ঐ ফাটা গেলাসের মতো সেই সময় তার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। অবশ্য ফাটা গেলাসের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যায় না। কারণ কীর্তিকর তো আর কাচের তৈরি নয়। মানুষ। তাই চিড় খায় নি হয়ত, কিন্তু একটু দুমড়ে গেছে। কি ক'রে তার ঐ অবস্থা হল, তা কখনো তার মুখ থেকে শুনি নি। তবে ভাবে ভঙ্গিতে সে আমায় জানিয়ে দিয়েছিল। সোজা কথায় না বললেও।

কিছুই নয়, কীর্তিকরের জীবনটা যখন নানা মোড় ঘুরতে ঘুরতে ঠিক সাতাশ কোঠার দিকে মোড় ফিরিয়েছে, এই সময় কীর্তিকর অকস্মাৎ হোঁচট খেল। গাছে, পাহাড়ে, ঘরের চৌকাঠে হোঁচট খেলে বলবার কিছু ছিল না, এ তো আমাদের অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু কীর্তিকর হোঁচট খেল চটকদার একটি রঙিন পুতুলের সঙ্গে।

বিশ্বকর্মার তৈরি বাহারে পুতুল। সে যে আর কখনো দেখে নি তা নয়, অকস্মাৎ কেন যে তার এই বিভ্রাট ঘটল তা যদি বুঝতেই পারত তবে বিভ্রাট আর বিভ্রাট থাকত না।

রঙিন পুতুল তার বিচিত্র গঠন, অপরূপ ভঙ্গিমা আর বর্ণের ঝলক ছড়াতে ছড়াতে অক্ষত দেহে কীর্তিকরের সামনে দিয়ে অদৃশ্য হল। কেবল রইল, তার চোখে কিছুটা রঙিন ঝাঁঝ আর তোবড়ানো অস্তিত্ব। বুঝতে পারি, বুদ্ধির হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে কীর্তিকর তার টোল খাওয়া তুবড়ে যাওয়া জীবনটাকে ঠিক আগের মতো সুডৌল ক'রে তোলবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। বুঝতে পারি, রঙিন ঝাঁঝ তার চোখ থেকে তখনো যায় নি। আমি যা বুঝি তা কখনো স্পষ্ট ক'রে কীর্তিকরকে বলি নি, তাই কীর্তিকর আমার সঙ্গ উপভোগ করে। আসল কথা, কীর্তিকর মানুষ চায়, সঙ্গ চায়, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা চায় না। পাশে বসতে দিতে প্রস্তুত, কিন্তু গা ঘেঁষতে গেলেই তার বিরক্তির অন্ত থাকে না। মেজাজ তার খিঁচড়ে যায় কীর্তিকর সমস্ত সমস্যা তালগোল পাকিয়ে বাক্যের জঞ্জালের মতো আমার কাছে।

উপস্থিত করত। আমি বুঝতে পারতাম, সে যা বলতে চায়, তা বলতে পারছে না বলেই কথার এত অপব্যবহার। এই সময়টা কথা কইতে সকলেই ভালবাসে, কিন্তু কথা শুনতে কারোই ধৈর্য থাকে না। কীর্তিকরের কথার কোনো আগামাথা ছিল না। কখনো গল্প, কখনো কাহিনী, কখনো উপাখ্যান, নানারকম ছুতো ক'রে সে একই কথা আমাকে বার বার শোনাত।

কীর্তিকরের গল্প বলবার ভঙ্গি সত্যি মনে রাখবার মতো। আমরা কথা বলি চেয়ারে হেলান দিয়ে, একটু আরাম ক'রে। কিন্তু কীর্তিকরের কথা বলার সময়ের ভঙ্গিটা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তার কথা বলবার আগ্রহ যতই বাড়ত, তত সে আরাম কেদারার সামনে এগিয়ে এসে ক্রমে একেবারে চেয়ারের ফ্রেমের কাঠটার উপর বসে, ঘাড়টা হেঁট করে, মেঝের দিকে তাকিয়ে, এক হাতের পাতার উপর অন্য হাতের আঙুল দিয়ে নানা রকম ঢেঁরা কেটে যেত। যেন সে নিজের কথাকেই আঁচড় কেটে বাতিল ক'রে দিচ্ছে।

কীর্তিকর যেসব গল্প আমায় বলেছিল তা সিগারেটের ধোঁয়া। তার কণ্ঠস্বর এবং তার অবস্থা কিছুটা অনুভব ক'রে উপভোগ করতাম। আজ সে সবের অনেকখানি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তার অদ্ভুত কল্পনার সৃষ্টি একটা কাহিনী আজও আমার মনে আছে। বোধহয় কীর্তিকরের জীবনের প্রতিবিম্বই তার সেই নিজ কল্পিত কাহিনী।

ঠিক কি ভাবে সে গল্পটা বলেছিল তা আজ আমার স্পষ্ট মনে নেই। কাজেই কাহিনীটা কিছুটা তার এবং কিছুটা আমার মিলেমিশে যা তৈরি হয়েছে তা হল এই :

অনেকদিন আগে রাজস্থানে মরুভূমির মাঝখানে একটা ছোট্ট গ্রাম ছিল। আমি কীর্তিকরকে বলেছিলুম—'কীর্তিকর অতদূর নিয়ে গেলে কেন? গ্রামটা তো এখানেই ওঠাতে পারতে।' কীর্তিকর বলেছিল, 'তা নয়। ঘটনাটা একেবারে খাঁটি সত্য কিনা তাই কিছুটা ভৌগোলিক পরিস্থিতি তোমার জেনে রাখা দরকার।'

সেই গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা মস্ত গাছ ছিল। সে অঞ্চলে ও রকম গাছ কেউ কখনো দেখে নি। যে রকম তার আকার, তেমন তার শ্রী। এত শ্রী, এত সৌন্দর্য এবং আকারের মহিমা সত্ত্বেও গাছটার মনে শান্তি নেই। গাছের ইচ্ছে, সে আরও বড় হবে। আর বড় হয়েও চলেছে তেমনি। কিন্তু সবের তো একটা শেষ আছে। কিন্তু গাছের আশার কোনো শেষ নেই। তার ইচ্ছে আকাশ ফুঁড়ে
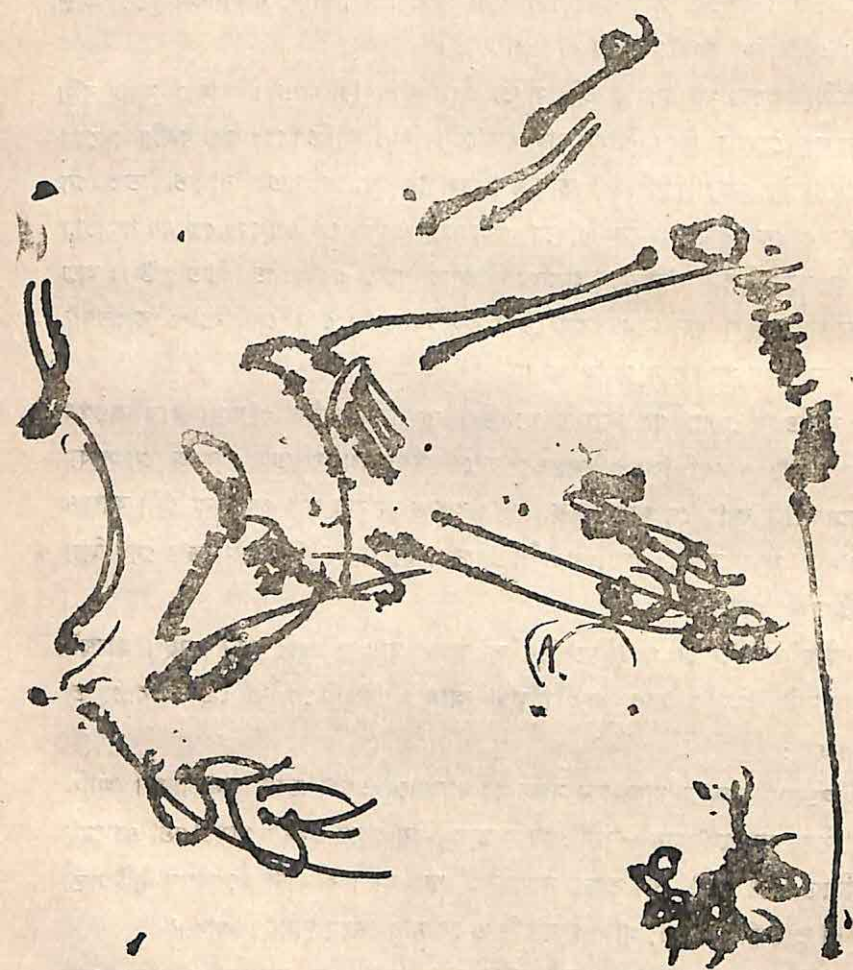
মেঘের উপর চড়ে যায়। এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে ক্রমে গাছটা ভুলেই গেল যে, মাটির সঙ্গে সে বাঁধা আছে। সে যে মাটি থেকেই একদিন উঠেছিল, এ কথা সে প্রায় ভুলেই গেছে। আর ভুলবারই কথা। কারণ ডালপালা মেলে মাটি প্রায় অদৃশ্য। সে দেখতেই পায় না। কোথায় তার মাথা। আর কোথায় মাটি। দিনের বেলা গাছের দুঃখ তেমন থাকে না। দিনের বেলা অনেকটা সে স্বস্তি পায়। মনে হয়, যেন সে গিয়ে আকাশে মাথা ঠেকিয়েছে। কিন্তু অন্ধকার রাত্রে তার মনে কেবল সন্দেহ জাগে যে সে তেমন বড় হতে পারে নি। কালো আকাশটা মনে হয় যেন অনেক অনেক উঁচুতে। তারাগুলো যেন আরও আরও দূরে।

বলেছিলুম, 'কীর্তিকর এ কী গাছ?' সে বলেছিল, 'এ গাছের কোনো নাম নেই।' বলেছিলুম, 'গাছ! অথচ তার নাম নেই!'

কীর্তিকর মারাঠী চপ্পল পরা বাঁ পা'টা একটু সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে, ঘাড়টা একটু ফিরিয়ে বলেছিল—'কেন? তুমি Abstract art-এর তত্ত্ব জান না?' বুঝেছিলুম। শুধিয়েছিলুম, 'তারপর কি হল গাছের?' কীর্তিকর বলতে লাগল—তারপর দিন যায়। ইতিমধ্যে গাছের গোড়ায় ঘুন ধরেছে। গাছ তার বড় হওয়ার আকাজ্ক্ষা নিয়ে এমনই ব্যস্ত যে সেকথা সে ভুলেই গেছে। তারপর একদিন অতি সামান্য কারণে একটু ঝড়-ঝাপটা লেগে গাছটা হুড়মুড় ক'রে, যাকে বলে ঘাড় মুচড়ে, মাটির উপর উলটে পড়ল। যেখান থেকে সে উঠেছিল ঠিক সেইখানেই। এতদিন গাছটা ছিল অকেজো কিন্তু যেই গাছটা উলটে পড়ল, অমনি চারিদিক থেকে লোক ছুটে এল। যার গাছ সে নিলাম চড়াল। হাতুড়ি এল, কুড়ুল এল, করাত এল। গাছটা কেটে টুকরো টুকরো ক'রে, কেউ কাঁধে, কেউ গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে, অকেজো গাছের কেজো শরীরটা নিয়ে চলে গেল। গাছটা যেখানে ছিল, সেটা ফাঁকা হয়ে গেল। ক্রমে গাছের তলায় যে ভ্যাপসা ভিজে মাটি, তা শুকিয়ে খটখটে হয়ে উঠল। কোনো চিহ্নই আর রইল না তার।

দিন কেটে যায়। একদিন এক বুড়ো যখন তার নাতিকে নিয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, তখন বুড়োর নাতি তাকে জিজ্ঞাসা করল—'সেই বড় গাছটা কোথায় ছিল?' বুড়ো আঙুল এগিয়ে দিয়ে বলল—'ঐ হোথা।' নাতি বলল—'কই ওখানে তো কিছুই নেই!' বুড়ো বলল—'ঐ হোথা। ঐ হোথা—ঐ অদ্দুর পর্যন্ত, আকাশ পর্যন্ত গাছটা উঠেছিল।'

কীর্তিকর বলেছিল, 'বুঝলে? বস্তু যেটা সেটা অসার, সেটা অনিত্য। আর ঐ ফাঁকা যেটা সেটাই নিত্য।'

হ্যাঁ। এ গল্প যেদিন কীর্তিকর বলেছিল, তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। বলতে ভুলে গেছি, কীর্তিকর মরেছে। তাকে কম্বলে, চাদরে, তোশকে, বালিশে জড়িয়ে চিতায় চড়িয়ে শেষ ক'রে দেওয়া হয়েছে। কীর্তিকর আর নেই। বোধহয় নেই বলেই তার কথা আমার মনে হয়। সেই সঙ্গে আবছা কথা, ওঠা-বসার সঙ্গে কীর্তিকরের তৈরি এই অদ্ভুত গল্পটা আমার মনে পড়ে।

শিল্প-জিজ্ঞাসা
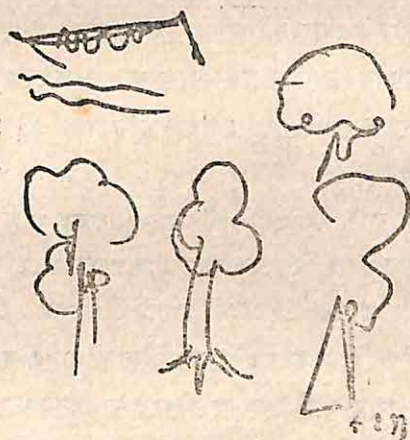
শক্ত মোমের তাল হাতের উত্তাপে রৌদ্রের ঝাঁঝে ধীরে ধীরে নরম হয়ে আসছে, আঙুলের চাপে বস্তুটার আকার-প্রকার বদলে যাচ্ছে। এখন মোমের তাল হাতের টানে লম্বা করা যাচ্ছে, ছুরি দিয়ে কাটা যাচ্ছে, যেমন ইচ্ছা তেমনই তার আকার বদলে দিতে কষ্ট হচ্ছে না।

এইভাবে মোমের তাল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একদিন তার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এল একটা আকার, মানুষ কি বাঁদর ঠিক ঠাওর না করতে পারলেও এটা যে বস্তুপিণ্ডের স্বাভাবিক আকার থেকে ভিন্ন তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।

এইভাবে টেপাটেপি করতে করতে একদিন মোম থেকে বেরিয়ে এল একটা মানুষের আকার। ছেলে কি মেয়ে তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। তবে এটি যে মানুষ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে মিল না থাকলেও এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। অন্যান্য মোমের তাল থেকে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

উত্তাপ বাড়িয়ে দিতেই মোমের তৈরি মানুষ আবার বস্তুপিণ্ডে পরিণত হল। যদি কেউ চায় তবে আবার একই মোম থেকে আরও অনেক রকম আকার-প্রকার বেরিয়ে আসতে পারে। বস্তুপিণ্ডকে রূপান্তরিত করার এই যে দাবি, এই থেকে দেখা দিয়েছে শিল্পরূপ।

মাটি, ইঁট, পাথর, কাঠ, লোহা, প্লাষ্টিক সকল বস্তুর মধ্যে নিহিত আছে নতুন রকমের আকার-প্রকার। বস্তুবিশেষের স্বভাব আয়ত্ত করতে পারলেই শিল্পী তার থেকে নানা আকার-প্রকার উদ্ভাবন করতে পারেন। বৈজ্ঞানিক বস্তুপিণ্ডের বিভিন্ন বস্তু-উপাদান আবিষ্কার করতে পারেন। কাঠ, পাথর, কাটতে হলে কি রকম শক্ত হাতিয়ারের প্রয়োজন, মাটি পোড়াতে গেলে কতখানি উত্তাপের দরকার, এসব বৈজ্ঞানিকদের কাছে জানা যাবে। কিন্তু বস্তুর মধ্যে আর একটি সত্তা নিহিত আছে, সে খবরে বৈজ্ঞানিকদের প্রয়োজন নেই।

প্রদীপ, তেল, সলতে সবই আছে কিন্তু সেখানে আলো নেই। দেশলাই জ্বেলে প্রদীপ জ্বলে উঠল, আলো হল, উত্তাপও পাওয়া গেল। বিজলী বাতি দেশলাই দিয়ে জ্বালা যাবে না। সুইচ টিপলেই জ্বলে উঠবে। টর্চের আলোয় অন্য বাতি জ্বলবে না।

যেসব মানুষ নিজের অন্তরের উত্তাপ দিয়ে প্রকৃতি-জাত বস্তু দিয়ে আকারের জগৎকে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পারে তাদেরই আমরা বলি শিল্পী। আর যাদের হাতে

বুদ্ধির চর্চা আছে তারা শিল্পীর রচনাকে দেখতে পারে কিন্তু নতুন রচনাকে সৃষ্টি করতে পারে না।

শিল্পী যা সৃষ্টি করে তা চিরস্থায়ী নয়। অনেককিছু ভেঙে মুছে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। আবার কিছু কিছু মাটির নিচে চাপা পড়ে যায়। বহু শতাব্দী পরে তার উদ্ধার হয়। অতীতের সৃষ্টি কখনো বা বর্তমানকে আলোকিত করে কখনো বা তার সে শক্তি থাকে না। কেবল অতীতের স্মৃতির ধারক মাত্র হয়ে থাকে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রভাবে সভ্যতার বিকাশ-বিবর্তন বদলে যায়, তা আমরা নিজেদের জীবনযাত্রার দিকে লক্ষ্য করলেই অনুভব করতে পারি। বৈজ্ঞানিকের এই অবদানের সঙ্গে তুলনা করলে অনেক সময় শিল্পীর অবদান সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। কারণ শিল্পী প্রত্যক্ষভাবে কোনো সামাজিক সমস্যারই সমাধান করে না। তবু শিল্পের প্রয়োজন আছে বলেই এই কাজকে কোনো দিনই সমাজ বর্জন করে নি।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যেমন আছে তেমন তার হৃৎপিণ্ডেরও কিছু প্রয়োজন আছে। শরীরের অভ্যন্তরে এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটিতে যদি ছুঁচ ফুটিয়ে দেওয়া যায় তবে মানুষের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। শিল্প, সংগীত, সাহিত্য সমগ্রভাবে সমাজের হৃদযন্ত্র-রূপে কাজ করছে। এগুলিকে নষ্ট ক'রে দিলে সমাজজীবনে মনুষ্যত্ব লোপ পাবে। ব্যক্তিজীবন মমত্বহীন যন্ত্রে পরিণত হবে।

জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েও শিল্পের বিকাশ সহজসাধ্য নয়। এই প্রসঙ্গে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে আজকের দিনে শিল্প ও বিজ্ঞানের যে পার্থক্য সেটি অস্বাভাবিক সামাজিক পরিস্থিতিরই ফল। সকল শিল্প কাব্য-কলা এককের সৃষ্টি। তৎসত্ত্বেও পরম্পরারও শিল্পে যে কিছু স্থান নেই তা নয়।

ছোট ছেলে করাত নিয়ে খেলা করতে করতে আবিষ্কার করতে পারে যে করাতের কোন দিকটি সোজা, কোন দিকটি উলটো। ছুরি-কাঁচি চালানো, কথা বলা, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়াচড়া সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন সকলের পক্ষে সম্ভব। তবে এই জাতীয় শিক্ষা সময়সাপেক্ষ। এই জন্য প্রয়োজন হয় অন্যের সাহায্য নেওয়া।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যের সাহায্য যতটা দরকার শিল্পের ক্ষেত্রে ততটা নয়। কী ক'রে শক্ত জিনিস কাটতে হয়, কী ক'রে কীভাবে দেওয়ালে কাগজে, মাটিতে রং লেপতে হয়, চাক কী ক'রে ঘুরোতে হয়, এগুলি পরম্পরার পথে জেনে নেওয়ার দরকার। শিল্পের ভাষা যখন জটিল হয়ে ওঠে তখন পরম্পরার আধিপত্য বেড়ে চলে,

শিল্পের নিজের সৃষ্টি-শক্তি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পরিণত হয় এবং শিল্পের মৃত্যুর কারণ ঘটে। বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ-যুক্তির পথ ধরে শিল্পী কাজ করে না। হৃদয়াবেগের শক্তিতেই শিল্প আত্মপ্রকাশ করে বিভিন্ন উপদানেরই আশ্রয়ে।

বৈজ্ঞানিক যুক্তির সঙ্গে শিল্পীর যুক্তির পার্থক্য যে কতটা, সে সম্বন্ধে উপরে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তব সত্যের সঙ্গে শিল্পের মিল খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। শিল্পের নিজস্ব সত্তা উপলব্ধি করার সঙ্গে দর্শক শিল্পের যুক্তি উপলব্ধি ক'রে থাকেন।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—এই ইন্দ্রিয়-জাত উদ্দীপনা শিল্পীর পথ আলোকিত ক'রে থাকে। যেখানে এইসব ইন্দ্রিয়-জাত উদ্দীপনা নেই সেখানে শিল্পরূপের অস্তিত্ব নেই।

ইন্দ্রিয়-জাত উদ্দীপনা শিল্পীর প্রধান অবলম্বন হলেও এইসব উদ্দীপনা অনির্বচনীয় বিমূর্ত ক'রে তুলতে না পারা পর্যন্ত চরম সার্থকতা সম্ভব নয়। তাই বলতে হয় শিল্প প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, মূর্ত ও বিমূর্ত এই দুই চরম সীমাকে চুম্বক শক্তির মতো ধারণ ক'রে আছে। শিল্পের যে অংশটি মূর্ত, যা আমরা চোখে দেখি, কানে শুনি, হাতে স্পর্শ করি, সেই অংশটি ভাষা-আঙ্গিক-আশ্রিত, আর যেখানে শিল্প বিমূর্তের দিকে এগিয়ে চলে সে অংশটি সৃষ্টি হয় শিল্পীর অন্তরের উত্তাপে।

বৈদ্যুতিক শক্তির মতো এই শক্তি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের বাস্তব সত্যকে নতুন আলোয় আলোকিত করে।

ভাষা-আঙ্গিক শেখানো যায়, আবেগ-উদ্দীপনা শেখানো যায় না। এটি সহজাত শক্তি। কোথাও এর উত্তাপ কম কোথাও বেশি। এখানে পরম্পরা অথবা সমাজের দাবিতে এই ব্যক্তিনির্ভর শক্তিকে চেপে মারার চেষ্টা এক রকমের সামাজিক বর্বরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বর্বরতার সম্মুখীন হয়েই শিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ দেখা দেয়। মুষ্টিমেয় শিল্পীর উপলব্ধির সাহায্যে শিল্পের নতুন যুগের সূচনা দেখা দেয়। যেমন হয়েছে আধুনিক যুগে।

ভাষা মাত্রেই বিবর্তনশীল। সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, নৃত্যকলা এর কোনোটারই ভাষা একভাবে চলে না এবং এই পরিবর্তন সৌন্দর্যবোধের দ্বারাই ঘটে

থাকে। ভাষা বিবর্তনশীল হওয়া সত্ত্বেও কতকগুলি মৌল উপাদান একই থেকে গেছে।

সংগীত শব্দাশ্রিত। শব্দ থাকবে না অথচ সংগীত থাকবে এমনটি হয় না। সাহিত্য শব্দাশ্রিত হলেও সেখানে অর্থ প্রধান লক্ষ্য। উত্তম কাব্যে শব্দ-অর্থের যুগপৎ সমন্বয় হয়ে থাকে।

শিল্পকলা (স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র ইত্যাদি) আকারাশ্রিত। শিল্পের ভাষার সাহায্যে শব্দ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ফুলের রং কবি বর্ণনা করতে পারেন, তবে রঙের আবেদন ও উদ্দীপনা দেখানো সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব নয়। অপরদিকে এই কাজটি শিল্পী করতে পারেন অনায়াসে রঙের লেপ দিয়ে।

চিত্রের মতো মূর্তিও দৃশ্যজাত উদ্দীপনার সাহায্যে সৃষ্টি করে শিল্পী। এ ক্ষেত্রে দৃশ্য-জাত উদ্দীপনা অপেক্ষা স্পর্শজাত অভিজ্ঞতার আবেদনই অধিক সক্রিয়। স্পর্শের সাহায্যে আলোকহীন স্থানে মূর্তির আকার-প্রকার খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু আলোকহীন স্থানে চিত্রের কোনো আবেদন নেই।

আমরা কথা বলার সময় হাত-পা নেড়ে মুখভঙ্গি ক'রে বক্তব্য বিষয়কে অনেক সময় প্রাঞ্জল করার চেষ্টা করি। এই অঙ্গভঙ্গিকে নাটকীয় ভঙ্গি বলা চলে, কিন্তু নৃত্য বলা চলে না! কারন নৃত্যে অঙ্গভঙ্গি প্রধান, অর্থব্যঞ্জক বাক্য সে ক্ষেত্রে গৌণ এবং সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়।

অঙ্গভঙ্গি, অর্থব্যঞ্জক শব্দ, সাজপোশাক ইত্যাদির সমন্বয়ে দেখা দিয়েছে অভিনয়ের ভাষা। অভিনয়ের ভার (Dramatic element) চিত্রে, মূর্তিতে, নৃত্যে, সাহিত্যে উপাদান-রূপে গৃহীত হতে দেখা যায়। প্রয়োজনের তাগিদে, ভাবের আবেগে অথবা যুক্তি-বিচারের পথে কোনো তথ্য প্রকাশ করার প্রয়োজন থেকে বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে। এই তিনের মধ্যে ভাব-মুখী ভাষাই গতি-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

শিল্পের ভাষা মূলত ভাবপ্রধান। প্রত্যেক ভাষার কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে অপর দিকে আছে ভাষার মধ্যে নিহিত সম্ভাবনা (Limitation and possibility)। অনুসন্ধান করলে লক্ষ্য করা যাবে শিল্পের ভাষা ও আঙ্গিক কোনো শব্দ প্রকাশ করে না।

শব্দাশ্রিত বাক্যের সাহায্যে তথ্য প্রকাশ বা প্রয়োজনীয় বিষয় ব্যক্ত করা যত সহজ শিল্পের ভাষায় তেমন নয়। পরিবর্তে শিল্পের ভাষা প্রকাশ পায় আকার ও

ভঙ্গির আশ্রয়ে ! যে কোনো দেশের যে কোনো শিল্পের বিশ্লেষণ করলে শেষপর্যন্ত পাওয়া যাবে মৌল উপাদানরূপে আকার ও ভঙ্গি।

আলোকোজ্জ্বল, বর্ণময় জগতের মধ্যে আকার ও ভঙ্গি বৈচিত্র্যময় হয়ে আমাদের যে বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে সেই উদ্দীপনার পথেই শিল্পকলার সৃষ্টি।

উদ্দীপনা থেকে ভাব, ভাব থেকে রস-সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। শিল্পীর সৃষ্টিতে অর্থাৎ শিল্পীর বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং মানসিক প্রবণতা এই দুটির সমন্বয় ছাড়া ভাষার পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটে না।

এখন প্রয়োজন এই দুই ভিন্ন উপাদানকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা ক'রে উপাদান-গত বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্পষ্ট ক'রে তোলা।

প্রকৃতি-জাত বস্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সীমিত করা যায়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই উপাদান কয়টি দিয়েই জগতের সৃষ্টি। এই বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়। শিল্পসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন আবেগ ও উদ্দীপনা। আবেগ ও উদ্দীপনার যুগপৎ মিশ্রণে সীমিত বাস্তবতা বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে।

আদিম চিত্রে গতি ও ভঙ্গির প্রকাশই সর্বপ্রধান। আরও নানাদিক দিয়ে সন্ধান করলে মনে হয় গতিভঙ্গির প্রভাবেই আকারকে প্রত্যক্ষ করেছে মানুষ এবং যাদের এই উদ্দীপনা অধিক শক্তিশালী তারাই শিল্পরূপ নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়েছে।

জীব-জগতের আকার-প্রকারের বহু বৈচিত্র্য থাকলেও সে ক্ষেত্রে আকার ও ভঙ্গির ক্রিয়া বৈচিত্র্যের দ্বার খুলে দেয়। উদ্ভিদ ও জীব-জগতের যেকথা সেই কথাই প্রয়োগ করা চলে প্রকৃতি-জাত সকল বস্তুতে।

মানুষের আকার-প্রকার এক রকম। অস্থি, মেদ-মজ্জা দিয়ে গড়া মানুষের আকার যখন নৃত্যের ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করে তখন তার আবেগ ও উদ্দীপনার রূপান্তর ঘটে। বটগাছের ছোট চারা ও অতিকায় বটগাছ উভয়ের যে পার্থক্য সেটি প্রধানত ভঙ্গিরই পার্থক্য। স্থির অবস্থায় হরিণ এবং দ্রুত ধাবমান হরিণের মধ্যে আকারগত মিল থাকলেও গতির পার্থক্যে উভয়ের মধ্যে আবেগ ও উদ্দীপনার পার্থক্য।

ভাব, ভঙ্গি, আকার এগুলি সম্বন্ধে ধারণা সর্বসাধারণের মধ্যে আছে। তবে যখন এই উপাদানগুলির বিশেষ সংযোগ ঘটে তখন সেই যুক্ত আকারের বৈশিষ্ট্য সে সহজে বুঝতে সক্ষম হয় না, তখন দরকার হয় নতুন দৃষ্টিকোণের।

সাহিত্যিক যেসব শব্দ ব্যবহার ক'রে থাকেন সেই শব্দগুলি অভিধানে পাওয়া যায়, কিন্তু অভিধানিক অর্থ এবং সাহিত্যে-গাঁথা শব্দের তাৎপর্য বদলে যায়। এই তাৎপর্য বদলে যাওয়ার শক্তিকেই আমরা বলি সৃষ্টিশক্তি।

দৃশ্য ও স্পর্শ এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটেছে চিত্রে ও ভাস্কর্যে। এই কারণে দুই উপাদানকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা চলে না। চিত্রে ভাস্কর্যের উপাদান এবং ভাস্কর্যে চিত্রের উপাদান মিলে মিশে আছে (চিত্রে আলো প্রধান)।

উপরের আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে আকার ও ভঙ্গি বাস্তব জগতে এবং শিল্পের জগতে অঙ্গাঙ্গি হয়ে মিশে আছে। আকার আছে ভঙ্গি নেই, ভঙ্গি আছে আকার নেই তেমনটি ঘটে না। এইবার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

আকার ও ভঙ্গি এই দুই বাক্যের সাহায্যে প্রকৃতিকে চেনা যায় না। প্রকৃতিকে আমরা চিনে থাকি নামের সাহায্যে। তাই কথায় বলে 'নাম-রূপের এই জগৎ'। এই নাম-রূপের জগতের অন্তরালে রয়েছে আকার ও ভঙ্গি। অর্থাৎ সমস্ত জগৎ আবৃত রয়েছে নাম-রূপের আচ্ছাদনে। উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও লয়—প্রকৃতির এই নিয়ম থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই। ইন্দ্রিয়-জাত জগতে যে এত বৈচিত্র্য, তার মূলে আছে এই দুর্লঙ্ঘ্য আইন।

শিল্পী যখন এই নিরবচ্ছিন্ন গতি উপলব্ধি করে তখন তার শিল্পে দেখা দেয় রস-সৌন্দর্য। শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই গতিকেই বলা হয় ছন্দ বা Tension।

চীন শিল্প-শাস্ত্রে 'চী' (Chi), ভারতে অলংকার শাস্ত্রে রস ও ধ্বনি, গ্রীক শাস্ত্রে সৌন্দর্য (Beauty) এইগুলি জীবনপ্রবাহকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। যখন এই জীবনপ্রবাহের উপলব্ধি শিল্পী ক'রে থাকে তখন জীবনের যে কোনো ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেও ঐ একই প্রবাহের ইঙ্গিত দিতে সক্ষম। এই জন্যই মহৎ শিল্পের মধ্যে একটি ব্যাপকতার ইঙ্গিত আমরা পেয়ে থাকি যেটি শিল্প-রূপকে বাস্তব থেকে রূপান্তরিত করে। তখন তার আবেদন হয় অনির্বচনীয়।

আমাদের মন নানা সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন। সুন্দর, অসুন্দর সম্বন্ধে আমাদের যে আদর্শ তার অনেকখানি সংস্কারের দ্বারা চালিত। ধ্যান-ধারণার পথে পূর্বার্জিত এই সংস্কার থেকে শিল্পী নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম। এই জন্যই কালে-কালে শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সৌন্দর্য সম্বন্ধে নতুনতর চেতনা দর্শকদের কাছে উপস্থিত করে।

ধ্যান-ধারণার সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কারণ অনুরূপ আলোচনার জন্য দরকার দার্শনিক মননশীলতা ও যোগীর উপলব্ধি। শিল্পীর ধ্যান-ধারণা কিরকম হয়ে থাকে, কতটুকু আবশ্যিক, সেই বিষয়েই এ ক্ষেত্রে আলোচনা করা গেল।

নিজের শিল্প-দৃষ্টিকে সংস্কারমুক্ত করার জন্য প্রয়োজন তীব্র আবেগ এবং একাগ্রতা। চরম দুঃখ, চরম লাঞ্ছনা, তীব্র আনন্দ, তীব্র শোক এইসব অভিজ্ঞতার পথে মানুষের মন এমন একটা অবস্থায় উপনীত হয় যখন আশেপাশের ঘটনা তাকে আকৃষ্ট করে না। তাই শিল্পীর প্রয়োজন জীবনে কোনো চরম মর্মান্তিক বা তীব্র আবেগ। জন্ম, মৃত্যু, প্রেম, বিরহ এগুলি তাই শিল্পে সাহিত্যে বারংবার প্রতিফলিত হয়েছে।

একাত্মবোধ জন্মালে শিল্পীর ধ্যান সার্থক হল বুঝতে হবে। সৃষ্টিরত শিল্পীর মন থেকে সংসারের অনেক কথা মুছে যায়। এর সঙ্গে আরও একটি কথা, কাজের সঙ্গে নিজেকে এক ক'রে দেওয়া (Involvement), অর্থাৎ যা করছি সেটাই সর্বপ্রধান, আর সব গৌণ। বলতে বা লিখতে গিয়ে অনেক সময় সহজ জিনিস জটিল হয়ে ওঠে। ধ্যান, একাত্মবোধ শব্দগুলি শুনলেই আমরা চমকে উঠি। অথচ যে কাজে আমাদের মন বসে সে কাজেই ধ্যানের উপলব্ধি হয়। তবে কখনো সেই ধ্যান কয়েক মুহূর্তের, আবার কখনো সেই একাগ্রতা, ধ্যান, একাত্মবোধ জীবনব্যাপী হতে পারে। শিল্পীর সাধনার বস্তু এই জীবনব্যাপী ধ্যানের সৃষ্টি।

স্মৃতিশক্তির দ্বারাই বস্তুজগৎ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা স্থায়ী হয়ে থাকে। শৈশবে যে গাছ, যে ফুল আমরা দেখেছি সেটিকে পরিণত বয়সে দেখলেই আমরা চিনতে পারি। তার মূলে আছে স্মৃতিশক্তি। স্মৃতি-পটে কত যে বিচিত্র বস্তু, কত রঙ, কত শব্দ, মুহূর্তে-মুহূর্তে চিহ্ন রেখে যাচ্ছে তার সবটা অনেক সময় আমাদের মনে থাকে না। কোনো অংশ স্পষ্ট, কোনো অংশ অস্পষ্ট থেকে যায়। কিন্তু যেগুলি গভীরভাবে আমাদের স্মৃতিপটে চিহ্নিত থাকে সেগুলিকে আমরা ভুলি নি। সুখ, দুঃখ, ভয় ইত্যাদি ভাবের সঙ্গে যুক্ত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ স্মৃতিতে স্থায়ী হয়ে থাকে।

স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে শিল্পী যা রচনা করেন তা প্রকৃতি-জাত উদ্দীপনার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বা রূপান্তরিত নয়। উদ্দীপনা ধারণায় রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত উপাদানগুলি সার্থক শিল্পসৃষ্টির উপযোগী হয়ে ওঠে না।

বহু নরনারীর শরীর দেখতে দেখতে নারী-পুরুষের একটি বিশিষ্ট রূপ আমাদের

ধারণার জগতে জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং বাস্তবের এক রকমের রূপান্তর ঘটে। বাস্তব রূপের বহু আকস্মিক আকার-প্রকার মুছে গিয়ে প্রতিমা-রূপে (Image) আত্ম-প্রকাশ করে।

প্রত্যক্ষ উদ্দীপনা থেকে স্মৃতি, ধ্যান থেকে ধারণা, ধারণা থেকে বিমূর্ত উপলব্ধির জগতে আমরা পৌঁছাই। বিশ্লেষণের ভাষায় বিষয়টি যেভাবে আমরা বলবার চেষ্টা করলাম ব্যাপারটি ঠিক সেইভাবে ঘটে না। প্রত্যক্ষ উপলব্ধি থেকে ধ্যান-ধারণা উপলব্ধি করে শিল্পী। এই জন্যই দীর্ঘকালের একাগ্র অভিনিবেশ শিল্পীর জীবনে আবশ্যিক।

দীর্ঘকালের অভিনিবেশের পথেই প্রকৃতির ব্যাপক অস্তিত্ব একের সঙ্গে অন্যে সংযুক্ত হয়। এইগুলি স্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হয়ে থাকে। ফুল, পাতা, মানুষ, জল, আকাশ যে কোনো একটিকে লক্ষ ক'রে শিল্পী ধ্যানলব্ধ উপলব্ধিকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়ে থাকে।

উদ্দীপনা, ভাব-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি বিবিধ গুণ একের সঙ্গে এক যুক্ত হয়ে একটি অখণ্ড অস্তিত্বে পরিণত হয়। এই অবস্থা উপলব্ধি করতে হলে প্রয়োজন একাত্মবোধ। এই একাত্মবোধ শৈশবে অতি শক্তিশালী থাকে। এই কারণেই পরিণত শিল্পীকে শিশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই একাত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের জন্য বিচারবুদ্ধি অন্তরালে থেকে যায়। পরিবর্তে প্রত্যক্ষ আবেগ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শিল্প-ভাষার গতি-প্রকৃতি এবং আকার-প্রকার আবেগের তীব্রতার ওপরই নির্ভর করে। এইখানেই শিল্পীর ধ্যান এবং যোগীর ধ্যান ভিন্ন পথে চলে। যোগীর আদর্শ স্ফটিক-শুভ্র শুদ্ধতার উপলব্ধি। শিল্পী চায় স্ফটিকের উপর লাল ফুলের ছায়া।

আনন্দ, সৌন্দর্য, প্রাচুর্য এগুলিও স্ফটিক-শুভ্র শুদ্ধতারই প্রকাশ। আর এক দিকে একথা যাঁরা স্বীকার করছেন তাঁরা ভক্তি-ভালবাসার পথ গ্রহণ করেছেন। শিল্পীও এ পথের পথিক। তাই বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি বলেছেন : 'জনম অবধি হাম রূপ নিহারলুঁ, নয়ন না তিরপিত ভেল।'

তৃপ্তি ও অতৃপ্তির মধ্য দিয়ে শিল্পী নিজেকে এক ক'রে যে চেতনার সাক্ষাৎ পায় তা শিল্পী-জীবনের সর্বপ্রধান সম্পদ এবং এই চেতনাকে ভাষার আধারে যে প্রকাশ করতে সক্ষম তাকেই আমরা বলি শিল্পী। এই উপলব্ধিরই প্রকাশ শিল্পে, সাহিত্যে, সংগীতে আমরা উপভোগ করি এবং এক অনির্বচনীয় অবস্থায় উপনীত হই।

আকার-প্রকার দেখে শিল্পীর মনে তার উদ্দীপনা জাগে। এর মধ্যে কোনো কথা

নেই। কথা দিয়ে যা ব্যক্ত করা যায় না সেটিকে বোঝাবার জন্য অনেক কথা বলতে হল।

সৃষ্টি-রত শিল্পীর কাছে এইসব কথার প্রয়োজন বিশেষ নাও থাকতে পারে। এমনকি এত কথা না জেনেও সে সার্থক শিল্প সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু শিল্প-সৃষ্টির পর শিল্পী যখন নিজের সৃষ্টিকে দেখে তখন মনে ভাল-মন্দের বিচার দেখা দিতে বাধ্য। এ ভাল-মন্দের বিচারের কাছে বিচারবুদ্ধি সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বিচারের শাণিত অস্ত্রে খণ্ড-খণ্ড হয়ে যেতে পারে। কাজেই তত্ত্ব তথা তথ্যের প্রয়োজন আছে এও যেমন সত্য, তেমনি তথ্যের দ্বারা সৃষ্টির পূর্ণতা হয় না সে কথাও মিথ্যা নয়।

শিল্পী রস-সৌন্দর্যের পূজারী। সেই পূজার প্রত্যক্ষ প্রকাশ তার আঙ্গিক ও উপকরণের সাহায্যে। ভাষার বৈশিষ্ট্য, আঙ্গিকের স্বকীয়তা যার জানা নেই, যে এগুলি অভ্যাসের পথে আয়ত্ত করে নি সে রসিক হতে পারে, স্রষ্টার মর্যাদা সে পেতে পারে না স্রষ্টা হতে হলে প্রয়োজন ভাষাজ্ঞান।

সূর্যের আলোক-ছটার মতো মানুষের জ্ঞান এক অমূল্য সম্পদ। এই জ্ঞানের প্রকাশ নানা পথে। শিল্পীর জীবনে জ্ঞানবুদ্ধির উপযোগিতা এবং বৈজ্ঞানিকের পক্ষে একই জ্ঞানের উপযোগিতা ভিন্ন রকম। শিল্পী জ্ঞানবুদ্ধির প্রভাবে শিল্প-রূপকে নতুন-নতুন বৈচিত্র্য দিতে পারে কিন্তু সৃষ্টি করে না। বিচার-বুদ্ধির প্রয়োজন বৈজ্ঞানিকের চেয়ে শিল্পীর অনেক কম হতে পারে, তাতে শিল্পসৃষ্টিতে বাধা পড়ে না।

সাহিত্যের ভাষা-শিল্পের করন-কৌশল কালে কালে বদলে যায়। এ পরিবর্তনের মূলে প্রায়ই দেখা যায় সমাজগত আদর্শ। এই আদর্শ যেমন শিল্পী-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, অপরদিকে শিল্পী সমাজ-মনকে প্রভাবান্বিত করে। অনুকূল অবস্থায় সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ সহজ হয়, প্রতিকূল অবস্থায় সংঘাত অনিবার্য।

শিল্পের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য উপরের বর্ণিত দুই কারণে ঘটে থাকে। বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিল্পের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান করতে গেলে লক্ষ করা যাবে যে ভাষাগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য কোনোদিনই সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায় নি। যে বৈশিষ্ট্যগুলি কালে কালে ভাষা নিয়ন্ত্রিত করেছে সেগুলির সম্বন্ধে জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত শিল্প-দৃষ্টি বাধা পেতে পারে।

আকার, ভঙ্গি, উদ্দীপনা, ধ্যান-ধারণা—এইগুলিকে বলা যায় শিল্পের অন্তরের বস্তু। আঙ্গিকের সাহায্যে নির্মিত হয় আধার। এবং উদ্দীপনা ধ্যান-ধারণা এগুলিকে বলা যেতে পারে আধেয়। আধার ও আধেয় উভয়ের অখণ্ড সংযোগে প্রকাশিত হয় রস-সৌন্দর্য। যেটিকে বলা হয় 'সহৃদয়-হৃদয় গ্রাহ্য'। শিল্পের জগতে আধার এবং আধেয় এই দুইয়ের সম্বন্ধ স্থাপনের কোনো নির্ভুল কৌশল আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি এবং ভবিষ্যতেও শিল্পজগতে এই দিকটি রহস্যাবৃত থাকবে। কেবলমাত্র প্রতিভার শক্তিতে এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে থাকে। নির্মিতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব।

শিল্পীর প্রয়োজন উভয়ের সমন্বয়। এই সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজন প্রেরণা। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির পথে আবেগ ও জ্ঞানবুদ্ধির সমন্বয় ঘটে। এই জন্যই প্রতিভার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে 'নব-নব উন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা'।

সচরাচর দেখা যায় বুদ্ধির ক্রিয়া আবেগের অন্তরালে, অর্থাৎ আবেগকে সংযত ক'রে চালিত করছে জ্ঞান-বুদ্ধি। দ্বিতীয়ত দেখা যায় নৈতিক বা দার্শনিক জ্ঞান আবেগের দ্বারা চালিত হতে। তৃতীয়ত দেখি আবেগ ও জ্ঞান-বুদ্ধির মধ্যে সংঘাত। শিল্পীর মানসিক গঠনে যখন এই সংঘাত অতি প্রবল তখনই তার রচনাতে সংঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং যেখানে আবেগ-বর্জিত জ্ঞান-বুদ্ধি সে ক্ষেত্রে শিল্প-রূপের মাধ্যমে শিল্পী নৈতিক, দার্শনিক বা সামাজিক কোনো একটা আদর্শকে প্রচার করার চেষ্টা করে।

উদ্দীপনা ও আবেগের পথে শিল্পসৃষ্টি হয় একথা সত্য হলেও বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাব সে ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়, একথা মনে করার হেতু নেই। বুদ্ধিবৃত্তি হৃদয়বৃত্তির মতোই মানুষের চরিত্রগত গুণ। জ্ঞান-বুদ্ধির প্রভাবে মননশীলতা মার্জিত উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এই কারণে মননশীলতার অংশটি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া চলে না শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে। একথা ঠিক যে বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে শিল্পসৃষ্টি হয় না, কিন্তু শিল্পীর আদর্শ উদ্দেশ্যকে আলোকিত করার জন্য বুদ্ধিবৃত্তি সকল সময় সাহায্য করছে। এই জন্য শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টিতে Intellect-এর প্রভাব আমরা লক্ষ করি। তবে এই দুই বৈশিষ্ট্য অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং হয়েও থাকে তাই।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আদিম শিল্প পর্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ অন্তরালে থেকেছে। ধর্মীয় আদর্শ বুদ্ধিবৃত্তির স্থান অধিকার ক'রে ছিল। সে সময় শিল্পীদের চিন্তা সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকেছে। ক্রমে শিল্প যতই

ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়েছে ততই বুদ্ধির প্রভাব শিল্পের ক্ষেত্রে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে এবং বৈজ্ঞানিক যুগে শিল্পীরা একান্তভাবে বিচারনিষ্ঠ এবং বুদ্ধিমার্গী হয়ে উঠেছে।

Intellect-এর সঙ্গে শিল্পসৃষ্টির সম্বন্ধ কখনো নিকটে কখনো দূরে থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। শিল্পীর মানসিক গঠনের সঙ্গে বুদ্ধি-বৃত্তি ও হৃদয়-বৃত্তি জড়িত থাকে। বৈজ্ঞানিক মনোভাব, দার্শনিক মনোভাব, আবেগপ্রধান মনোভাব শিল্পীর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলেমিশে আছে। এগুলি কোনটি প্রধান হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে শিল্পী নিজেও বলতে পারেন না। এবার দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

যদি কোনো মধ্যযুগীয় কারিগরকে তার রচিত শিল্পরূপের ব্যাখ্যা দিতে বলা হয় তবে সে ধ্যান-ধারণার কথা বলবে অথবা তার আঙ্গিক সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা ক'রে দেবে। পরম্পরার পথ ধরে চলার কারণে কারিগরদের নিজস্ব চিন্তা সব সময় উজ্জ্বল থাকে না। পরিবর্তে সে জানে তার দায়িত্ব কী?

ভাষা সম্বন্ধে তার ধারণা খুবই স্পষ্ট, কিন্তু বিশ্লেষণ ক'রে সেই ভাষার স্বকীয়তা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা প্রায় সম্ভব হয় না। বৈজ্ঞানিক-পূর্ব যুগের শিল্পী কেবল উদ্দীপনা, ভাব, সৌন্দর্য উপলব্ধি করা ছাড়া আর সবকিছুকেই আনুষঙ্গিক বলে মনে করেছে।

সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সমস্যা এসব বিষয়ে তার ধারণা অস্পষ্ট থাকাই স্বাভাবিক। সোজা কথায় পরম্পরার পথে যে আদর্শ তার কাছে উপস্থিত হয়েছে সেটিকে ধ্যান-ধারণার পথে উপলব্ধি করাই তার সাধনা। এবং ধ্যান-ধারণার পথে জ্ঞানের উন্মেষ তার শিল্পরচনাকে সজীব রেখেছে।

বহুবিধ তথ্য আহরণের শক্তি ও কৌতূহল মধ্যযুগীয় শিল্পীদের জীবনে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় না হলেও গৌণ। সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক-পূর্ব যুগের শিল্পীদের জীবনে বৈজ্ঞানিক তথ্য অপেক্ষা সৌন্দর্য তত্ত্বই তার অনুসন্ধানের বিষয় ছিল।

মোমের তাল নাড়াচাড়া করতে কেমন ক'রে বিশেষ রকমের জড় বস্তু থেকে একটি আকার বেরিয়ে এল সেই রহস্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভাষাগত বৈশিষ্ট্য, ধ্যান-ধারণা, বুদ্ধি বিবেচনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচনা করা গেল। তার সবটাই প্রায় শিল্পীর অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে। কেবল মাত্র ধ্যান-ধারণা (Contemplation) ও বুদ্ধি-বিচার (Intellect) এই দুই শক্তি শিল্পের অন্তরে প্রবেশ করবার প্রধান অবলম্বন। অবশ্য ওপরের দুই শক্তি শিল্পীর অভিজ্ঞতারই অংশ। কিন্তু এই

দুই অভিজ্ঞতা উপলব্ধির পথে যখন শিল্পের অন্তরের বস্তু (Content) হয়ে দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করে তখনই ধ্যান-ধারণা বা বুদ্ধি-বিচারের চরম সার্থকতা।

শিল্পী যে বিষয় নির্বাচন করে তার বৈচিত্র্যের কোনো অন্ত নেই। যত রকমের উদ্দীপনা তত রকমের বিষয়। অলস কৌতূহল অথবা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পথে যে বিস্ময়, আনন্দ ও বিশেষ রকমের উদ্দীপনা সেগুলি আবেগ-গ্রাহ্য না হওয়া পর্যন্ত কোনো বিষয়ই শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে সার্থক হয় না। যে-উদ্দীপনা শিল্পীর মনকে সচকিত করে সেই উদ্দীপনাই জীবনের সঞ্চিত ভাবাবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আর এক রকমের উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। শিল্পী-মনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই ভাবাবেগ ব্যক্তিকেন্দ্রিক Association-এর সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে আর এক স্তরে পৌঁছায় যে-স্তরে ব্যক্তিজীবনের সংস্কার থেকে অনেক পরিমাণে ভাবাবেগ-মুক্ত হয় এবং শিল্পী সাক্ষাৎ পায় বিশেষ রকমের ধারণার জগৎ। আধ্যাত্মিকতাবাদী দার্শনিকদের মতে এই ধারণার জগৎ অতিক্রম করতে পারলেই বিমূর্ত উপলব্ধির স্তরে পৌঁছান যায়। যদি এই বিশ্লেষণ ঠিক হয়ে থাকে তবে স্বীকার করতে হয় যে ব্যক্তিগত ভাবাবেগের বিমূর্ত ধারণাই শিল্পসৃষ্টির আবশ্যিক উপাদান।

একদিকে উদ্দীপনা-জাত অভিজ্ঞতা অপর দিকে বিমূর্ত উপলব্ধি—উভয়ের উপযুক্ত ভাষার সংযোগে নির্মিত হয়েছে শিল্প-রূপ। পৃথিবীর সর্বত্র উভয় শক্তির সংযোগ-স্তরে যে আবেগময় শিল্পরূপ গঠিত হয়েছে ভৌগোলিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা-ব্যবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে তার কোনো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই। আবার Form নির্মাণের ক্ষেত্রে এই সবের প্রভাব অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

যে ক্ষেত্রে শিল্পী ইন্দ্রিয়-জাত উদ্দীপনাকেই প্রধান বলে দেখে সে ক্ষেত্রে শিল্পীর অনুকরণের পথ অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই। অপরদিকে যে শিল্পী উদ্দীপনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলে ভাবাবেগের শক্তিকে ধারণায় রূপান্তরিত করতে পারে না তার রচনা নানাবিধ তথ্যের দ্বারা চালিত হয়ে থাকে।

মোট কথা, শিল্প-রূপ একান্তভাবে অনুকরণ হতে পারে না অথবা শুদ্ধ জ্ঞানেরও আকর নয়। কিন্তু উভয় গুণ সকল দেশের সকল শিল্পেই বর্তমান। তাই শিল্প-কলা শুদ্ধও নয়, ইন্দ্রিয়-জাত উদ্দীপনার অনুকরণও নয়। অর্থাৎ প্রত্যেক সার্থক শিল্পী-রূপের মধ্যে শিল্পের আবেদন হল একটি বিশেষ রকমের শক্তি। এই চুম্বক শক্তিতে

বাস্তব উদ্দীপনা এবং বিমূর্ত উপলব্ধি এক বিন্দুতে এসে মেলে। তবে এই সংযোগের কোনো একটি নির্দিষ্ট অথবা কাল-নিরপেক্ষ অবস্থান আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। কোনো শিল্পী কীভাবে এই সংযোগস্থলে পৌঁছাবেন তার কোনো শাস্ত্র নেই বলেই শিল্পের ভাষা কালে কালে বিবর্তিত হয়ে চলেছে। কখনো জটিল, কখনো সরল, কোথাও বা বুদ্ধি-প্রধান (Intellectual) কোথাও বা ভাব-প্রধান (Emotional)।

অনেকেই হয়ত লক্ষ করেছেন যে উপলব্ধ বিষয় যুক্তির পথে প্রমাণ করতে গেলে বিষয়টি জটিল ও দুরূহ হয়ে ওঠে। সম্ভবত এই কারণেই ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র এত জটিল। অথচ যে-সত্যটি অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন অলংকারবিদ্‌রা যুক্তিতর্কের পথে প্রমাণ করতে চেয়েছেন সেটি কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে সহজে। সম্ভবত এই আলোচনা প্রসঙ্গেও অনেক অংশ কিছু জটিল হয়ে উঠেছে।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটির প্রয়োজন হল এই কারণে যে পরবর্তী অংশে যে বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটি আর একটু জটিল—সন্নিকর্ষ, টান (Tension) তথা ছন্দ। এই দুই শক্তির প্রভাবেই শিল্পের ভাষা, ভাব তথা অন্তর ও বাহিরের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়।

বলা প্রয়োজন যে সাহিত্যাশ্রিত ছন্দ ও শিল্পাশ্রিত ছন্দের পার্থক্য আছে। শিল্পে ছন্দের গুণ প্রকাশ করতে গিয়েই শিল্পীর হাতে সৃষ্টি হয়েছে রেখা। এই রেখাই হল ছন্দের প্রতীক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গতির উপলব্ধি থেকেই চিত্রকলার উদ্‌ভব। আকার দেখা গিয়েছে পরে। লাস্কো এবং আল্টামিরা এই দুই গুহা চিত্রের তুলনার পথে সহজেই বুঝতে পারা যাবে যে গতির সাহায্যে চিত্র রচিত হয়েছে সর্বপ্রথম। পরে প্রাধান্য পেয়েছে আকার তথা জ্যামিতি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাটির পাত্র অথবা ছুঁড়ে মারবার জন্য পাথরের অস্ত্র, এগুলির সঙ্গে দৈহিক গতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। চোখের সামনে থেকে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

একজন কাঠের মিস্ত্রি যখন বিভিন্ন আকারের কাঠের টুকরো জুড়ে টেবিল তৈরি করে তখন কারিগরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি, নির্মিত টেবিলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে সক্রিয় ক'রে তোলে। ঘুরন্ত চাকের উপর মাটির তাল কুমোরের হাতের কায়দায় গড়ে তোলে বিভিন্ন রকমের পাত্র। কাঠের মিস্ত্রি ও কুমোর উভয়ের কার্যপ্রণালী

ও উপকরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও একটি জায়গায় তারা অভিন্ন। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই দৈহিক শক্তির প্রয়োগ লক্ষ করা যাচ্ছে। এই দৈহিক গতি পর্যবসিত হয়েই মাটি, পাত্র, টেবিল তৈরি হচ্ছে। এরই নাম সন্নিকর্ষ শক্তি। এটিকে ঠিক ছন্দ বলা চলে না। শক্তির প্রকাশ আর এক ভাবেও হতে পারে। তারও দৃষ্টান্ত এখানে দিলাম।

জলপূর্ণ পাত্রে যদি একটা কাঠের টুকরো ফেলা যায় তখন পাত্র, জল এবং কাঠের টুকরো তিনে মিলে এক রকমের স্পন্দন জাগিয়ে তোলে, যে স্পন্দন বা টান (Tension) জলে, কাঠে বা জলপাত্রে পূর্বে ছিল না।

বিশ্ব-প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। কোনো জায়গায় কোনো একটিবস্তু স্থির হয়ে নেই। ছয় ঋতু, দিন-রাত্রি, কোনো ঘটনাই অকস্মাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে না। সকালের স্থর্যোদয়, দ্বিপ্রহরে সেই স্থর্যের প্রচণ্ডাকার, তার দিকে তখন আর তাকানো যায় না। সন্ধ্যার আকাশে স্থর্য আবার লাল হয়ে দেখা দেয়, কিন্তু সকালের স্থর্যের সঙ্গে তার হুবহু মিল নেই। এই বিবর্তনের অন্তরালে রয়েছে একটি নিরবচ্ছিন্ন গতি-শক্তি। এই গতিকে চিহ্নিত করার জন্য অনেকগুলি নাম দেওয়া হয়েছে। কেউ বলেন কাল-চক্র ; কেউ বলেন স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের খেলা ; কেউ বলেন ছন্দ।

শিল্পস্থষ্টির ক্ষেত্রে এই গতি তথা ছন্দই একমাত্র অবলম্বন। নিঃসন্দেহে বলতে পারি মানুষের স্থষ্টির সার্থকতা ছন্দের পথেই আত্মপ্রকাশ করে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। পার্থক্য কেবল ভাব-ভাবনা, আবেগ-উদ্দীপনার ক্ষেত্রে। আনন্দ, দুঃখ, বেদনা-বোধ এসবও হয়ত জীবজগতে বিদ্যমান, কিন্তু বৈচিত্র্য গভীরতা, তীব্রতার দিক দিয়ে মানুষ থেকে স্বতন্ত্র।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ দ্রুতধাবমান জীবজন্তুর সঙ্গে দৌড়ে শিকার করতে করতে একদিন অনুভব করেছিল নিজের ও ধাবমান জন্তুর মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তথা সন্নিকর্ষ শক্তি। সম্বন্ধের উপলব্ধি প্রকাশ পেল মানুষের অঙ্কিত চিত্রে, ছুঁড়ে মারার পাথরের হাতিয়ারে। দেখা দিল ছন্দ। এ হল আর এক রকমের শক্তির উপলব্ধি। এ বিষয়ে পূর্বেই দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছি।

পাখিকে মারতে উদ্যত নিষাদের দিকে তাকিয়ে কবি বাল্মীকির কাছে প্রথম ছন্দোবদ্ধ ভাষার স্থষ্টি হয়েছিল। পৌরাণিক হলেও এই কাহিনীর থেকে মানুষের শিল্পস্থষ্টির আদি কারণ অনুমান করা যায়। যে শব্দগুলি বাল্মীকি মুনি ব্যবহার করেছিলেন সে শব্দ আজও অভিধানে পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই শব্দগুলি পাঠ

করলেই আমাদের মন ছন্দের গতিতে পৌঁছাবে না। গ্রীক থেকে শুরু করে এই মুহূর্ত পর্যন্ত ইয়োরোপের শিল্প-পরম্পরাতে জ্যামিতির স্থান খুবই ঊর্ধ্বে। প্লেটোর কাল থেকে এই জ্যামিতিক আকারের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে।

যদি আমরা সন্নিকর্ষ-শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করি তাহলে বলতে হয় জ্যামিতিক আকার কর্ষ-শক্তির সাহায্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে। লাস্কো গুহাচিত্রে কর্ষ-শক্তির প্রকাশ আছে। অপর দিকে আন্টামিরার গুহা-চিত্রে আছে জ্যামিতিক আকারের প্রভাব। ক্রমে ইয়োরোপের শিল্পে এই জ্যামিতিক আকার বিমূর্ত গুণ রূপে স্বীকৃত হয়েছে। অপর দিকে সমগ্র এশিয়াতে সন্নিকর্ষ (Tension) ও ছন্দকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই পার্থক্যটি স্মরণ রাখলে আমার পরবর্তী আলোচনা অনুসরণ করা সহজ হবে।

যে বিশেষ রকমের শব্দবিন্যাসের সাহায্যে শব্দ তির্যক গতি পায় সেই বিন্যাসেরই অপর নাম সন্নিকর্ষ-শক্তি। শিল্পের জগতে এই সন্নিকর্ষ-শক্তিকে যত স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায় তেমন সাহিত্যে যায় না। সাহিত্যের ছন্দ অনুভব-গ্রাহ্য, প্রত্যক্ষ করবার উপায় নেই। এই কর্ষ-শক্তিকে প্রত্যক্ষ করি আমরা নরনারীর নৃত্যে।

এখানে যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন যে সন্নিকর্ষ-শক্তি ও ছন্দের গতি উভয়ের মধ্যে কে কার অধীন? জবাবে বলতে হয় কর্ষণই মৌল শক্তি। এই শক্তি ভাবাবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছন্দে রূপান্তরিত হয়ে ছন্দের গতিতে বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। জগতের যাবতীয় বস্তুতে কর্ষ-শক্তি নিহিত রয়েছে। যদি কোনো বস্তুকে পটভূমি বা পৃষ্ঠভূমির থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখতে পাওয়া যেত তবে সে বস্তুর সন্নিকর্ষশক্তি অনুভব-গ্রাহ্য হতো না। যেহেতু বস্তু মাত্রেই একটি নির্দিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে, উভয়ের সম্বন্ধে লক্ষ করা যাচ্ছে কর্ষ-শক্তির বিশিষ্টতা। ছন্দ এই বিশিষ্ট সন্নিকর্ষ-শক্তিরই বৈচিত্র্যময় রূপ। আবেগের শক্তিতে ছন্দ শিল্পের জগতে আত্মপ্রকাশ করে এবং সন্নিকর্ষ-শক্তির অন্তরালে থেকে যায়। শক্তি যেখানে উপলব্ধির কথা বলে সেখানেই রস, যেখানে আকার পায় সেখানেই সৌন্দর্য, যেখানে গতি পায় সেখানেই ছন্দ।

এই নাম-রূপের জগৎ আমরা দেখছি আলোর সাহায্যে। সূর্যের আলো, চাঁদের আলো, প্রদীপের আলো আমাদের মনে নতুন নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করছে। অন্ধকারে

নাম-রূপের জগৎ মুছে যায়, থাকে কেবল মাত্র কতকগুলি আকার। যে আকারের নাম অনুমান করতে হয়, কিন্তু দেখা যায় না।

ফুল সাজানো ফুলদানির সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে আলোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রঙেরও বিবর্তন ঘটেছে। রাত্রির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ফুল সমেত ফুলদানি স্পর্শের সাহায্যে জানতে গিয়ে এক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই আমরা। জানতে পারি পাপড়ির মসৃণতা, নমনীয়তা, ফুলদানির রুক্ষতা। যদি দিনের আলোয় এই ফুল দেখা না থাকত তাহলে আমাদের মনে ভয়, বিস্ময়, বিরক্তির কারণ ঘটতে পারত।

অপরিচিত স্থানে চলতে গিয়ে অবস্থাটা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। তখন কেবলই সংঘাত কঠিন, কর্কশ, মসৃণ বস্তুর সঙ্গে। সংক্ষেপে, অন্ধকারের বস্তু মাত্রেই বিচিত্র আকার নিয়ে আমাদের সমস্ত শরীরকে সচকিত করে তোলে। মেদ, মাংস জড়িত শরীরের যতগুলি সন্ধি-স্থান আছে সকল সন্ধি-স্থান সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই স্পর্শের দ্বারা সচকিত শরীরের সন্ধি-স্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করি তারই নাম সন্নিকর্ষ-শক্তি। এবং সেই শক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে রেখা।

তাবৎ শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে এই সন্নিকর্ষ-শক্তি যেমন প্রত্যক্ষ করা যায় সাহিত্যে তেমন প্রত্যক্ষ করা যায় না। সে ক্ষেত্রে এই শক্তি অনুভব-গ্রাহ্য। একথা পূর্বেই বলেছি। আলোর শক্তিতে যেটিকে আমরা দেখি স্পর্শের সাহায্যে সেটিকে আমরা অন্যভাবে জানি। এই দেখা ও জানার সংযোগে শিল্প-রূপের সৃষ্টি। কর্ষণের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে শিল্পের ভাষায় দেখা দিয়েছে রেখা। অপর দিকে আলোর উদ্দীপনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে প্রবর্তিত হয়েছে বর্ণ-প্রয়োগ রীতি।

দৃশ্য ও স্পর্শ উভয়ে একত্রে মিলেমিশে রয়েছে। কেবল অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পৃথক হয়ে দেখা দিয়েছে। শিল্পী এই খণ্ডিত অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধি পথে নতুন করে প্রত্যক্ষ করেন। শিল্পী এইভাবে যেটি উপলব্ধি করেন সেটি শুদ্ধ আলো-ছায়ার উদ্দীপনাও নয়, নাম-হীন আকারের অভিজ্ঞতাও নয়। উভয়ত সৃষ্ট এই মানস-প্রতিমা বস্তুর অনুকরণও নয়, বস্তুর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও নয়।

শিল্প-রূপের এই বিশিষ্ট গুণ আছে বলেই সার্থক শিল্প-রূপকে নিছক অনুকরণও বলা চলে না, শুদ্ধ আকারও বলা চলে না। এখানে আর একটি কথার উল্লেখ করতে হয়। রেখা-প্রধান সন্নিকর্ষ-শক্তিসম্পন্ন শিল্প যতটা বাস্তব থেকে আমাদের দূরে নিয়ে

যায় (Abstract) আলোছায়া-মণ্ডিত দৃশ্য-জাত উদ্দীপনার থেকে সৃষ্ট শিল্প-রূপ বাস্তবের সীমা তেমন অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে না। শিল্পের বিমূর্ত গুণ প্রকাশিত হয়েছে ছন্দ ও রেখা-প্রধান ভাষার সাহায্যে। অপর দিকে শিল্পের বহির্মুখী গতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে আলোছায়া নির্মিত ভাষার সাহায্যে।

কথার সাহায্যে বিষয়টি যেভাবে পৃথক করা হল শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটি তেমন স্পষ্টভাবে ধরা না-ও যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক যুগের প্রভাবে অন্তর্মুখী ও বস্তুমুখী গুণের মধ্যে পার্থক্য তীব্র হয়ে উঠেছে। এই পার্থক্যের কার্যকারণ সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা যাবে। বৈজ্ঞানিক যুগের প্রাক্‌কাল পর্যন্ত শিল্পের আধার ও আধেয় সম্বন্ধে যে ধারণা শিল্পী-সমাজ পোষণ করতেন সেই সম্বন্ধেই এই পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে আরও কিছু বলবার আছে।

যে বিষয় নিয়ে ভাবছি বা লিখছি সে বিষয়টিকে আমাদের অতি সুপরিচিত একটি রূপকথার সাহায্যে স্পষ্ট ক'রে তোলবার চেষ্টা করছি। রাজপুত্রের শৈশবে একদিন ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যার কথা মনে পড়ল। তারপর রাজপুত্র সেই রাজকন্যার কথা ভাবতে-ভাবতে বেরিয়ে পড়লেন ঘোড়ায় চড়ে ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যার অনুসন্ধানে। ক্রমে পাহাড় পর্বত অরণ্য ভেদ ক'রে একদিন তিনি হাজির হলেন ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যার কাছে। তারপর সোনার কাঠি, রুপোর কাঠির স্পর্শে রাজকন্যাকে জাগিয়ে তুললেন।

রূপকথার রাজপুত্রের মতোই শিল্পী রসের অনুসন্ধানে যাত্রা করে এবং বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে শেষপর্যন্ত হ্লাদিনীর সন্ধান পায়। যে সৌন্দর্য মনের গভীরে ছিল ঘুমন্ত তাকেই সুখ-দুঃখের স্পর্শে জাগিয়ে তোলে শিল্পী। কেবল পার্থক্য এই যে রাজপুত্র চলেছিল পাহাড় পর্বত অতিক্রম ক'রে, আর শিল্পী চলে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। এই জন্যই শিল্পীর সাধনার সঙ্গে সমাজজীবনের সম্বন্ধ উল্লেখ করা প্রয়োজন।

এই নাম-রূপের জগৎ আমরা দেখছি আলোর সাহায্যে। সূর্যের আলো, চাঁদের আলো, প্রদীপের আলো আমাদের মনে নতুন নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করছে। অন্ধকারে নাম-রূপের জগৎ মুছে যায়, থাকে কেবলমাত্র কতকগুলি আকার—যে-আকারের নাম অনুমান করতে হয় কিন্তু দেখা যায় না। ফুল সাজানো ফুলদানির

সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে আলোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রঙেরও বিবর্তন ঘটেছে। রাত্রির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ফুলসমেত ফুলদানি স্পর্শের সাহায্যে জানতে গিয়ে এক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই আমরা—জানতে পারি পাপড়ির মসৃণতা, নমনীয়তা, ফুলদানির রুক্ষতা। যদি দিনের আলোয় এই ফুল দেখা না থাকত তাহলে আমাদের মনে ভয়-বিস্ময়-বিরক্তির কারণ ঘটতে পারত।

অপরিচিত স্থানে চলতে গিয়ে অবস্থাটা আরো তীব্র হয়ে ওঠে। তখন কেবলই সংঘাত কঠিন, কর্কশ, মসৃণ বস্তুর সঙ্গে। সংক্ষেপে, অন্ধকারে বস্তুমাত্রেই বিচিত্র আকার নিয়ে আমাদের সমস্ত শরীরকে সচকিত ক'রে তোলে, মেদ-মাংস জড়িত শরীরের যতগুলি সন্ধিস্থান আছে সকল সন্ধিস্থান সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই স্পর্শের দ্বারা সচকিত শরীরের সন্ধিস্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে-অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করি তারই নাম কর্ষণ।

তাবৎ এই শিল্পসৃষ্টির মধ্যে এই কর্ষণ-শক্তি যেমন প্রত্যক্ষ করা যায়, সাহিত্যে তেমন প্রত্যক্ষ করা যায় না। সেক্ষেত্রে এই শক্তি অনুভবগ্রাহ্য। আলোর শক্তিতে যেটিকে আমরা দেখি, স্পর্শের সাহায্যে সেটিকে আমরা অন্যভাবে জানি। এই দেখা ও জানার সংযোগে শিল্প রূপের সৃষ্টি। কর্ষণের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে শিল্পের ভাষায় দেখা দিয়েছে রেখা। অপরদিকে আলোর উদ্দীপনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে প্রবর্তিত হয়েছে বর্ণ-প্রয়োগ রীতি।

দৃশ্য ও স্পর্শ উভয়ে একত্রে মিলেমিশে রয়েছে। কেবল অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পৃথক হয়ে দেখা দিয়েছে। শিল্পী এই খণ্ডিত অভিজ্ঞতাকে উপলব্ধির পথে নতুন ক'রে প্রত্যক্ষ করেন। শিল্পী এইভাবে যেটি উপলব্ধি করেন সেটি শুদ্ধ আলোছায়ার উদ্দীপনাও নয়, বস্তুর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও নয়।

শিল্প-রূপের এই বিশিষ্ট গুণ আছে বলেই সার্থক শিল্প-রূপকে নিছক অনুকরণও বলা চলে না, শুদ্ধ আকারও বলা চলে না। এখানে আর একটি কথার উল্লেখ করতে হয়। রেখাপ্রধান কর্ষণ-শক্তিসম্পন্ন শিল্প যতটা বাস্তব থেকে আমাদের দূরে নিয়ে যায় আলোছায়া মণ্ডিত দৃশ্য-জাত উদ্দীপনার সৃষ্ট শিল্প-রূপ বাস্তবের সীমা তেমন অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে না।

পিল্পের বিমূর্ত গুণ প্রকাশিত হয়েছে ছন্দ ও রেখা-প্রধান ভাষার সাহায্যে। অপর দিকে শিল্পের বহির্মুখী গতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে আলোছায়া-নির্মিত ভাষার

সাহায্যে। কথার সাহায্যে বিষয়টি যেভাবে পৃথক করা হল শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটি তেমন স্পষ্টভাবে ধরা না-ও যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক যুগের প্রভাবে অন্তর্মুখী ও বস্তুমুখীর মধ্যে পার্থক্য তীব্র হয়ে উঠেছে। এই পার্থক্যের কার্যকারন সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা যাবে।

এই আলোচনা শুরু করেছিলাম শিল্পের ভাষাকে কেন্দ্র ক'রে। কারণ আমার কথা ভেবেও ভাবি নি। এইবার শিল্পীজীবনের আবশ্যিক আরো কতকগুলি উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে সমাজের সঙ্গে শিল্পীর সম্বন্ধ এবং বিরোধ উভয় দিক দিয়ে আলোচনা করব।

অনেক মাল-মশলা একত্র ক'রে কারিগর বাড়ি তৈরি করে। সকল কারিগর মাল-মশলার সদ্ব্যবহার করতে পারে না, বা জানে না। শিল্পীও একরকমের কারিগর তথা নির্মাতা। শিল্পী কত দিক দিয়ে কতভাবে প্রয়োজনীয় উপকরণ উপাদান সংগ্রহ করে সেই আলোচনাই এ-পর্যন্ত করা হয়েছে। এইবার আর একটি বিষয় উল্লেখ করতে হবে। বিষয়টি হল কল্পনা।

মানুষ মাত্রেই অল্পবিস্তর কল্পনাপ্রবণ। কথায় বলে চাটাইয়ে শুয়ে রাজা হবার কল্পনা। এই জাতীয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক আকাশকুসুম কল্পনা দিয়ে শিল্পীর কাজ চলে না। শিল্পীর কল্পনা কিছু ভিন্ন রকমের। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিল্পীর কল্পনা আত্মপ্রকাশ করে। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সাহায্যে এক সুনির্দিষ্ট আকারনিষ্ঠ অস্তিত্বকেই যথার্থভাবে শিল্পীর কল্পনা বলতে হয়।

প্রত্যেক সার্থক শিল্প-রূপই নিজেকে অল্পবিস্তর কল্পনার সাহায্যে প্রকাশ করে। শিল্প যে সত্যের প্রতীতি জন্মায় তার অন্যতম কারণ শিল্পের কল্পনাশক্তি এবং এই কল্পনাশক্তির মূলে আছে শিল্পীর প্রতিভা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। কারণ বিরাট কল্পনা প্রতিভারই অন্যতম লক্ষণ।

ভারতীয় মতে 'নব-নবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা'রই অপর নাম প্রতিভা। এই শক্তি আছে বলেই প্রতিভাবান শিল্পী জানেন যে গড়তে গেলে ভাঙতে হয়। তাই

আমরা দেখি প্রত্যেক প্রতিভাবান শিল্পী পরম্পরাকে ভেঙে কল্পনার সাহায্যে অভাবনীয় নতুন সৃষ্টি ক'রে থাকে। তার জন্য যুক্তিতর্ক-আশ্রিত বিদ্যা অপেক্ষা প্রজ্ঞার প্রয়োজন কেন? তারও জবাব এখানে দেওয়া যেতে পারে।

আমাদের মন নানা সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন। অধিকাংশ ব্যক্তিগত কল্পনাই এই দুর্ভেদ্য সংস্কারের দ্বারা প্রতিহত, ব্যর্থ হয়। প্রজ্ঞা এমন একটি শক্তি যার সাহায্যে এই দুর্ভেদ্য সংস্কারের যবনিকা ভেদ করা যায় এবং অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ের সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিকোণ খুলে যায়। শিল্প-জনোচিত প্রজ্ঞা এক-এক মুহূর্তে অনুরূপ অবস্থায় উত্তীর্ণ হতে পারে এবং হয়েও থাকে। তারই অপর নাম প্রেরণা।

পৃথিবীর নানা স্থানে নানা কালে সাধকদের জীবনের সঙ্গে এমন অনেক অভিজ্ঞতা যুক্ত আছে যেগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায় নি। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি বলেই যে সেইসব ব্যাখ্যাকে বৈজ্ঞানিকরা সম্পূর্ণ বাতিল ক'রে দিয়েছেন তা নয়। Mystic experience আখ্যা দিয়ে এদের স্বতন্ত্র ক'রে রাখা হয়েছে। শিল্পীর জীবনেও এমন কতকগুলি অভিজ্ঞতা আছে যা প্রায় Mystic-এরই পর্যায়ভুক্ত। এই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির সঙ্গে শিল্প-রূপের যোগ হয়ে থাকে বলেই যুক্তির পথে এইসব বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। সমকালীন শিল্পীদের উক্তি থেকে অনুরূপ Mystic অভিজ্ঞতার সমর্থনও পাওয়া যাবে।

ইতিপূর্বে ধ্যান ধারণা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে। সেই আলোচনার সূত্র ধরেই বলতে পারা যায়, এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও ধ্যান-ধারণারই একদিকের পরিণতি।

মানুষের জীবনে দুটি ভিন্নমুখী গতি লক্ষ করা যায়। বহির্মুখী (Objective) গতির সাহায্যে মানুষের সামাজিক জীবন গড়ে ওঠে। অন্তর্মুখী (Subjective) গতির সাহায্যে ও অভিনব চেতনার সাহায্যে সে আর একভাবে নিজেকে চেনে ও জানে।

রূপকথার রাজপুত্র যেমন ঘুমন্তপুরীর রাজকন্যার কল্পনা নিয়ে জন্মেছিল তেমনি শিল্পী, সাহিত্যিক, সংগীতকার সকলেই বিশিষ্ট চেতনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। বাইরে থেকে কোনো শিক্ষার দ্বারা এই চেতনাকে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায় না। অবশ্য উপযুক্ত পরিবেশে এই চেতনার পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটে। সমকালীন

শিক্ষাব্রতীরা স্বীকার করেছেন যে 'শিখিয়ে-পড়িয়ে' আর্টিস্ট করা সম্ভব নয়। এক-একজন আর্টিস্ট হয়েই জন্মায়, তারপর সমাজজীবন থেকে সে আহরণ করে প্রয়োজনীয় উপাদান।

সমাজ নানা স্তরে বিভক্ত কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়। সমাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি নানা নীতি-শাস্ত্রের সাহায্যে সমাজজীবনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। শিল্পীর সর্বপ্রধান প্রয়োজন সমাজের ভাবময় চেতনাকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করা। অন্যদিকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ব্যবস্থার সঙ্গে তাল রেখে ভাষার বৈশিষ্ট্যকে গড়ে তোলা।

'ভাব কথাটির তাৎপর্য সকলের কাছে সমান তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এই মুহূর্তে শিল্পের ক্ষেত্রে এই শব্দটির মূল্য সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ জেগেছে। তৎসত্ত্বেও এই শব্দটির তাৎপর্য শিল্পীর জীবনের উপলব্ধির বিষয় বলেই মনে করি।

মাটির সঙ্গে গাছ যুক্ত থেকে আকাশের দিকে বেড়ে চলে আলোর সন্ধানে। ঠিক এইভাবে প্রত্যেক মানুষ সামাজিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত থেকেও মহত্তর আদর্শের দিকে এগিয়ে চলার চেষ্টা করে। তবে প্রাণশক্তি যার যেমন তেমনি তার পরিণতি ঘটে। জীবনের মূল্যবোধ বিচার করতে হলে সামাজিক আইনকানুন অপেক্ষা আদর্শের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। আনন্দ, সৌন্দর্য এগুলি মানবজীবনকে পূর্ণতা দিয়ে থাকে এই জন্যই সমাজজীবনের উর্ধ্বে তাকে যেতে হয়, অনুভব করতে হয়। অবশ্য শিল্পী মাত্রেরই যে এই উপলব্ধি ঘটে থাকে এমন নাও হতে পারে।

শিল্পী নিজের আদর্শ যখন অনুসরণ করে তখন সে একক। অপরদিকে সে প্রয়োজনের দাবিতে যখন সমাজের সঙ্গে এক হয়ে চলে তখন সে একটি বিরাট যন্ত্রের অংশ মাত্র। শিল্পী যখন সমাজের সঙ্গে যুক্ত তখন তার প্রয়োজন বিচার-বুদ্ধির। যে শিল্পীর মন বুদ্ধিবিচারে পুষ্ট হবার সুযোগ পেয়েছে সে শিল্পী ভাবের জগৎকে একভাবে দেখে। অপরদিকে যে-শিল্পীর বিচার-বুদ্ধি তেমন পরিণত নয় তার পক্ষে ভাবের জগৎ নিতান্ত ব্যক্তিগত রুচি-মেজাজের মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

সৌন্দর্যতত্ত্বে 'শাশ্বত' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক যুগে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে উপরোক্ত কথাটির মূল্য নেই বললেও চলে। তবু কথাটির তাৎপর্য একবার তলিয়ে দেখা দরকার।

এই আলোচনার প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে শিল্পসৃষ্টি হৃদয়-গ্রাহ্য ভাব, সৌন্দর্য, আবেগ এগুলিকে বাদ দিয়ে এক রকমের নির্মাণ হতে পারে, কিন্তু সৃষ্টির জগতে তার

প্রবেশ নিষেধ। গথিক ক্যাথিড্রাল এবং লৌহ-নির্মিত আধুনিক সেতুর মধ্যে বড় রকমের কোনো পার্থক্য আছে কি না, এ সম্বন্ধে কিছু-কিছু আলোচনা বইয়ে পড়েছি। যাঁরা মনে করেন উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই তাঁদের সঙ্গে আমি একমত হতে পারি নি। কারণ সেতু ও Gothic cathedral-এর মধ্যে আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য যথেষ্ট। সেতু নির্মিত হয় প্রয়োজনের দাবিতে, cathedral নির্মিত হয়েছে আদর্শের দাবিতে। নিছক নির্মাণ এবং সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য এখানে। যদি এই পার্থক্য উড়িয়ে দেওয়া যায় তবে শিল্পসংস্কৃতির বিকাশ ও বিবর্তন ঘটত না।

মানুষ ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে। এই চলার গতি সমাজে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত নয়। ভাব-ভাবনা, চিন্তার সাহায্যে ব্যক্তিগত মন সমাজ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে একটি নতুন সত্তার অস্তিত্ব অনুসন্ধান ক'রে চলেছে। এই গতি কোনো সময়েই প্রকৃতি-জাত উদ্দীপনা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। ব্যক্তি-মনের এই শক্তি সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এইসব ব্যক্তিগত প্রতিভার অবদান কোনো লৌকিক কারণে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না।

আকাশে ধূমকেতু আমরা রোজ দেখি না। তবু ধূমকেতুর কোনো অস্তিত্ব নেই একথাও কেউ বলতে পারে না। এই ধূমকেতুর মতোই জীবনের মহত্তম আদর্শ বারে বারে ঘুরে আসে এবং এক দল মানুষকে নতুন ক'রে সচেতন ক'রে তোলে।

এই যে অদৃশ্য ভাব-ভাবনার জগৎ সেটিকে কোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে ধরা যায় নি। এটি ধরা পড়ে মানুষের জীবনে। তাই এর অপর নাম উপলব্ধি। উপলব্ধি ছাড়া শিল্পের সার্থক তথা শাশ্বত সৃষ্টি সম্ভব নয়। উপলব্ধির জগতে এই যে আদর্শের পরিক্রম একেই আমি শাশ্বত বলে মনে করি। এই বিশেষ উপলব্ধি ধ্যান-ধারণার পথেই আত্মপ্রকাশ করে। এই কারণেই শিল্পের ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমাকে ধ্যান-ধারণার কথা উল্লেখ করতে হয়েছে। সোজা কথায় স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান ছাড়া সার্থক সৌন্দর্যসৃষ্টি সম্ভব নয়।

দেখা যাচ্ছে যে শিল্প-সৃষ্টির মোটামুটি তিনটি পথ :

১. সমাজের ব্যাপক তাৎপর্য সম্বন্ধে চেতনা।

২. সমকালীন অবস্থা-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত শিল্পের আঙ্গিক।

৩. ধ্যান-ধারণার পথে স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের সাহায্যে শিল্পসৃষ্টি।

এই তিনটি আদর্শ একে অন্যের পরিপূরক বললে ভুল হবে না। তবে একথা ঠিক

যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির আলো সামান্যমাত্র প্রতিফলিত হয় নি এমন যে শিল্পকর্ম সেটিকে রস-সৌন্দর্যের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না।

এ-পর্যন্ত যে-আলোচনা করা হয়েছে তার থেকে শিল্পী-জীবনকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা চলে :

ক. আঙ্গিক ও উপকরণের ব্যবহার তথা ভাষাজ্ঞান।

খ. আঙ্গিক ও উপকরণগুলি ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

ইট, কাঠ, পাথর এগুলি যেখানে পাওয়া যাবে না সেখানে ঐসব উপাদান দিয়ে কোনো বস্তু নির্মাণ করা সম্ভব নয়। অন্তত সহজসাধ্য নয়। কাগজ তৈরি হয়েছিল, তবেই কাগজের ওপর ছবি তৈরি শুরু হয়েছিল। এগুলিকেই বলতে পারি ভৌগোলিক পরিবেশের অবদান। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবও যথেষ্ট লক্ষ করা যায়।

ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথাও বলে নেওয়া দরকার। কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশ বাদ দিয়ে সমাজের প্রভাব আলোচনা করা সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা আকাশ, মাটি, উদ্ভিদ, জীবজন্তু ইত্যাদির সঙ্গে সকল সময় শিল্পের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই পরিবেশ থেকেই শিল্পের আদর্শ বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজ যেমন এক জায়গায় স্থির নেই, ক্রমে বিবর্তনের পথে সমাজজীবনের যেমন পরিবর্তন ঘটে, তেমনি প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের চেতনা বদলেছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠ ছিল আজ হয়ত ততটা নেই। তার কারন বিজ্ঞানের অগ্রগতির পূর্ব পর্যন্ত মানুষ প্রকৃতি থেকেই নানা রকমের শক্তি অর্জন করেছে। মহাভারতে আকাশ, বাতাস, জল এগুলিকে লক্ষ্মীর স্থায়ী বাসস্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃতির শক্তির সাহায্যেই মানুষ যেমন বস্তু নির্মাণ করেছে তেমনি প্রকৃতির বৃহৎ পটভূমির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম ক'রে সৃষ্টি করেছে মানুষ শিল্প ও সাহিত্য। জীবনের বিশাল পটভূমিরূপে প্রকৃতিকে যেভাবে মানুষ যুগে যুগে দেখেছিল আজ ঠিক সেইভাবে দেখছে। কারণ প্রকৃতির রহস্য অনেক পরিমাণে বিজ্ঞানের আলোয় উজ্জ্বল। তৎসত্ত্বেও সাহিত্যে শিল্পে আজও প্রকৃতির মহান রূপ আমরা উপলব্ধি করি। সমাজজীবন জটিল ও নানা সংঘাতের মধ্যে চলেছে। প্রকৃতির সান্নিধ্যে এই জটিল ও সংঘাতপূর্ণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা মুক্তি পাই। এইজন্য একান্তভাবে সমাজকে নিয়ে শিল্পসৃষ্টিতে প্রাকৃতিক প্রভাব অপরিহার্য।

ভাষার উৎপত্তি হয়েছে একের মনের ভাব অন্যের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। এইজন্য সৃষ্টি একান্ত হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ইচ্ছা প্রত্যেক শিল্পীর মনে থাকে। অন্যে পড়ুক, অন্যে দেখুক এই ইচ্ছা নিয়েই শিল্পী সমাজের সামনে উপস্থিত হন। এইভাবে স্রষ্টা ও দর্শকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং দেখা দেয় বিভিন্ন রকমের মতামত।

সমাজের দ্বারা শিল্পী কীরূপে প্রভাবান্বিত হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা আমি পূর্বেই করেছি। সমাজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য উভয় প্রভাবই শিল্পের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। তবে কালে কালে এই প্রভাবের ভিন্নতা ঘটে। সমাজাশ্রিত মানুষের জীবন ধারণের জন্য আইন-শৃঙ্খলার দরকার। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্যই নীতি-দুর্নীতির শাস্ত্র তৈরি হয়েছে। এই নীতি-দুর্নীতির সাময়িক আদর্শ শিল্পীরা সকল সময় অনুসরণ করে চলেন নি। অপরদিকে দৈনন্দিন ঘটনাকে প্রধান ক'রে শিল্পসাহিত্য রচিত হয় নি। সংক্ষেপে, শিল্পীরা সমাজে অনেক সময়েই প্রতিদিনের ঘটনার পরিবর্তে কোনো এক স্থায়ী আদর্শকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছে। যে আদর্শ শিল্পকে কালে কালে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং শিল্পীরা যে-আদর্শকে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী করার চেষ্টা করেছেন, সেগুলি তাঁরা পেলেন কোথায়?

শিল্পী বৈজ্ঞানিকের মতো সমাজকে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে দেখেন নি। সকল সময় এই ইচ্ছা তেমন শক্তিশালী হয় না। পরিবর্তে শিল্পী সমাজের অন্তরের ভাব-ভাবনাকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন নিজের সহজাত হৃদয়বৃত্তি ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সাহায্যে। এই জন্যই শিল্পীকে হতে হয় হৃদয়বান। মানুষ হিসাবে শিল্পীর ব্যবহারিক জীবন এবং স্রষ্টা রূপে তাঁর শিল্পী-জীবনে অনেক দ্বন্দ্বও দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বই অনেক সময়ে শিল্পীকে নতুন উপলব্ধির পথে চালিত করতে সক্ষম। নানা প্রকার দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও শিল্পচেতনা যেখানে শক্তিশালী সেখানেই শিল্পী নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম হন। এই অবস্থায় শিল্পসৃষ্টির মধ্যে সামাজিক সংস্কার অপেক্ষা সমাজের আদর্শই শিল্পী প্রকাশ ক'রে থাকে। এটি হল শিল্পীর নিজস্ব অবদান। তীব্র আবেগের পথেই জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রাণশক্তির প্রাচুর্য শিল্পী যেভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম সেটি হল সমাজ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের অভিনব ইতিহাস। সে ইতিহাস সামাজিক ঘটনার তথ্যপূর্ণ ইতিহাসে নাও পাওয়া যেতে পারে।

উপরের আলোচনা যদি সম্পূর্ণ যুক্তির পথে চালিত হয়ে থাকে তাহলে সিদ্ধান্ত করা চলে যে ব্যক্তি বিশেষের বিশেষরকমের প্রতিভার উপরই শিল্পসৃষ্টির বিকাশ সম্ভব

হয়। সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থা উদ্দেশ্য-আদর্শ শিল্পের আনুষঙ্গিক উপাদান ও বিষয়-বৈচিত্র্যের কারণ। সামাজিক নিয়মের দ্বারা শিল্পী যেখানে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে শিল্পী নিজেকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে না বলেই শিল্প-রূপ সংকীর্ণ হয়ে ওঠে। সমাজের দায়িত্ব শিল্পীর মনের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা। কারণ সামাজিক শৃঙ্খল অপেক্ষা মনের শৃঙ্খল শিল্পকলা এবং সকল রকমের সংস্কৃতির বিকাশের পক্ষে বিপজ্জনক। হিটলারের যুগে জার্মান শিল্পীদের অন্নবস্ত্রের অভাব ঘটে নি। তৎসত্ত্বেও শিল্পের চরম দুর্গতি ঘটেছিল। কারণ শিল্পীদের মনের স্বাধীনতা নষ্ট হয়েছিল আইন-শৃঙ্খলার নামে। মুসোলিনী-যুগে ইটালির বিখ্যাত পণ্ডিত আচার্য তুচ্চি বিশ্বভারতীতে এসেছিলেন নিমন্ত্রিত অধ্যাপকরূপে। অকস্মাৎ আদেশ এল পত্রপাঠ তাঁকে ইটালি ফিরে যেতে হবে। কারণ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ফ্যাসিজ্‌ম-বিরোধী! মুসোলিনী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত হল। অপরদিকে যেখানে শিল্পী সমাজজীবন থেকে মানবীয় চেতনা আহরণ করতে সক্ষম হন না সে অবস্থায় শিল্পসৃষ্টি বন্ধ হয় না, কিন্তু শিল্প হয় সেখানে ব্যসনের বস্তু, শিল্পীরা হন সে-সমাজে আমোদিয়া (Entertainer)।

অন্নবস্ত্র আশ্রয়ের জন্য মানুষকে কোনো না কোনো রকমের কর্ম করতে হয়। তবে সমস্ত শক্তি যদি অন্নবস্ত্রের জন্য ব্যয় করতে হয় তবে কোনো মহৎ আদর্শ অনুসরণ করা চলে না। এজন্য দরকার অবসর—যে-অবসরের মধ্যে শিল্পী, সাহিত্যিক দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সকলেই জীবনব্যাপী কঠোর পরিশ্রম করেন নিজ নিজ আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য। সমাজ এই অবসরের ব্যবস্থা না করলে শিল্পীর পক্ষে শিল্পসৃষ্টি কঠিন হয়ে ওঠে।

অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে শিল্পীর অবদান কীভাবে আত্মপ্রকাশ করে সে-বিষয়ে আলোচনা করা গেল। সহজেই লক্ষ্য করতে পারা যাচ্ছে শিল্পী নিজেকে সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে না এবং সমাজের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলাও সৃষ্টি-রত শিল্পীর পক্ষে বিপজ্জনক। কারণ শিল্পীকে অনুসন্ধান করতে হয় সমাজের প্রাণস্পন্দন। নিজের হৃদয় দিয়ে সমাজের হৃদয় স্পর্শ করা এবং সমাজের হৃদয় দিয়ে নিজের হৃদয়কে বিস্তৃত করাই শিল্পীর একমাত্র দায়িত্ব। সমাজ যদি শিল্পীকে তার নিজস্ব স্থান থেকে বিচ্যুত করতে চায় তখন দেখা দেয় শিল্পীসমাজে বিদ্রোহ।

সমাজের সঙ্গে শিল্পীর যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধে আলোচনা এখানে শেষ ক'রে এবার দেখা যাক দর্শকের সঙ্গে শিল্পের সম্বন্ধ কী রকম।

প্রথমেই বলা দরকার যে সৃষ্টি-রত শিল্পী যেভাবে নিজের সৃষ্টি দেখেন বা বিচার করেন দর্শক কখনোই হুবহু সেই জিনিসটি দেখতে পারেন না। আবার সহৃদয় রসিক দর্শক এবং জিজ্ঞাসু বিচারনিষ্ঠ দর্শকের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য যথেষ্ট। কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যে সামাজিক ও মানসিক নানা উপাদানের সংযোগে শিল্পী একটি অখণ্ড রূপ নির্মাণ করেন।

দর্শক প্রথমেই দেখবেন শিল্পের বহিরঙ্গ তথা আঙ্গিক ও করণ-কৌশল। রসিক জানেন শিল্পের বহিরঙ্গের অস্তিত্ব নির্ভর করছে অন্তরের রস-সৌন্দর্য, ছন্দ ও সন্নিকর্ষ-শক্তির উপর। কাজেই রসিক দর্শক শিল্পের বহিরঙ্গকে শিল্প-রূপের অন্তরে প্রবেশের পথ রূপেই গ্রহণ ক'রে থাকেন। সৃষ্টি ক্ষমতা না থাকলেও রসিক শিল্প-রূপের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম ক'রে দেখতে ও অনুভব করতে সক্ষম। অর্থাৎ সহৃদয় রসিক দর্শক শিল্পের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য বিচার করতে সক্ষম এবং রস-সৌন্দর্য উপলব্ধি করার মতো চেতনা তার মধ্যে থাকে।

বিচারের পথে শিল্পের ভাষাকে বিশ্লেষণ ক'রে ভাবের পথে যারা শিল্পের অন্তরে প্রবেশ করতে পারেন তাঁরাই হলেন সত্যিকারের রসিক এবং যখন এই রসিক দর্শক নিজস্ব ভাষার সাহায্যে এই উপলব্ধিকে প্রকাশ করেন তখন আমরা তাঁকে বলি সমালোচক। অপরদিকে যেসব দর্শক বিচার-বিশ্লেষণের শাণিত অস্ত্রের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন ক'রে বিভিন্ন উপাদানগুলিকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখেন তাঁরা হলেন ঐতিহাসিক। তাঁরা বলে দিতে পারেন একজন শিল্পীর রচনাতে কতটা সামাজিক উপাদান, কী প্রকার ভৌগোলিক পরিবেশ, শিল্পীর আর্থিক অবস্থা-ব্যবস্থা, শিল্পীর উপর বহির্জগতের প্রভাব ইত্যাদি।

এইভাবে সমাজের নানা স্তরের দর্শক নানাভাবে শিল্পের বিচার করেন। কাজেই কোনো শিল্প-রূপ যে সমাজের সকল ব্যক্তিকে সমানভাবে আকৃষ্ট করবে এমন সম্ভব নয়। ক্রমে শিল্প-রূপের সঙ্গে যুক্ত নানা রসিক ও ঐতিহাসিকের মতামতের দ্বারা একটি সংস্কার গড়ে ওঠে। সেই সংস্কারই বহু ক্ষেত্রে শিল্প-বিচারের অবলম্বন হয়ে ভাবীকালকে প্রভাবান্বিত করে।

জীবনের পরম সার্থকতার সঙ্গে শিল্পের সম্বন্ধ বিচার করাই দার্শনিকের কাজ। মানুষের জীবনের সঙ্গে শিল্পের কি সম্বন্ধ? কেন একদল মানুষ জীবনপণ ক'রে শিল্প-কর্ম ক'রে চলে? শিল্পের সঙ্গে মানুষের সুখ-দুঃখ-আনন্দেরই বা কী সম্বন্ধ? শিল্পের দ্বারা সমাজ উপকৃত হয় কিনা—এইগুলি হল দার্শনিকের অনুসন্ধানের বিষয়।

এই অনুসন্ধানের পরিণামে রচিত হয়েছে দেশে-দেশে কালে-কালে সৌন্দর্য-শাস্ত্র। সৌন্দর্য-শাস্ত্রের সাহায্যে যেসব তত্ত্ব তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার প্রয়োজন আছে। কারণ এই আলোচনার সাহায্যে আমরা বুঝতে পারব শিল্পী তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সাহায্যে এমন অনেক বিষয়ে সচেতন থাকেন যেসব বিষয়ে দার্শনিকরা জ্ঞানের পথে অনুসন্ধান করেছেন।

সমাজ মানুষের সৃষ্টি। মানুষ প্রকৃতির সৃষ্টি। অথচ মানুষ প্রকৃতির আইনের সম্পূর্ণ বশীভূত নয়। প্রকৃতির আইনকে লঙ্ঘন করার আকাঙ্ক্ষাই প্রগতির অন্যতম কারণ। শিল্পীর রচনার গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ভাঙা-গড়ার ইচ্ছা থেকে। শিল্পীর ব্যক্তিমনের ইচ্ছা যেমনই হোক সমাজের দায়িত্ব থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্তি পেতে সক্ষম হয় নি। ধর্ম, রাজা, বণিক এবং রাষ্ট্র কোনো না কোনোভাবে শিল্প-ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেছে। অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য শিল্পীকে এই বোঝা বইতে হয়েছে।

সমাজের দাবিপূরণ করেও সার্থক শিল্পসৃষ্টি হয়েছে। আবার দাবিপূরণের তাগিদে শিল্পের পরম্পরা আবর্তে পরিণত হয়েছে। এখন দেখতে হবে কোন শ্রেণীর কোন জাতীয় দাবি শিল্পকে জীবন্ত রাখে এবং কোন শ্রেণীর দাবিতে শিল্পের অবনতি ঘটে।

নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সমাজে আইন-শৃঙ্খলার প্রয়োজন। যেখানে আইন-শৃঙ্খলা মানুষকে একা হতে দেয় না সে-সমাজে সংস্কৃতির বিকাশ দুরূহ। কারণ আমরা জানি যে সুকল্পিত আইন-শৃঙ্খলা যেমন সমাজকে শক্তিশালী করে তেমনি ব্যক্তিগত প্রতিভার অবদানের সাহায্যে সমাজ আর এক রকমের শক্তি অর্জন করে। তাই সভ্যতার অগ্রদূতরূপে আমরা সাক্ষাৎ পাই মুষ্টিমেয় ব্যক্তি যাদের প্রতিভাবলে মানুষ গড়ে তুলেছে আজকের দিনের সমাজ ও সংস্কৃতি। শিল্পের অবদানও এদিক দিয়ে স্বল্প নয়। আদর্শবাদী সমাজ থেকে এবার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক।

শিল্প-রূপকে কেন্দ্র ক'রে সমালোচনা, সাহিত্য, ইতিহাস ও সৌন্দর্যদর্শনের মধ্য

দিয়ে যে মতামত গড়ে ওঠে সেইসব মতামতের আশ্রয়ে ক্রমে একটি জনমত আত্মপ্রকাশ করে। জনমতের শক্তি অসাধারণ। কারণ এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু না কিছু বক্তব্য থেকে যায়। এই বক্তব্যের অন্তরালে থাকে অমার্জিত বা অপরিণত রুচি-বোধ। প্রত্যেকের প্রয়োজনের দাবি পূরণ করতেই আমাদের দিন কাটে। তৎসত্ত্বেও শখ-শৌখিনতার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অল্পবিস্তর আছে। কারো পাখি পোষার শখ, কারো একা বসে গান করার শখ—শ্রোতার কাছে পীড়াদায়ক হলেও সে নিজে উপভোগ করে—কারো পড়ার শখ, কারো বা ফুল-বাগানের শখ। এ রকম নিত্য প্রয়োজনে লাগে না এমন শখ মূর্খ পণ্ডিত সকলের মধ্যেই লক্ষ করা যাবে। এইসব শখ-শৌখিনতার মধ্য দিয়ে মানুষ একরকমের সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পায়। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে যে জগৎ শিল্পী বা সাহিত্যিক সৃষ্টি ক'রে থাকেন সেটির আবেদন শৌখিন ব্যক্তির কাছে পৌঁছায় না। তাই শিল্পে বা সাহিত্যে স্বভাবানুগত (Naturalistic) গুণ সাধারণের কাছে পৌঁছায় সহজে।

অপরদিকে বিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্ন আর একদল আছেন যাঁরা তথ্যের সাহায্যে শিল্প-রূপকে বিচার করতে চান। এইসব ব্যক্তিদের মতামত সাময়িক শিল্প-আদর্শকে অনেক পরিমাণে প্রভাবান্বিত ক'রে থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজের সামনে বাস্তবতার আদর্শই ছিল সর্বপ্রধান। এই শ্রেণীর শিক্ষিত সমাজ আজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবান্বিত ও শিল্পকেও তাঁরা যন্ত্রের মতো গ্রহণ বা বর্জন করেন। এক সময় ইয়োরোপের শিক্ষিত সমাজ ভারতীয় শিল্পকে বর্বরতার লক্ষণযুক্ত বলে মনে করতেন। আজ সেই সমাজই নিগ্রো এবং অন্যান্য আদিম শিল্পের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন।

সমাজের নানা স্তর থেকে নানা মত মিলে-মিশে অতি শক্তিশালী সর্বগ্রাসী এই জনমতের উপরই শিল্পীর খ্যাতি-অখ্যাতি বহু পরিমাণে নির্ভর করে। এই জন্যই জনমতের প্রভাব শিল্পীর জীবনে অনেক সময় বিপদ ডেকে আনে। জনমতের প্রভাবেই শিল্পীদের বিপদ ঘটলেও জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করাও সকল সময় সম্ভব হয় না, কারণ শিল্পীমাত্রেই সমাজের কাছে নিজের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে চান। অনেক মহৎ শিল্পী জীবদ্দশায় জনপ্রিয় হন নি। আবার অনেকে জীবদ্দশায় অভূতপূর্ব যশ লাভ করেছেন। কিন্তু সে যশ স্থায়ী হয় নি। তাই দেখা যায় যেসব শিল্পী নিজের আদর্শকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করতে পেরেছেন তাঁরা কালক্রমে জনপ্রিয় হয়েছেন। অপরদিকে যাঁরা সাময়িক রুচি-মেজাজকে অনুসরণ করেছেন তাঁদের খ্যাতি স্থায়ী

হয় নি। এই জন্যই জনমতের আলোড়নের মধ্য দিয়ে এক এক শিল্পীর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান ঘটেছে এবং আজও ঘটছে। শিল্প-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নানা রকমের মতামতের সৃষ্টি হচ্ছে। এই মতামতের দ্বারা শিল্পীর জীবন কতটা প্রভাবান্বিত সেটা অনুসন্ধানের বিষয়।

সৃষ্টিকর্ম হয়ে থাকে একান্তের, অপরদিকে সৃষ্ট বস্তু হয়ে থাকে সমাজের সম্পত্তি। এ প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উল্লেখ করা যেতে পারে।

বেনারসে একজন সাধুকে দেখেছি যিনি প্রতিদিন একটি ক'রে হনুমানজীর প্রতিকৃতি আঁকতেন। কাগজের অভাব হলে আয়নার কাঁচের উপর হনুমানের চিত্র রচনা করতেন। শুনলাম গুরুর আদেশেই তিনি এই কাজ ক'রে থাকেন। এই চিত্রাঙ্কন তাঁর সাধনভজনের অন্যতম অঙ্গ। হনুমানজীর এই ছবিতে ছিল ভাবভঙ্গির যেমন বৈচিত্র্য তেমনি ছিল আঙ্গিকের নানারকম উদ্‌ভাবন-চেষ্টা। এইভাবে হনুমানজীর প্রতিকৃতি আঁকার কি সার্থকতা জানতে চাইলে তিনি বলেন তাঁর গুরু বলেছেন হনুমানজীর ধ্যান ও প্রতিকৃতি আঁকতে আঁকতে তিনি একদিন হনুমানজীর সাক্ষাৎ পাবেন। (বৈষ্ণব ধর্মমতে হনুমান 'দাস্য' ভাবের প্রতীক)। আমার ধারণা প্রত্যেক সার্থক শিল্পী নিজ নিজ হৃদয়ের ভাবকে প্রত্যক্ষ করবার জন্যই শিল্পসৃষ্টি ক'রে থাকেন। সমাজের দাবি শিল্পীর হৃদয়ের স্থায়ী ভাবকে যে পর্যন্ত আঘাত না করে সে পর্যন্ত শিল্পীর কর্ম-জীবন ও তাঁর শিল্পী-জীবনের মধ্যে সংঘাত ঘটে না।

বিষয়টি আর একটু স্পষ্ট ক'রে তোলা দরকার। কারণ একথা মনে হতে পারে যে আমি হয়ত শিল্পী-মনের গভীরে কোনো দেবদেবীর অস্তিত্ব আছে বলে ইঙ্গিত করছি। শিল্পী-মনের গভীরে যে একটি স্থায়ী ভাব থাকে সেটি একটি বিশেষ রকমের শক্তি। এই শক্তির অপর নাম ছন্দের চেতনা—যে-শক্তির সাহায্যে শিল্পী তার সমস্ত বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ছন্দোবদ্ধ ক'রে প্রকাশ ক'রে থাকে। বিক্ষিপ্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা মুহূর্তে মুহূর্তে কর্ম-শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং ছন্দে তা প্রকাশ পাচ্ছে। এই শক্তি শিল্পীর ব্যক্তিত্বের বনিয়াদ!

শিল্পীর ব্যক্তিত্ব নিয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা অনেক অনুসন্ধান করেছেন। এই অনুসন্ধানের দ্বারা মনোবিজ্ঞানীরা কোনো একটা চরম সিদ্ধান্তে পৌছেছেন বলে মনে হয় না। অচেতন (Unconscious), অবচেতন (Sub-conscious) বা অর্ধচেতন ও চেতন (Conscious) মনের এই তিন স্তরের মধ্যে অচেতনেরই সঙ্গে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও তার সৃজনীশক্তির কোনো একটা সম্বন্ধ আছে একথা অনেকেই বিশ্বাস করেন।

তবে যথাযথ সম্বন্ধ এখন অনুমানের বিষয়। তাছাড়া সৃষ্টি-রত শিল্পীর কাছে এইসব সমস্যার বিশেষ কোনো মূল্য আছে বলে মনেহয় না। শিল্পী কেবলমাত্র নিজের সৃষ্টি-শক্তি সম্বন্ধে সচেতন থাকে। তার বেশিকিছু অনুসন্ধান করা তার প্রয়োজনও হয় না। এই কারণে আমিও এ-বিষয়টি নিয়ে বেশিদূর অগ্রসর হতে চাই না।

যে বিশেষ কতকগুলি গুণ প্রত্যেক নির্মিত শিল্প-রূপের সঙ্গে যুক্ত থাকে সেগুলি এ পর্যন্ত অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি। সৃষ্টি-রত শিল্পীকে প্রাচীন বা নবীন যে কোনো বিষয়ে অল্পবিস্তর সচেতন থাকতে হয়। শিল্পের ভাষার আশ্রয় ছাড়া বিভিন্ন উপাদানকে একত্র ক'রে ছন্দ সৃষ্টি সম্ভব নয়।

ভাষা-বর্জিত ভাব বা ভাব-বর্জিত ভাষা দুইয়ের কোনোটারই সার্থকতা নেই। তটভূমি-বর্জিত নদী এবং জলপ্রবাহ-বর্জিত তটভূমি দুইয়ের কোনোটারই মূল্য নেই। বিমূর্ত ভাব ভাষার সাহায্যে রূপ-সৌন্দর্যে প্রতিমা-রূপ ধারণ করে। এইটুকুই হল শিল্পীর জানবার কথা। তারপর শুরু হয় দর্শকের বিচার-বিশ্লেষণ। এবং সেই বিচার-বিশ্লেষণ কীভাবে হয় সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই বলেছি।

সূর্যাস্ত দেখে আমরা মুগ্ধ হই—বলি, কি সুন্দর! আবার সূর্যাস্তের ছবি দেখেও একইভাবে বলে থাকি, কি সুন্দর ছবি! এখন দার্শনিক শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করবেন তোমার আঁকা ছবি আর প্রকৃতির ঐ শোভার মধ্যে পার্থক্য কী? শিল্পী কখনোই বলবেন না যে সূর্যাস্তের অনুকরণ তিনি করেছেন। তারপরে তাঁর রচিত চিত্র যে প্রকৃতি থেকে ভিন্ন, তার সৌন্দর্য ভিন্ন, এ কথাটা খুব স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে সকল সময় সম্ভব হয় না। বরং দার্শনিক বেশ যুক্তির সাহায্যে শিল্পীকে বুঝিয়ে দেবেন যে বাস্তব উপাদানের সাহায্যে তুমি যে ছন্দের সৃষ্টি করেছ তোমার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যার অঙ্গাঙ্গি যোগ সেইটি তোমার ছবিকে প্রকৃতি থেকে কিছুটা ভিন্ন করেছে, কিন্তু তোমার ছবি প্রকৃতির অনুকরণ-বর্জিত নয়।

যুক্তির পথে যা সত্য, ভাবের পথে তা অসত্য হলেও এ-প্রশ্নের জবাব হয়ত কোনো দার্শনিকভাবাপন্ন শিল্পী দিতে পারবেন, কিন্তু সাধারণভাবে অতি মহৎ শিল্পী এ প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম না-ও হতে পারেন।

দার্শনিকের প্রশ্নে শিল্পীর দুরবস্থা কি রকম হতে পারে তারই একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। দার্শনিক আমাকে প্রশ্ন করেছেন, শিল্পী মানস-পটে যে ছবি প্রত্যক্ষ

করে সেটি চিত্রপটে দেখা দেয় আর একভাবে। দর্শক সেই চিত্রপট থেকে যে ভাব গ্রহণ করেন সেটিও আর একরকমের। এখন শিল্পীর মানস-পটের ছবি এবং চিত্রপটের ছবি ও দর্শকের মনে প্রতিফলিত ছবি এই তিনের মধ্যে সত্যকারের ছবি কোনটিকে বলব ?

দার্শনিকের এই জটিল প্রশ্নের জবাব শিল্পী হয়ত দিতে পারেন নি। কাজেই দার্শনিকের সত্য ও শিল্পীর সত্য উভয়ের পার্থক্য কোথায় বিচার করতে না পারলেও শিল্পীর রচনা বন্ধ হয় না। কারণ শিল্পী যা রচনা করেন সেটি তাঁর কাছে পরম সত্য এবং সত্যের প্রতীতি না হওয়া পর্যন্ত শিল্পী রচনা করতেই পারেন না। তাই মনে হয় এসব প্রশ্নের মীমাংসা শিল্পী করতে না পারলে বিশেষ কিছু আসে যায় না। শিল্পী সমাজজীবনে যে আনন্দ-সৌন্দর্যের সম্পদ দিয়ে থাকেন সেটিকে বাদ দিয়ে সমাজ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হতো তা অনুমান করা কঠিন নয়।

স্থূল দৃষ্টিতে যা আমরা দেখি অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তার পরিচয় আর একরকমের। বৈজ্ঞানিক আলোতে তার আর একদিক দেখা যায়। একই অস্তিত্বের এ যেন বিভিন্ন দিক থেকে দেখা।

যেসব জ্ঞানীশিল্পকলাকে মিথ্যা বলে বর্জন করতে চেয়েছেন তাঁরা ব্যাক্যের সাহায্যে জ্ঞানের সত্য পরিচয় দিতে পেরেছেন কিনা এটাও একটা প্রশ্ন। এ বিষয়ে ভারতীয় চিন্তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল।

জ্ঞানী দার্শনিক বলছেন, ঝর্ণা নদীতে যখন পরিণত হয় তখন তার নাম বদলায় আবার নদী যখন সমুদ্রের সঙ্গে মেশে তখন তার স্বকীয় নাম থাকে না। তেমন যিনি পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী তাঁর কাছে এই নাম-রূপের জগৎ লোপ পায়। নাম-রূপের জগৎ লোপ পাবার শেষ পর্যন্ত শিল্পী উপলব্ধি করতে সক্ষম। যখন নাম থাকবে না তখন শিল্পও থাকবে না। সেই সঙ্গে মানবীয় সকল চেতনাই লোপ পেয়ে নিরাকার নির্গুণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পরিণত হয়। এই শূন্যতাকে পূর্ণ করা হয়েছে ঈশ্বরের নামে।

শিল্পীর কাজ মানুষ নিয়ে। শক্তিসাধনায় ঐ মতের সমর্থন পাওয়া যায়, তাই বৈষ্ণব কবি বলেছেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। বৈষ্ণব কবির এই উক্তি শিল্পীর পক্ষে পরম সত্য। মানবীয় চেতনার পূর্ণ পরিচয় শিল্পে সাহিত্যে

যা পাওয়া যায় তাকে মিথ্যা বলা চলে না, তা সত্যেরই আর এক পরিচয়। ভারতীয় ভক্তিবাদ এ-বিষয়ে মীমাংসা করেছেন, পূর্ণ জ্ঞানের বাস্তব প্রকাশকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন। এই জন্য ভক্তিবাদে আনন্দ-সৌন্দর্যের বিশেষ স্থান আছে।

জীবনের একমাত্র সার্থকতা তাঁর সৃজনীশক্তির বিকাশ ও বিবর্তনের পথে। এই বিবর্তনের পথে পরম-সত্যের তুষার-কঠিন অভিজ্ঞতা আনন্দে সৌন্দর্যে ছন্দের উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার পথেই শিল্পীর পরম সিদ্ধি। অবশ্য যদি সমগ্র সমাজ কাম-ক্রোধ-লোভ বর্জিত নির্বিকার হয়, তখন শিল্পকলার কোনো প্রয়োজন থাকবে কি না জানি না। তবে যতক্ষণ মানুষের জীবনে আবেগ উদ্দীপনা থাকবে, যতক্ষণ বিচারের সিদ্ধান্ত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পথ মুক্ত থাকবে ততক্ষণ সমাজ থেকে শিল্পী রস গ্রহণ করবে এবং ফলে সমাজজীবনকে নতুন সত্যের দ্বারা বিস্তৃত করবে।

শিল্পী ও দার্শনিকের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য স্পষ্ট ক'রে তোলার জন্য ব্যাসদেবের একটি উক্তি উল্লেখ করা গেল। মূল সংস্কৃত :

রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতম্।
স্তুত্যা নির্বচনীয়তা খিলগুরোঃ খণ্ডীকৃতং যন্ময়া।
ব্যাপিত্বং চ বিনাশিতং ভগবতো যৎ তীর্থযাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ। তদ্বিকলতাদোষ এয মৎকৃতঃ॥

ব্যাসদেবের খেদোক্তি :

অরূপের রূপ আনি কল্পনা করেছি মোর ধ্যানে।
বাক্যাতীত মহত্তমে করিয়াছি ছোট স্তুতি গানে।
সর্বব্যাপী অসীমেরে সীমিত করেছি তীর্থাদিতে,
দোষী আমি জগদীশ! ক্ষমা চাই অনুতপ্ত চিতে॥

শিল্পীর মানসিক গঠন ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিজের মনে আলোচনা করতে শুরু করেছিলাম। ক্রমে নানা বিষয়ের জটিল সমস্যার মধ্যে এসে পৌছলাম। শিল্প-রূপের অন্তর ও বাহিরের কথা বোঝাতে গিয়ে আমাকে সাহিত্যের ভাষা ব্যবহার করতে হল। স্পষ্টই দেখছি শিল্পের ভাষা দিয়ে শিল্পের ব্যাখ্যা করা চলে না। সাহিত্যের ভাষা এ-দিক দিয়ে অধিক শক্তিশালী। যুক্তিতর্কের সাহায্যে তথ্যের বোঝা বইবার ক্ষমতা সাহিত্যের ভাষায় অনেক বেশি সক্রিয়।

শিল্প, সাহিত্য, নৃত্য, নাট্য, ইত্যাদির মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। এইজন্যই সৌন্দর্যসাধনার ক্ষেত্রে শিল্পের সঙ্গে সংগীতের, সংগীতের সঙ্গে নৃত্যের তুলনামূলক

আলোচনা করা হয়ে থাকে ! অতি আধুনিক শিল্পসমালোচকের কাছ থেকেও আমরা অনুরূপ আলোচনা পেয়ে থাকি। এই তুলনা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কারণ প্রত্যেক শিল্প যেমন ভিন্ন তেমনি শিল্পের মধ্য দিয়ে প্রায় একই শক্তির উপলব্ধি হয়ে থাকে। একই স্থান থেকে নদী-তটভূমির মতো এক এক শ্রেণীর ভাষা, আঙ্গিক, শিল্পকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যদি বেড়া ভেঙে দেওয়া যায় তাহলে নামের ভিন্নতাও ঘুচে যায়। সংক্ষেপে সৌন্দর্যের পরম উপলব্ধি এক ও অখণ্ড। কিন্তু সেটিকে অন্যের গোচর করতে হলেই ভাষা। একদিক দিয়ে বলা যায় ভাষা ও সৌন্দর্যের মধ্যে পার্থক্য ঘুচিয়ে দেওয়াই প্রতিভাবান শিল্পীর কাজ।

প্রাচ্যশিল্পে আধুনিকতার নামে কোনো জোরালো আন্দোলন আমরা দেখি না। পাশ্চাত্য প্রভাবেই প্রথম আন্দোলন শুরু হয় এবং পাশ্চাত্য আধুনিকতার অনুসরণ করেই প্রাচ্যশিল্পে বিবর্তন থাকলেও পাশ্চাত্য-মার্কা আধুনিকতার আন্দোলন প্রাচ্য ভূখণ্ডে ঘটে নি। তাই আধুনিতা বলতে হলে পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাস অনুসরণ করতে হয় এবং সেই ইতিহাসের সূচনা হল ইটালির রেনেসাঁস-যুগে।

সমকালীন শিল্পের গতিপ্রকৃতি অনুসরণ করতে হলে রেনেসাঁস-যুগের শিল্প-পরম্পরার কিঞ্চিৎ ধারণা থাকা দরকার। যদিও বৈজ্ঞানিক যুগের শিল্প রেনেসাঁস পরম্পরার আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হবার চেষ্টা করেছে। কিসের জন্য এই চেষ্টা ? কোন প্রভাব ? অন্তত এইটুকু জানবার জন্য রেনেসাঁস-যুগের কথা বলতে হয়।

প্রথম বাস্তব সত্যকে শিল্পের অঙ্গীভূত ক'রে তোলার চেষ্টা করলেন রেনেসাঁস-যুগের শিল্পীরা। গথিক-পরম্পরার পরিবর্তে গ্রীক-শিল্পের আদর্শ তাঁরা গ্রহণ করলেন। এইভাবে বস্তু-আশ্রিত এক নতুন পাদপীঠ নির্মিত হল রেনেসাঁস-যুগের শিল্পীদের প্রভাবে। সমগ্র প্রাচ্যশিল্প-পরম্পরার সঙ্গে তাদের কোনোরকম সম্বন্ধ রইল না। দেখা দিল সম্পূর্ণ নতুন এক শিল্প-পরম্পরা। যে পরম্পরার মূল উপাদান হল আয়তন-যুক্ত আকার ও আলোছায়ার সন্নিবেশ। প্রবর্তিত হল Perspective—সংক্ষেপে, দৃশ্য-জাত উদ্দীপনার বিশ্লেষণ ও যথাযথ অনুসরণের চেষ্টায় দেখা দিল শিল্পে বাস্তবতা তথা বস্তু আশ্রিত শিল্প।

তৈল বর্ণ আবিষ্কৃত হল। পুরনো করণ-কৌশল বদলে গেল। রেখাত্মক গুন

অদৃশ্য হল। উপকরণের প্রভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে নতুন শিল্প-আদর্শ ও নতুন নির্মাণ-রীতি নতুন যুগের সৃষ্টি করল, যার তুলনা সমগ্র প্রাচ্যশিল্পে মেলে না। ক্রমে রেনেসাঁসের শিল্প-রীতি ক্ষীণবল হয়ে এল এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে ইয়োরোপে চিত্র-পরম্পরা প্রাণহীন নির্জীব হয়ে উঠল।

এই প্রাণহীন শিল্প পরম্পরাকে যাঁরা বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন তাঁরাই হলেন আধুনিকতার অগ্রদূত। এঁদের একদল আলোছায়ার জগৎ থেকে শুদ্ধ-বর্ণের অনুসন্ধান করলেন। আর একদল অনুসন্ধান করলেন দৃশ্য-জাত উদ্দীপনা থেকে আকারগত উদ্দীপনার অনুসন্ধান! দৃশ্য ও স্পর্শ এই উভয় সম্বন্ধ নতুন ক'রে স্থাপন করার চেষ্টা আজও এই মুহূর্ত পর্যন্ত শেষ হয় নি ভাষার ক্ষেত্রে। রেখা, ছন্দ, ভঙ্গি প্রাচ্যশিল্পেরই সব বৈশিষ্ট্য। নতুন ক'রে আত্মপ্রকাশ করল প্রাচ্যশিল্প-পরম্পরাতে। সাহিত্যগত বিষয়ে বর্জন করার আন্দোলন দেখা দিল এবং প্রাচ্যশিল্পের প্রভাবও প্রতিফলিত হতে বিলম্ব হল না। এইভাবে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটেছিল তার অবসান না ঘটলেও ঠিক সেই পথ আর কেউ অনুসরণ করলেন না। ক্রমে নতুন করণ-কৌশলের প্রভাবে সমকালীন শিল্পের নবযুগ।

আমার এই ভূমিকারই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এইবার দেবার চেষ্টা করব।

শিল্পের অন্তর-বাহির উভয় দিকের নতুন সংযোগের যে চেষ্টা দেখা দিল বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে তার গতি-প্রকৃতি অতি দ্রুত সমগ্র ইয়োরোপকে প্রভাবান্বিত করেছিল। রেনেসাঁস-যুগের পর এমন শক্তিশালী আন্দোলন ইয়োরোপের মাটিতে দেখা দেয় নি। যাঁরা এই নতুন আদর্শের ধারক ও বাহক তাঁরা আজ এতই পরিচিত যে তাঁদের সম্বন্ধে নতুন কিছু বলার প্রয়োজন দেখি না।

ফরাসি শিল্প-আন্দোলনের পটভূমিতে আমরা লক্ষ করি মার্কিন দেশের শিল্প-সংস্কৃতির নবজন্ম। প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে শুরু ক'রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ, এই সময়ের মধ্যে রুশ ও ইয়োরোপের মধ্যেকার বহু শিল্পী অন্নবস্ত্রের চেষ্টায় বা নিজ-নিজ শিল্প-রক্ষার সুযোগ পাবার আশায় মার্কিন দেশে আশ্রয় নিলেন।

এইসব নাবাগত শিল্পীদের প্রভাবে মার্কিন দেশের আধুনিকতার এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। এই নতুন শিল্প-ধারাটিকে আমরা বলতে পারি খাঁটি বৈজ্ঞানিক যুগের শিল্প। অবশ্য ফরাসি, জার্মান, ইটালি দেশের আন্দোলনের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো যোগ ছিল না তা নয়। যোগ যথেষ্ট ছিল। **Futurism, Dadaism, Cubism (abstract), Surrealism, Constructivism** ইত্যাদির সঙ্গে বিজ্ঞান যুগের

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তৎসত্ত্বেও বলতে হয় যে বিংশ শতাব্দীর শিল্প-আন্দোলন বিজ্ঞানের অবদানের দ্বারা প্রভাবান্বিত, কিন্তু মানবীয় চেতনা তখনো অল্পবিস্তর স্বীকৃত। একমাত্র Abstract আর্টের আদর্শই শিল্পকে সবচেয়ে বিজ্ঞান-ভাবাপন্ন করেছিল। তবে এই আদর্শের শুদ্ধতা দীর্ঘকাল অনুসৃত হয়নি। এই কারণে বৈজ্ঞানিক যুগের ধারক ও বাহকরূপে মার্কিন দেশের অবদানকে আধুনিকতার প্রতিনিধি রূপে গ্রহণ করতে হয়।

যে সময় ইয়োরোপ যুদ্ধ এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত সেই সময়ের মধ্যে মার্কিন দেশ বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবন এবং যন্ত্র-শিল্পের শক্তিতে সমগ্র ইয়োরোপকে প্রভাবান্বিত করেছে এবং অ্যাটম বোমার শক্তি দেখিয়ে জগৎকে স্তম্ভিত করেছে। সেই মার্কিন দেশের শিল্পে যে যন্ত্রযুগের প্রভাব গভীরভাবে প্রতিফলিত হবে একথা সহজেই অনুমান করা চলে।

বিজ্ঞান অতীতের বিশ্বাসকে ভেঙেচুরে নির্মূল ক'রে দিয়েছে। কাজেই মার্কিন দেশের শিল্প-চিন্তা অতীতকে ধ্বংস ক'রে বিজ্ঞানের আলোয় উজ্জ্বল বর্তমানকে এক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মার্কিন দেশে ইয়োরোপ থেকে যেসব শিল্পীরা আশ্রয় নিলেন তাঁরা সে দেশের শিল্পীদের দেখালেন শিল্পের আঙ্গিক ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। অপরদিকে এইসব শিল্পীরা প্রভাবান্বিত হলেন মার্কিন দেশে দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার দ্বারা।

মার্কিন শিল্পীরা নতুন নতুন পরীক্ষার পথে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মতো চমকপ্রদ দ্রুততার প্রবর্তন করলেন। দ্রুততার সঙ্গে অনিশ্চয়তা, অনিশ্চয়তার সঙ্গে আশংকা, উদ্বেগ বৈজ্ঞানিক যুগে বেশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল মার্কিন শিল্পে—তথা শিল্পে অন্তর্মুখী গতি প্রায় নিশ্চিহ্ন হ'ল। পরিবর্তে দেখা দিল শুদ্ধ বস্তু-আশ্রিত শিল্প। শিল্পীদের সামনে অতীন্দ্রিয় আদর্শ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়-জাত উদ্দীপনাই হল জীবনের সর্বপ্রধান পরিচয়।

ভাব, সৌন্দর্য, রস ইত্যাদি গতানুগতিক ভাবধারার সঙ্গে প্রগতিবাদী মার্কিন শিল্পীদের সম্বন্ধ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কারণ এই আদর্শ অনুসরণ করার সুযোগ ছিল মার্কিন সমাজ ও শিল্পে অতি সংকীর্ণ। তাই শিল্পের ভাবগত উপাদান সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষার চূড়ান্ত পরিণতির দিকে অগ্রসর হলেন এইসব শিল্পীরা। ক্রমে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা অপেক্ষা যন্ত্রযুগের আকার-প্রকার ও নির্মাণ-রীতির দ্বারাই তাঁরা বেশি প্রভাবান্বিত হলেন। তৈরি হল নতুন রকমের গ্যাজেট-শিল্প, প্রযুক্তিবিদ্যা (Technology)।

যন্ত্র প্রভাবান্বিত গ্যাজেট-মার্কা শিল্প রূপের মধ্যে মানবীয় চেতনার বিশেষ কোনো স্থান রইল না। তাই পণ্ডিত এবং বৈজ্ঞানিকের মধ্যে কোথাও কোথাও এই শিল্পের নাম দেওয়া হল 'Dehumanized Art'।

একদিন আদম ও ইভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার অপরাধে স্বর্গচ্যুত হয়েছিলেন। আজও তেমনি শিল্পীরা বিজ্ঞান-বৃক্ষের ফল খেয়ে শিল্পের উদ্যান থেকে বেরিয়ে যন্ত্রের কারখানায় প্রবেশ করেছেন। সে নতুন পরিবেশের মধ্যে সমকালীন শিল্পীরা শিল্পসৃষ্টিতে রত আছেন সে-পরিবেশের কিছু পরিচয় নেওয়া যাক। পৃথিবীর সকল শিল্পীই আজ শহরবাসী। কলকারখানা পরিবেষ্টিত, শব্দে মুখরিত, গ্যাজেট-কণ্টকিত শহরে শিল্পীদের জীবন কাটছে। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক সম্বন্ধ আজ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। অবশ্য বিজ্ঞানের দৌলতে প্রকৃতির সম্বন্ধে জ্ঞান বহু পরিমাণে বিস্তৃত হয়েছে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ এবং আরও বহুবিধ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সাহায্যে প্রকৃতি জাত তথ্য এতই বিস্তৃত হয়েছে যে সে-সম্বন্ধে কোনোরকম ধারণা গ্রীক বা রেনেসাঁস-যুগের শিল্পীদের ছিল না।

সংক্ষেপে : রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের জগৎ আজ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ; কাজেই ইন্দ্রিয়-জাত উদ্দীপনা যে বদলে যাবে সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রকৃতির যেমন হৃদয়গ্রাহ্য আবেদন আছে তেমনি প্রকৃতির অন্তরে নিহিত শক্তিও আছে। এই শক্তিকে আয়ত্ত ক'রে বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষ অসীম ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে। প্রাকৃতিক বাধা বলতে আজ আর কিছুই নেই। ধর্ষিতা প্রকৃতিদেবীকে মানুষ যখন প্রায় ক্রীতদাসীর স্তরে ঠেলে দিয়েছে এমন সময় প্রকৃতির প্রতিশোধ শুরু হল। আজ বৈজ্ঞানিকরা বুঝতে পারছেন সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাটি, জল, আকাশ, বাতাস এমনি কলুষিত হয়ে উঠেছে যে মানুষের অস্তিত্ব হয়ে উঠেছে বিপজ্জনক। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে চলার দরকার, একথা ইতস্তত জ্ঞানী গুণীর কাছ থেকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

বৈজ্ঞানিকরা এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করবেন সেকথা নিয়ে আলোচনার যোগ্যতা বা প্রয়োজন আমার নেই। শিল্পীসমাজ এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করবেন অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপনে তাঁরা অগ্রসর হবেন, না এই কলুষিত যন্ত্রযুগের অবদানকে চূড়ান্তবলে স্বীকার করবেন, সেটি অনুসন্ধান করার বিষয়।

শিল্পীরা যে নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা-ব্যবস্থার মধ্যে স্বস্তি পাচ্ছেন না তা নিশ্চয় ক'রে বলা যায়, কারণ কোনো আদর্শই দীর্ঘকাল অনুসৃত হতে দেখা যাচ্ছে না। মুহূর্তে মুহূর্তে শিল্পের গতিপ্রকৃতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য, আঙ্গিক বদলে চলেছে। গতকাল যে-আদর্শ চূড়ান্ত বলে গৃহীত হয়েছিল আজ আর তার কোনো মূল্য থাকছে না। সমগ্র শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছে এহ বাহ্য এহ বাহ্য!

জীবনের দ্রুতগতি চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে সাম্প্রতিক শিল্পকলার প্রতি অঙ্গে। তাই সাম্প্রতিক শিল্পে অসম্পূর্ণতার চিহ্ন প্রায়ই লক্ষ করা যায়। এই অসম্পূর্ণতার কারণ শিল্পীর অবস্থার সঙ্গেই যুক্ত।

কিছুটা বিশৃঙ্খলা ছাড়া সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটে না। বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ, পরম্পরার মূলে কুঠারাঘাত—এগুলি বিবর্তনের পূর্ব-লক্ষণ। আজকের দিনে শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে-বিশৃঙ্খলা বা উচ্ছৃঙ্খলতা সেগুলিকে বিবর্তনের আবশ্যিক লক্ষণ বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। যেসব শিল্পী এই বিশৃঙ্খলার পথ খুলে দিলেন তাঁদের কাছ থেকে কিছু যে স্থায়ী সম্পদ আমরা পাই নি তা নয়। প্রথমেই দেখা যায় ধর্ম, নীতি-দুর্নীতি, পরম্পরা-আশ্রিত সংস্কারকে উপেক্ষা করার দুঃসাহস বা সৎসাহস এইসব শিল্পীর সর্ব-প্রধান অবদান। সুন্দর ও অসুন্দরের ধারণা যে কীভাবে অভ্যাসগত সংস্কারের সঙ্গে জড়িত সে-বিষয়ে নতুন ক'রে প্রশ্ন জাগল আমাদের মনে।

এই সাহস সকল শিল্প-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থেকেছে। কিন্তু অতীত থেকে এতটা বিচ্ছিন্ন শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস ইতিপূর্বে ঘটে নি। শিল্পের ইতিহাসে এই যে ব্যতিক্রম সেটা কতটা সমকালীন অবস্থা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সে-সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বিদ্রোহ ছাড়া শিল্পের কোনো নতুন পথ আবিষ্কৃত হয় নি। আজকের এই বিদ্রোহের অন্তরে আছে প্রকৃতি ও পরম্পরা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ও অপরিণত ধারণা। প্রকৃতি ও পরম্পরা উভয়কেই আগের দিনের শিল্পীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। প্রকৃতি ও পরম্পরার প্রভাব থেকে নিজেদের বিভিন্ন করবার চেষ্টা তাঁরা করেন নি। কারণ মানবজীবনের মূল্যবোধের সঙ্গে শিল্পকে যতদূর সম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রেখেছিলেন, এমনকি Cubism-এর কাল পর্যন্ত এ-আদর্শের বড় রকমের ব্যতিক্রম ঘটে নি।

বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে হৃদয়বৃত্তি—উভয়ের যথাযথ সংযোগ ছাড়া শিল্প পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে না এটি একটি শাশ্বত সত্য। সম্পূর্ণভাবে এই সত্যকে কোনো দার্শনিক বা শিল্পী উপেক্ষা করেন নি। আর উপেক্ষা করাও চলে না। কখনো হৃদয়বৃত্তি অনুসরণ করে বুদ্ধিবৃত্তিকে, কখনো বা বুদ্ধিবৃত্তির সম্মুখভাগে থাকে হৃদয়বৃত্তি। উভয়ের সংযোগে যে নতুন শক্তি উৎপন্ন হয় সেই শক্তিকে শ্রেষ্ঠ রচনাতে আমরা উপলব্ধি করি।

এই মুহূর্তে শিল্পের ক্ষেত্রে হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে তীব্র সংঘাত দেখা দিয়েছে। এই সংঘাতের চিহ্ন সাম্প্রতিক শিল্পে প্রায় সর্বত্র বর্তমান। সমকালীন শিল্পে যে অসম্পূর্ণতার উল্লেখ করেছি তারও মূলে আছে এই সংঘাত।

এইবার সমকালীন শিল্পে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব অনুসরণ করা যেতে পারে। মনোবিজ্ঞানের ঐতিহ্য আনকোরা নতুন নয়। ধর্ম, সমাজ, যৌনজীবন ইত্যাদির সঙ্গে মনোদর্শন জড়িত। ঈশ্বর, পাপপুণ্য, ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদির সঙ্গে প্রাচীন মনোবিজ্ঞানের জন্ম।

আধুনিক যুগের মনোবিজ্ঞান বিশেষভাবে চিকিৎসা-শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত নরনারীর রোগের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ফ্রয়েড যৌনজীবন সম্বন্ধে যে-সিদ্ধান্ত করেছিলেন তারই প্রভাব সমকালীন শিল্পে সবচেয়ে শক্তিশালী। Surrealism-নামক শিল্পের আদর্শ ফ্রয়েড-প্রচারিত মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পা ফেলে চলবার চেষ্টা করেছে। কাজেই এই শিল্পীগোষ্ঠীর পরিচয় থেকে মোটামুটি মনোবিজ্ঞান-সম্মত শিল্পধারার পরিচয় পাওয়া যাবে।

চেতন (Conscious), অর্ধচেতন (Subconscious), অচেতন (Uuconscious)—মানুষের এই মনের স্তরভেদ আগের দিনের সাধক-সমাজে অজানা ছিল না। ভারতীয় যোগী, খ্রীষ্টীয় সাধুসন্ত সকলেই এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন। গভীর ধ্যানের পথে যে কতকগুলি কামজ আকাঙ্ক্ষা জীবন্ত হয়ে ওঠে, বুদ্ধের প্রলোভন-জয়ের কাহিনী ও অজন্তা গুহায় তাঁর চিত্র এ-বিষয়ে সুপরিচিত দৃষ্টান্ত।

সিগমণ্ড ফ্রয়েড অচেতন মনের রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষাগুলিকে স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেখালেন যে আমাদের সকল রকমের মানসিক বিকৃতির কারণ রুদ্ধ কামজ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সচেতন তথা সামাজিক মনের দ্বন্দ্ব। তাঁর মতে স্বপ্নের এই দ্বন্দ্বগুলি প্রকাশ পায় কতকগুলি প্রতীকের সাহায্যে। Surrealist শিল্পীরা ফ্রয়েডের প্রবর্তিত

আদর্শকে গ্রহণ করলেন। বিশেষভাবে স্বপ্নবাদ হল তাঁদের মূলমন্ত্র। স্বাভাবিক মন যুক্তির নির্দেশে এবং সমাজের ভয়ে যেসব বিষয় থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে সেগুলিকে অস্বীকার ক'রে শিল্পীরা অসামাজিক অযৌক্তিক জগৎ সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেন। এই সৃষ্টির প্রধান অবলম্বন হল ফ্রয়েড-প্রবর্তিত প্রতীকগুলি।

মহৎ আদর্শ সম্বন্ধে স্বীকৃতি ফ্রয়েডের আলোচনায় পাওয়া যায় না। জীবনের মহৎ আদর্শ সম্বন্ধে তিনি অনেক পরিমাণে উদাসীন। অতলস্পর্শী অচেতন মনের অনুসন্ধান ফ্রয়েড চূড়ান্তভাবে করতে সক্ষম হন নি। তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ যুঙ-এর স্বপ্নবাদ। ভারতীয় তন্ত্র-সাধনায় অচেতন মনকে ধ্যানের পথে সচেতন ক'রে তোলার একটি নির্দিষ্ট পন্থা আছে। এই উপায়ে ছিন্নমস্তা, চামুণ্ডা ইত্যাদির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক যুঙ-এর স্বপ্নবাদ কিছু পরিমাণে ভারতীয় মনোবিজ্ঞান অনুসরণ করার চেষ্টা করে। তাই তাঁর মতো মানুষের মন কামজ বৃত্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। Surrealist-পন্থী শিল্পীরা ফ্রয়েড-প্রবর্তিত প্রতীক দ্বারা সীমিত গণ্ডির থেকে যে ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার সন্ধান করছেন, যার ফলে নতুন প্রতীক আত্মপ্রকাশ করছে, সম্ভবত তার মূলে আছে যুঙ-এর প্রভাব।

আমাদের দেশে তান্ত্রিক আর্ট নামক চর্চাও শুরু হয়েছে কিছুটা ভারতীয় কিছুটা যুঙ-এর প্রভাবে।

প্রযুক্ত বিদ্যার Technological ও Psychological উভয় দিকের যে-পরিচয় পাওয়া গেল তার থেকে অনুমান করা চলে যে সমকালীন শিল্পী বাস্তবতা ও বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত সৌন্দর্য থেকে প্রতীকধর্মী শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস করেছেন। উভয়ের সংযোগে বহুদিক দিয়ে বহুভাবে শিল্পীমহলে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে সে-বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন দেখি না। কারণ সাম্প্রতিক শিল্পের গতি-প্রকৃতি নানা আঁকাবাঁকা পথে প্রবাহিত হলেও মূল লক্ষ্য দু'টিরই আমি অনুসন্ধান করেছি। যদি এই আলোচনা নির্ভরযোগ্য হয় তবে মীমাংসা করতে পারি যে একদিকে আছে বিজ্ঞানের উজ্জ্বল গৌরবময় সৃষ্টি, যার প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল Futurist-দের আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে। এই আন্দোলন শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধের অনতিকাল পূর্বে। অপরদিকে আছে Dadaism। যার সূত্রপাত হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের অনতিকাল পরে।

যন্ত্রসভ্যতার প্রতি প্রচণ্ড বিদ্রোহ নিয়ে Dadaism শুরু হয়। এই থেকেই Psychological শিল্পধারার সূচনা। এ-ক্ষেত্রে দেখি সভ্যসমাজ ও সভ্যজীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা। Futurist-রা করলেন যন্ত্রশক্তির বর্ণনা। অপরদিকে Dadaist-রা

প্রকাশ করলেন যন্ত্রযুগের বীভৎসতা, নৈরাশ্যবাদ। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য-আদর্শকে তুচ্ছ ও সংকীর্ণ ক'রে দেখানোর চেষ্টা। এই দুই আদর্শকে সমকালীন শিল্পের স্থায়ীভাব বলা যায়। এবং এই দুই আদর্শের কোনোটির সঙ্গে মানুষের উচ্চ আদর্শ জড়িত নেই বলেই শিল্প আজ মানবীয় চেতনার থেকে বিচ্ছিন্ন।

পৃথিবীর ইতিহাসে যতগুলি ধর্মীয় প্রতীকের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সেগুলি সমাজ ও জীবনের গভীরতম আদর্শের সঙ্গে যুক্ত। এই কারণে এইসব প্রতীকের সঙ্গে জীবনের মূল্যবোধ বিশেষ বিশেষ আদর্শের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আধুনিক প্রতীক জীবনধারণের উদ্দেশ্যপ্রধান এবং জীবনধারণের উপযুক্ত প্রয়োজনকেই প্রধান বলে জেনেছে। উপযুক্ত খাদ্য, উপযুক্ত আশ্রয় ও বিশ্রামের অবকাশেরই মধ্যে মানুষের জীবনের বিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে—এ-বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত তা। এই কারণে এইসব জীবনধারণের আবশ্যিক বস্তুগুলি সকলের কাছে উপযুক্ত পরিমাণে পৌঁছানো দরকার। এই উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করা অসম্ভব। তৎসত্ত্বেও বলতে হয়, মানুষের আরো কিছু আদর্শ আছে এবং তার অনুসন্ধান করার সুযোগ সমাজে থাকা প্রয়োজন।

রুশ বিপ্লবের পরে যে শিল্প পরম্পরা আত্মপ্রকাশ করেছিল, তার প্রাণকেন্দ্ররূপে কাস্তে ও হাতুড়ি এই প্রতীকটির উল্লেখ করা দরকার। জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে এই প্রতীকের তুলনা ইতিহাসে বিরল। U. S. S. R-এর সমস্ত শিল্প এই প্রতীকের ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করাই সংগত। অর্থ নৈতিক জীবনকে উজ্জ্বল ক'রে দেখানোই এ ক্ষেত্রে শিল্পীদের সর্বপ্রধান দায়িত্ব। সমাজের সকল স্তরের মানুষের দুঃখদৈন্য দূর করার চেষ্টাকে যৎকিঞ্চিৎ বলে উপেক্ষা করা চলে না। এইদিক দিয়ে U. S. S. R-এর Communist দেশের পরিকল্পনা যতটা সার্থক, শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা কতটা সার্থক হয়েছে তা বিচার করা কঠিন। কারণ সংস্কৃতির আদর্শ ব্যক্তির জীবনের মূল্যবোধ এবং জীবনধারণের বিধিব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই আছে। এইদিক দিকে রুশদেশের শিল্পকলা জীবনের মূল্যকে সংকীর্ণ ক'রে এনেছে—এ অনুমান অনেকে ক'রে থাকেন। এই অনুমানের সমর্থন নিম্নলিখিত সংজ্ঞা থেকেও পাওয়া যাবে : 'Socialist Realism is painting what you hear'।

সংক্ষেপে, U. S. S. R-এর শিল্পকলা এখন পর্যন্ত প্রচারকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অবশ্য প্রশ্ন হতে পারে যে আগের দিনের ধর্মীয় শিল্পকলাও একরকমের

প্রচারকর্মই বলা চলে। এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে অনুসন্ধান করতে হয় প্রচারের আদর্শ ও উদ্দেশ্য।

আধুনিক শিল্পের এই বিবর্তন এবং বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে হলে আরো অনেকগুলি প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। নতুন সমাজনীতি, রাষ্ট্রীয় নীতি এবং নতুন যুগের অর্থনীতি—এইসব জটিল প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া আধুনিক শিল্পীদের যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে তার থেকে মোটামুটি বিষয়টি জানা যাবে। তৎসত্ত্বেও রুশদেশে যে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত শিল্পীসমাজ সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা যেতে পারে।

রুশদেশের শিল্পসমাজ রাষ্ট্রনীতির গৌরবময় কাহিনীকে শিল্পে রূপায়িত করার প্রয়াস করেছে। সর্বসাধারণের যেমন পর্যাপ্ত খাদ্য, উপযুক্ত আশ্রয়ের দরকার তেমনি শিল্প সাহিত্যের প্রয়োজন—সর্বসাধারণকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন করায়। এই জন্যই রুশদেশের শিল্প সর্বসাধারণের জন্য রচিত হয়েছে। সাহিত্যগত ভাব এবং স্বভাব-নিষ্ঠ (Realistic) শিল্প-আদর্শকে তাঁরা বর্জন করতে পারেন নি।

বিজ্ঞানে বলীয়ান প্রগতিবাদী সমাজের মধ্যে শিল্প অনেক পরিমাণে প্রতিক্রিয়াশীল। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। একথা স্বীকার করতে হয় যে খ্রীষ্টীয় শিল্পও একরকমের প্রচার শিল্প। তাহলে পার্থক্য কোথায়? জবাবে বলতে হয় যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয়ের ধর্মীয় শিল্পে বাস্তব ও বিমূর্ত উভয় দিকের সংযোগ হয়েছিল বিশেষ একটি আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে। আধুনিক সমাজবাদের আদর্শের এই ব্যাপকতা আছে কি না জানি না। তবে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি থেকে সে-দেশের প্রগতিবাদী শিল্পীদের মনোভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে :

Khrushchev : What do you think of the art produced under Stalin ?

Neizvestny : I think it was rotten and the same kind of artists are still deceiving you.

Khrushchev : The methods Stalin used were wrong, but the art itself was not.

Neizvestny : I do not know how, as Marxists, we can think like that. The methods Stalin used served

the cult of personality and this became the content of the art he allowed. Therefore the art was rotten too.

He (Khrushchev) asked him how it was that he could withstand for so long the pressure of the State.

Neizvestny: There are certain bacteria—very small, soft ones—which can live in a super-saline solution that could dissolve the hoof of a rhinoceros.

—*Art and Revolution*, John Berger, pp. 84-86

রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব কোথায়, তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। মুষ্টিমেয় শিল্পীদের মধ্যে এই যে বিক্ষোভ এটি একটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিদ্রোহ নয়। এটিকেই বলব আমি মনুষ্যত্বকে রক্ষা করার বিদ্রোহ বা আন্দোলন। এই অর্থেই ফরাসী, মার্কিন শিল্পে অনুরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মনোভাব আত্মপ্রকাশ করার চেষ্টা করছে।

ফরাসি দেশের শিল্পের আধুনিকতা বা মার্কিন শিল্পে কোনো একটি স্থির আদর্শের অপেক্ষা অনুসন্ধানের প্রবণতাই অধিক। এই অনুসন্ধানের প্রবণতা থেকে আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পে বহু বিজাতীয় প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে এবং আত্মীকরণের চেষ্টা হয়েছে। এই বিজাতীয় প্রভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে পরিচয় না হলে আধুনিক শিল্পের বৈশিষ্ট্য এবং বিবর্তনের অনেক কারণ অস্পষ্ট থেকে যাবে। এই কারণে পাশ্চাত্য শিল্পে প্রাচ্যের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা গেল।

জাপানি হাতে-ছাপা ছবির প্রভাব প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ফরাসী দেশের Impressionist শিল্পীদের মধ্যে। প্রায় একই সঙ্গে দেখা দিয়েছিল পারস্য-চিত্রিত-গালিচা। এই প্রভাবের ক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে উঠল বর্ণপ্রয়োগের ক্ষেত্রে। এরই পরবর্তী প্রভাব দেখা দিল মার্কিন দেশে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপান-প্রত্যাগত মুষ্টিমেয় তরুণ শিল্পী লেখা ও রেখার সংযোগে গঠিত বিশেষ রকমের শিল্পধারাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করলেন। Jackson Pollock ও তাঁর অনুগামীরা যা করবার চেষ্টা করেছেন তার সঙ্গে Calligraphy-র আদর্শকে যুক্ত করা অযৌক্তিক নয়।

ইতিপূর্বে Paul Cézanne-এর প্রভাবে ফরাসি শিল্পী আকারনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছিলেন। সেই চেষ্টারই বিশেষ রকমের পরিণতি দেখা দিল Pablo Picasso-র প্রভাবে। নিগ্রো আর্ট এবং বিভিন্ন আদিম শিল্পের প্রভাব দেখা দিল সুসভ্য ফরাসি

শিল্পীদের জীবনে এবং নির্মিত হল Cubism-এর আদর্শ। এই Cubism থেকেই শুরু হল বিমূর্ত শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস। রেনেসাঁস-পরম্পারর ক্ষেত্রে প্রথম ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিলেন Futurist ও Dadaist-আদর্শবাদীরা। Picasso-প্রভাবে রেনেসাঁসের প্রভাব প্রায় ভেঙে পড়ল এবং শুরু হল শিল্পজগতে নতুন যাত্রা।

শুদ্ধ জ্ঞান একান্তভাবে উপলব্ধির বিষয়। এই উপলব্ধি কখনোই অন্যের গোচর করা যায় না বাস্তব আধার ছাড়া। জ্যামিতিক আকারও শুদ্ধ নয়। এটিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদ্দীপনা ও সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত। এই সত্যটি আবিষ্কৃত হবার পর পাশ্চাত্য শিল্পী-সমাজে শুদ্ধ Abstract কথাটির মূল্য কমে যায়। পরিবর্তে এই বিশেষ গুণ শিল্পসৃষ্টির সর্বপ্রধান লক্ষ্য বা আধেয় রূপে স্বীকৃত হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে শিল্পীরা আরও লক্ষ করলেন যে সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিষয় বিশুদ্ধ শিল্পসৃষ্টির প্রতিকূল। এই জন্যই Non-objective বা Non-figurative শিল্পীরা প্রচার করলেন যে কোনো বিষয়কে গৌরবমণ্ডিত করা শিল্পীর কাজ নয়। শুদ্ধ আবেগ (Emotion) একমাত্র আধেয় বস্তু। এখানে আমাদের প্রশ্ন হল Association-বর্জিত emotion আছে কোথায়? শিল্পীর ধ্যান-ধারণার উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বে বলছি যে ধ্যান-ধারণার সাহায্যে অভ্যাসগত বন্ধন থেকে মন মুক্তি পায়। কিন্তু শিল্পকর্মে যুক্ত হওয়ার মুহূর্ত থেকেই Association-এর ক্রিয়া জীবন্ত হয়ে ওঠে। তবে ধ্যান-ধারণার তথা সংস্কারমুক্ত উপলব্ধি পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সংকুচিত করতে দেয় না। লক্ষ করা যাচ্ছে যে বিমূর্ত গুণ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার মুহূর্ত থেকে আধুনিক শিল্পীরা কোনো রকম প্রচারকর্ম থেকে বিরত থাকবার সাধনা করছেন। এদিক দিয়ে আমেরিকান শিল্পীরা রুশ শিল্পীদের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত।

বিমূর্ত গুণের সাদৃশ্য-বর্জিত শুদ্ধতা যেমন রক্ষা করা সম্ভব হয় নি তেমনি Association-বর্জিত আবেগও রক্ষা করা সম্ভব হল না। কিন্তু শেষপর্যন্ত শিল্পের বিমূর্ত গুণের উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ আজ আর কোনো শিল্পীর মনে স্থান পাবে না। এই বিমূর্ত গুণের সন্ধান করতে গিয়েই আধুনিক পাশ্চাত্য ইয়োরোপ ও

মার্কিন শিল্পে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে তাবৎ প্রাচ্যশিল্পের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এটি হল সাম্প্রতিক শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

শিল্পের ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইতিহাসের উপাদান হয়ে আছে। সেসব আন্দোলনের কোনো প্রাণশক্তি আজ আর নেই এবং যেটুকু আছে তার লয় পেতে বিলম্ব হবে না। তবে শিল্পের ব্যাকরণ সম্বন্ধে এইসব আন্দোলনের অবদান অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। বিমূর্ত গুণের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে-চেতনা শিল্প-সমাজে জেগেছে তার বিস্তার এবং সচলতা যে ক্রমবর্ধমান এবং এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই যে আধুনিক শিল্পধারার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিহিত আছে তা অনুমান করা যায়। তবে এ হল আমার ব্যক্তিগত মত।

বিমূর্তগুণ সম্বন্ধে আধুনিক শিল্পীরা তীব্রভাবে সচেতন। কিন্তু শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই চেতনাকে তাঁরা প্রায় সময়েই প্রতিষ্ঠিত করতে পারছেন না। এই ব্যর্থতার কারণ প্রধানত ইয়োরোপীয় শিল্পের পরম্পরা। এই পরম্পরার নাগপাশ যখন সমস্ত ইয়োরোপীয় শিল্পকে আড়ষ্ট ক'রে তুলেছিল তারই প্রতিক্রিয়া রূপে বিমূর্তবাদের উদ্‌ভব এবং বিমূর্ত শিল্পের উপযুক্ত আদর্শকে অনুসন্ধান করতে গিয়েই প্রাচ্যশিল্পের দিকে শিল্পীরা ঝুঁকেছে, এবং শিল্পীসমাজ কিছুটা চরমপন্থী হয়েছে।

বিমূর্ততা ও বাস্তবতার সংযোগ কোথায়? বিমূর্ততা ও বাস্তবতা উভয়ের একটি সংযোগস্থল খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত বিমূর্ত গুণ-যুক্ত শিল্পসৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এই সংযোগের মুহূর্তেই আত্মপ্রকাশ করে সাদৃশ্যের জগৎ। যেটি স্থূল বাস্তবও নয়, শুদ্ধ উপলব্ধিও নয়। উভয়ের সংযোগের স্থান হল শিল্পীর জগৎ। এই সংযোগস্থল কোথায় কিভাবে হবে সেকথা বলে দেওয়া বা শিখিয়ে দেওয়া অসম্ভব। প্রতিভাবান শিল্পী এই জগতের আবিষ্কারক।

মাটি থেকে আকাশে আরোহণ এবং আকাশ থেকে মাটিতে অবরোহণ—এই আরোহণ-অবরোহণের মধ্যে কোনো এক জায়গায় শিল্পী মানুষ-প্রতিমা স্থাপিত করার জন্য একটি পাদপীঠ তৈরি করেন। এই পাদপীঠ বাস্তবতার গা ঘেষে হতে পারে, আবার আকাশের কাছাকাছি গিয়ে সেই পাদপীঠ নির্মিত হতে পারে। একটি হল বাস্তবতার উপাদানে নির্মিত পাদপীঠ আর একটিকে বলা যায় বিমূর্ত উপাদানে নির্মিত পাদপীঠ। আরোহণ-অবরোহণের পথে কোনো একটা স্থান অনুসন্ধান

করতে না পারলে শিল্পের পূর্ণ সার্থকতার সম্ভাবনা নেই। এই প্রসঙ্গে কতকগুলি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি, যার সাহায্যে আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

দোনাতেল্যোর রচিত (Boroda Museum replica) ঢাল হাতে দণ্ডায়মান মানুষ, তার পাশেই রাখা আছে Michelangelo-নির্মিত মোজেস-মূর্তি। দুইই রেনেসাঁস-যুগের পটভূমিতে নির্মিত। কিন্তু দোনাতেল্যোর বিমূর্ততা মাইকেলেঞ্জেলোর মোজেস-মূর্তিতে নেই এবং মোজেস-মূর্তির বাস্তবতা দোনাতেল্যোর মূর্তিতে নেই।

গ্রীক মূর্তি অ্যাপোলো (Apollo), বেলগোলার তীর্থংকর মূর্তি, মাইকেল-এঞ্জেলোর ডেভিড, রোঁদার Bronze-age—সব কয়টি মূর্তিই দণ্ডায়মান সমভঙ্গ, কিন্তু প্রত্যেক মূর্তির পাদপীঠ ভিন্ন। কোনোটি বাস্তবের দিকে কোনোটি বিমূর্ত জগতের দিকে। ঠিক এইভাবেই তুলনা করা চলে Cézanne-অঙ্কিত ছ'টি ফল। অনুরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই শিল্পের জগতে। জিজ্ঞাসু ব্যক্তি নিজেই খুঁজে নেবেন, এই আশায় আমি তালিকা বাড়ালাম না।

বলা আবশ্যক যে এই অনুসন্ধান যুক্তির পথ ধরে চলে না। এ জন্য দরকার শিল্পী-জনোচিত প্রজ্ঞা। সমকালীন শিল্পীদের ত্রুট কোথায়? বুদ্ধি-বিচারের উজ্জ্বল আলোতে তাঁরা শিল্পের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি লক্ষ করতে পেরেছেন, কিন্তু সেগুলি মুষ্টিমেয় কয়জন ছাড়া আর কেউই আয়ত্ত করতে পারেন নি। এর কারণ শিল্পী-জনোচিত প্রজ্ঞার অভাব। প্রজ্ঞার আলোকে বিজ্ঞান উজ্জ্বল, কিন্তু শিল্পী তাঁর নিজের সাধনক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত বলেই শিল্প-পরম্পরা আজ ম্রিয়মাণ। সমাজনীতি, রাজনীতি অনেক তাঁরা বোঝেন। কেবল অনুভব-শক্তি তাঁদের বদলে গেছে। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ হারিয়েছেন তাঁরা। এ জন্যই কালচক্র ঘুরে চলেছে অতি দ্রুতভাবে। স্থির হয়ে দাঁড়াবার, বসবার অবকাশ নেই। এইসব কারণেই একাগ্রভাবে অনুধাবন করার সুযোগ নেই। বিমূর্ত উপলব্ধির প্রতিকূল যা-কিছু সবই সমকালীন শিল্পীদের পথ আগলে দাঁড়িয়েছে।

শিল্পের বিমূর্ত গুণ আহরণের জন্য ইয়োরোপ ও আমেরিকার শিল্পীরা যে কঠিন সাধনা করেছেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমগ্র প্রাচ্যশিল্প থেকে তাঁরা তত্ত্ব ও তথ্য আহরণের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের এই অনুসন্ধানের আলো কেন ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হল না সেই প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করা যাক এইবার।

ভারতীয় শিল্প বহু শতাব্দী ধরে প্রবাহিত হয়েছে ভারতের জীবনে ও শিল্পে। সিন্ধু উপত্যকা থেকে শুরু ক'রে সমুদ্র উপকূল ধরে যদি বাংলাদেশ পর্যন্ত পৌঁছানো যায় তবে ভারতীয় শিল্পের মূল সূত্রটি আজও বেশ স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। ভারতীয় সমাজ, আদর্শ, ধর্মীয় সংস্কার, লৌকিক-অলৌকিক বিশ্বাস সব যুক্ত হয়ে ভারতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি-রূপে ভারতীয় শিল্পে এক অখণ্ড প্রতিমা-রূপ সৃষ্টি হয়েছে। এই যে শিল্পরূপ তার মধ্যে বিমূর্ত গুণের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তার•মূলে আছে ভারতীয় সাধনপদ্ধতি। এই সাধনপদ্ধতির প্রভাবে ভারতীয় শিল্প-নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকার অপেক্ষা ছন্দতেই প্রাধান্য পেয়েছে। এ জন্যই ঐ দুটি শব্দের বহুবার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি এ পর্যন্ত।

শিল্পী কারিগরদের হাতে একমাত্র গুপ্তযুগের শিল্প-নিদর্শন ছাড়া আর কোথাও বাস্তবতার স্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ করা যাবে না। এই কারণে ভারতীয় শিল্পের বিমূর্ত গুণ অনুসন্ধান কালে গুপ্তযুগের শিল্প সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন দেখি না।

প্রথমেই মনে পড়ে মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত ধাতুনির্মিত ক্ষুদ্র নারীমূর্তি। এই মূর্তিতে জ্যামিতির প্রভাব অপেক্ষা ছন্দের টান খুবই স্পষ্ট। এই স্থির মূর্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে সচলতার ভাব সমস্ত মূর্তিটিকে জীবন্ত করেছে। মনে হয় যে কোনো মুহূর্তে নৃত্যের হিল্লোলে মূর্তিটি সজীব হয়ে উঠবে। সচল-অচল তথা সক্রিয়-নিষ্ক্রিয় উভয়ের সংযোগ ভারতীয় শিল্পের প্রায় সকল নিদর্শনেই লক্ষ করা যাবে মধ্যযুগ পর্যন্ত।

এরপরে আমরা দেখি ভরহুত, সাঁচীর উৎকীর্ণ মূর্তি। উৎকীর্ণ জীবজন্তুগুলি বৌদ্ধ-ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত একথা আংশিক সত্য। এইমাত্র বলা চলে যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে এইসব জীবজন্তু বিদগ্ধ সমাজের সামনে এসেছে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে জীব-জন্তুর আত্মিক সম্বন্ধ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আমরা দেখে এসেছি। তাই বলতে হয় এইসব উৎকীর্ণ মূর্তি অথবা মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত শীলমোহরে উৎকীর্ণ জীবজন্তু মানুষের জীবনের অতি গভীর স্থান থেকে রস গ্রহণ করেছে।

এইসব মূর্তিতে শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। জাতকের গল্পে জীব-জন্তুগুলি যেমন নিজ-নিজ স্বভাবের দ্বারা জীবন্ত, কোনো স্বর্গীয় আদর্শ সে-ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় নি, অনুরূপভাবে রচিত হয়েছে ভরহুতের জীবজন্তু।

বৌদ্ধদর্শন অথবা বৌদ্ধধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড না জানলেও ভরহুত বা সাঁচীর শিল্পরূপ অনুসরণ করতে কারোই অসুবিধা হবে না। কারণ এক্ষেত্রে প্রতীকগুলির প্রবর্তন

করা হয়েছে ধর্মের বিশিষ্টতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। যেটি লক্ষণীয় সেটি হল নর-নারীর সতেজ জীবনপ্রবাহ। জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, জল, এই সমস্তের সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত এই অখণ্ড জীবন। জীবজন্তু, উদ্ভিদ, মানুষ সকলের সঙ্গে আত্মিক যোগের আদর্শ। যতদূর জানা যায় ভারতের আদিমতম নীতি-বিশ্বাস। এই বিশ্বাস ভারতীয় জীবন থেকে কোনো দিনই সম্পূর্ণ মুছে যায় নি।

ভারতের নৈতিক জীবন বহুদিক দিয়ে প্রকৃতির পূজার সঙ্গে জড়িত। মাটি, আকাশ, জল, বাতাস এই পঞ্চভূত অতি পবিত্র বলেই স্বীকৃত হয়েছে। ভারতের সমাজজীবনে, মহাভারতে লক্ষ্মীর আবাসস্থান-রূপে এগুলিকে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতীয় শিল্পীরা লক্ষ্মীর আবাসস্থান থেকেই তাঁদের শিল্পের উপাদান সংগ্রহ করেছেন বলেই কারিগর-সমাজে নিজ-নিজ উপাদান হাতিয়ারগুলিকে আজও পবিত্র বলে স্বীকার করা হয়। এই মনোভাবই ভরহুত বা সাঁচীর শিল্পরূপের অন্তর্নিহিত সম্পদ। বৌদ্ধ কাহিনী এই ধারণাকে হয়ত বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেছে, কিন্তু মূল আদর্শে ফাটল ধরে নি।

নৃত্যের সঙ্গে শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আমার এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে পূর্বে বর্ণিত শিল্প-নিদর্শনগুলির সাহায্যে নৃত্যের ক্রিয়া বিশেষ-ভাবে নির্ভর করে মেরুদণ্ড ও শ্রোণীচক্রের সক্রিয়তার ওপর। হাত-পা তথা প্রত্যঙ্গ-গুলির মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত হয় দেহের দ্যোতনা। এইভাবে দেহের প্রত্যেক সন্ধিস্থান সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রকাশিত হয় নৃত্যের ছন্দ।

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী ভারতের শিল্পের নিদর্শনগুলি লক্ষ করলে দেহ-ছন্দের এই বৈশিষ্ট্য সহজেই উপলব্ধি করা যাবে। ছিলে-বাঁধা ধনুকে যেমন একটা টান থাকে অনুরূপ টান মহেঞ্জোদড়োর কাল থেকে অন্তত মধ্যযুগের শিল্পকলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। মানুষ, জীব-জন্তু, উদ্ভিদ সকলের সঙ্গেই এই টানের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ লক্ষ করতে অসুবিধে হবে না।

ভারতীয় শিল্পের এই আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে প্রাচ্যসংস্কৃতির অবদান। গ্রীক পরম্পরার দ্বারা প্রভাবান্বিত শিল্প-সংস্কৃতিতে ভিন্ন রকমের উপাদান পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে জ্যামিতিক আকার, আলোছায়ার প্রয়োগ প্রধান। সে সম্বন্ধে পূর্বেই আমি বিশদ আলোচনা করেছি। গ্রীক শিল্প-পরম্পরার উত্তরাধিকারী রূপে আমরা রেনেসাঁস যুগের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

রেনেসাঁসের কাল থেকে শিল্পীরা অনুসন্ধান করেছেন আলোছায়া-যুক্ত আকারের

(Geometry aud Mass)। এই অনুসন্ধানের চরম পরিণামে দেখা দিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর অনুকরণ-ধর্মী বাস্তব শিল্প। আর আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পীরা কিভাবে নতুন পথের অনুসন্ধান করলেন এবং প্রাচ্যশিল্পের প্রভাব প্রতিফলিত হল, সেই ইতিহাসের আলোচনা পূর্বেই হয়েছে।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিল্পের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে-সিদ্ধান্তে আমি উপস্থিত হয়েছি সেই সিদ্ধান্তকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপনের জন্য কতকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি।

মহেঞ্জোদড়োর নারীমূর্তি, দক্ষিণ ভারতের ধাতুমূর্তি ও নটরাজ, মল্লপুরমের ভাস্কর্য, অনুরাধাপুরমের কপিল মুনি, বেলগোলার তীর্থংকর এবং সমগ্র জৈন চিত্রে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যাবে। এই সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে সেৎসু ও সোতাৎসুর রচনা কুকাইচির প্রসাধন (Scroll Painting)—এসব মূর্তি বা চিত্র যদি টুকরো ক'রে ফেলা যায় তাহলে প্রত্যেক অংশে কর্ষ-শক্তি লক্ষ করা যাবে। অপরদিকে গ্রীক পরম্পরা বা রেনেসাঁস-যুগের শ্রেষ্ঠ রচনা যদি দু'টুকরো ক'রে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে উপরের অংশ যতটা সজীব নিচের অংশ ততটা নয়—জড়বৎ বস্তু মাত্র। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, তবে ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এই দুর্বলতা আজও ইয়োরোপীয় প্রগতিবাদী শিল্পীরা সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে সক্ষম হন নি।

সমকালীন শিল্পীরা প্রাচ্যশিল্পের আঙ্গিক সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচারের পথে বহু তথ্য আহরণ করেছেন। কিন্তু সেই তথ্য তাঁরা নিজেদের সৃষ্টিতে কতটা প্রয়োগ করতে পেরেছেন সেটিও অনুসন্ধানের বিষয়। সমগ্র প্রাচ্যশিল্পের পরম্পরা প্রত্যক্ষ (Subjective) উপলব্ধির পথকেই অনুসরণ করেছে। অপরদিকে রেনেসাঁস-কাল থেকে ইয়োরোপের শিল্পীরা অনুসরণ করেছেন বস্তু-আশ্রিত (Objective) পথ। তাঁরা আবিষ্কার করেছেন আলো-বর্ণযুক্ত আকারের জগৎ। দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট ক'রে তোলার চেষ্টা করি।

জনৈক অভিজ্ঞ বাঙালী পটুয়ার পর্যবেক্ষণশক্তি কতটা অনুসন্ধানের জন্য তাকে একটা মোটরগাড়ি আঁকতে বলা হয়। পটুয়া সময় চাইল বিষয়টি ধ্যান ক'রে বুঝে নেবার জন্য। তারপর সে একখানা মোটরগাড়ির ছবি করল যে-ছবিতে মোটরের অনেক খুঁটিনাটি বাদ পড়ল। কিন্তু মোটরের Head Light, Steering, চাকা, Mudguard বাদ পড়ল না। অভিজ্ঞ পরীক্ষকরা আরও লক্ষ করলেন যে-খুঁটিনাটি বাদ পড়েছে সেগুলি পরিবর্তনের কোনো বিশেষ সুযোগ নেই সেই

ছবিতে। কারণ পটুয়া করলেন একটি গতিশীল গাড়ি—যার সাদৃশ্য আছে মোটরের সঙ্গে, কিন্তু মোটরের যথাযথ অনুকরণ নেই।

ঠিক এই বিষয়টি যদি কোনো আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীকে করতে বলা হতো তাহলে সে বলত জিনিসটি একবার ভাল ক'রে দেখে নিতে হয়, কিন্তু দেখে নেবার পর খুঁটিনাটি কিছুই বাদ পড়ত না। এই হল প্রাচ্য পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গির মোটা রকমের পার্থক্য।

টিসিয়ান, রুবেন্স, রেমব্রান্টের জগৎ প্রাচ্যশিল্পীদের কাছে অজানা থেকে গেছে। পাশ্চাত্য শিল্পের প্রভাবেই আধুনিক প্রাচ্যশিল্পে আলোর উজ্জ্বলতা আকার-যুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। অপরদিকে পাশ্চাত্য শিল্পীরা উপলব্ধি করেছেন ধারণা-প্রসূত রূপ-নির্মাণের আদর্শ, ছন্দ ইত্যাদি। এ পর্যন্ত হল তুলনামূলক ভাষার আলোচনা। এর সঙ্গে সুন্দর-অসুন্দরের কোনো প্রশ্ন নেই।

যত দূর জানি ভারতের কোনো জ্ঞানীগুণী শিল্পকলাকে কখনো সমাজ থেকে বহিষ্কৃত ক'রে দিতে চান নি। এ বিষয়ে কিছু উল্লেখও আমি করেছি। তবে এ-ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো একটু বিস্তারিত করা প্রয়োজন।

ভারতীয় শিল্পের আলোচনাকালে প্রায়ই শিল্পশাস্ত্রের উল্লেখ করা হয়। তবে এই সঙ্গে আর একটি কথাও আছে। সেটি হল ধ্যান। দেবদেবীর চিত্র বা মূর্তি-নির্মাণের প্রথম আবশ্যিক কর্ম ধ্যানের পথে বিষয়কে উপলব্ধি করা। শিল্পশাস্ত্র রচিত হবার বহু পূর্ব থেকে ধ্যানের পথেই শিল্প আত্মপ্রকাশ করেছে, মাটিতে, পাথরে এবং আরও বহুবিধ উপকরণে। পুঁথির পাতায় পর্যবেক্ষণ-প্রসূত যে তথ্য সেটি হুবহু অনুসরণ করাই শিল্পীর একমাত্র কর্তব্য নয়। তাই বলতে হয় ভারতীয় শিল্পের আধ্যাত্মিকতা শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ দ্বারা সীমিত নয়। সে আধ্যাত্মিকতার উৎস শিল্পী-জনোচিত ধ্যান, দার্শনিকের ভাষায় এক রকমের যোগ।

কারিগর যখন তীরের ফলা নির্মাণ করে তখন কারিগরের মন তীরের ফলার সঙ্গে যুক্ত হয়। অপরদিকে শুদ্ধ জ্ঞানের উপলব্ধি যাঁদের লক্ষ্য তাঁরা সমগ্র চিত্তবৃত্তিকে সংযত ক'রে ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হন। (সম্ভবত দৃষ্টান্তটি শংকরাচার্যের)। সকল রকমের সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করাই যোগ সাধনার লক্ষ্য। এই যাত্রার অন্যতম পদক্ষেপ রূপে শিল্পকলা এবং শিল্পীকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত টান, ছন্দ, রেখা ইত্যাদি শিল্পরূপের কতকগুলি উপাদান নিয়ে আলোচনা করেছি। বর্ণ ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে আবশ্যিক না হলেও চিত্রের জগতে বর্ণ ই সর্বপ্রধান। বলা যেতে পারে বর্ণের জগৎ সম্বন্ধে বিশিষ্ট উদ্দীপনা না জাগলে হয়ত মানুষ চিত্র রচনা করত না। ইতিহাসের আগের কাল থেকে চিত্র নির্মিত হয়েছে কতকগুলি নির্দিষ্ট বর্ণের সাহায্যে। আলোছায়ার চঞ্চল গতি কালো ও সাদা এই দুই চরম বিন্দুতে সীমাবদ্ধ ছিল।

এই আদর্শকে বলা যেতে পারে ধ্যানের দৃষ্টি। কালো-সাদার উদ্দীপনা প্রবর্তিত হয়েছিল দু-চারটি বর্ণের সাহায্যে। ক্রমে মানুষের জ্ঞান বাড়লো। প্রকৃতি-বিজ্ঞান-সম্মত পর্যবেক্ষণের শক্তি অর্জন করল। বহু রকমের রং দেখা দিল এবং দেখা দিল বর্ণপ্রয়োগ রীতির নতুন পর্যায়, যার সূচনা হল ইটালির রেনেসাঁস-যুগে।

চিত্রের ক্ষেত্রে আলোছায়ার রহস্য উদ্ঘাটন করার গৌরব পাশ্চাত্য শিল্পীদেরই অবদান। ক্রমে তৈল বর্ণের আবিষ্কারে চিত্রশিল্পীরা আরো ভালভাবে নিজের আদর্শকে আয়ত্ত করলেন এবং এক সময়ে চিত্রে ও বাস্তবে বিশেষ কোনো পার্থক্য রইল না। এরই নাম হল স্বভাবানুগত চিত্র। অদৃশ্য হল রেখাত্মক গুণ ও বর্ণের স্থিতিস্থাপক আবেদন। আলোছায়ার জটিল জাল থেকে Impressionist শিল্পীরা দেখলেন এবং দেখালেন শুদ্ধ আলোর জগৎ। অসাধারণ দেখবার শক্তি নিয়ে এইসব শিল্পীরা চোখধাঁধানো আলোর সামনে আমাদের উপস্থিত করলেন। জল, আকাশ, মাটি এইগুলির মধ্য দিয়ে তাঁরা আবিষ্কার করলেন জগৎ-জোড়া উজ্জল আলোর টান। প্রাচ্যশিল্পের রেখাত্মক টানের এ হল সম্পূর্ণ বিপরীত। দৃঢ়তা, নমনীয়তা ইত্যাদি বস্তু-আশ্রিত গুণগুলির দিকে এঁরা লক্ষ দেন না। ক্রমে আকারের দৃঢ়তা, বর্ণের উজ্জলতা স্থিতিস্থাপকতার দিকে দৃষ্টি পড়ল এবং দৈবক্রমে প্রাচ্যশিল্পের সঙ্গে পরিচয় ঘটল।

এরপর ধীরে ধীরে প্রাচ্যশিল্পের সঙ্গে পাশ্চাত্য শিল্পের পরিচয় কিভাবে ঘটেছে সে-আলোচনা পূর্বেই করেছি। এখানে বিষয়টি আর একটু বিস্তৃত করা যেতে পারে।

চোখের সামনে যা-কিছু আমরা দেখি সবই কালো-সাদার সংঘাতের মধ্য দিয়ে। সাদা পটভূমি বস্তু কালো, অথবা কালো পটভূমি বস্তু সাদা। দৃশ্য-জাত উদ্দীপনার এই হল ধারণার সৃষ্টি। যদি এই ধারণাকে আমরা সত্য বলে মনে না করতাম তাহলে লাল গোলাপ, সবুজ পাতা, নীল আকাশ শব্দগুলি ব্যবহার করতে পারতাম না, কারণ বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসায় এই রকম লাল, নীল বলা চলত না, তখন হাল্কা-

গাঢ় বর্ণের গতি অনুসরণ করতে হতো এবং শেষপর্যন্ত আমরা ধূসর আলোতে গিয়ে পৌঁছাতাম।

ধারণা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-প্রসূত জ্ঞান দুইয়ের মধ্যে এই হল তফাত। অভিজ্ঞতাকে বলি অন্তর্মুখী গতি এবং পর্যবেক্ষণ-প্রসূত জ্ঞানকে আমরা বলি বাস্তবমুখী গতি। প্রাচ্যশিল্পের আকার-প্রকার-রেখা যেমন ধারণার সঙ্গে যুক্ত তেমনি বর্ণপ্রয়োগের ক্ষেত্রে ছন্দের গতি-প্রকৃতি অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়েছে।

পাশ্চাত্য শিল্পীরা যে প্রাচ্যশিল্পের দিকে ঝুঁকেছিলেন তার অন্তরালে আঙ্গিকের অভিনবত্ব অপেক্ষা বিমূর্ত গুণের অনুসন্ধানই বোধ হয় অনেক বেশি সক্রিয়। বিমূর্ত গুণ বা উপাদান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দূরত্ব আজও দূর হয় নি।

দার্শনিক প্লেটো সর্বপ্রথম বলেছেন যে আকার সর্ব শিল্পের প্রাণস্বরূপ, বাকিটা প্রকৃতির অনুকরণ। সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে জ্যামিতিক আকারকে কখনো বিমূর্ত বলে স্বীকার করা হয় নি। অবশ্য জ্যামিতিক উপাদান চিত্রে বা মূর্তিতে স্থাপত্যের ভাব জাগায়। কিন্তু এভাবে প্রকৃতি-জাত বস্তুকে Plan-এর মতো নির্মিত করার আদর্শ কোনোদিনই প্রাচ্যশিল্পীরা গ্রহণ করে নি। পরিবর্তে সাদৃশ্য কথাটি আবশ্যিক বলে প্রাচ্যশিল্পে স্বীকৃত হয়েছে। একস্থানে আমি বলেছি বিমূর্ত উপলব্ধি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্বন্ধ ছাড়া আদর্শ শিল্প-রূপ নির্মিত হতে পারে না। এই সংযোগস্থলেই দেখা দেয় সাদৃশ্য।

পায়ে চলা, সাপের চলা, লতার বেড়ে ওঠার মধ্যে গতির ঐক্য সহজেই বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যায়। কিন্তু এগুলিকে জ্যামিতিক আকারে প্রবর্তিত করলে বস্তু থেকে ভিন্ন হয় না। কিন্তু যখন এই তিনটির মধ্য দিয়ে আর একটা বস্তু নির্মিত হয় তখন সেই বস্তুর রূপান্তর ঘটে এবং সেই মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করে সাদৃশ্য, অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিল্পীরা যাকে বলছেন বিমূর্ত, প্রাচ্যশিল্পীরা তাকে বলছেন রূপান্তর (Transformation)।

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন জাগছে যে স্পর্শের সাহায্যে যে-অভিজ্ঞতা আমাদের হয় দৃশ্যের সাহায্যে সেগুলিকে আমরা আকার বলে থাকি। অপরদিকে যখন সাদৃশ্য দ্বারা প্রকৃতিকে চিনি তখন আর সে বস্তু-আশ্রিত রইল না। অথচ

প্রকৃতির গুণ সেটিকে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার সীমায় নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করল। এই শ্রেণীর সৃষ্টি হল আকার, কিন্তু রূপ নয়।

Donatello-র ঢাল হাতে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে—এই মূর্তি সৃষ্টি হয়েছে বাস্তব সত্যের রূপান্তরের পথে। এই মুহূর্তে জ্যামিতিক আকারের কোনো অভাব নেই, তবু সেটি জ্যামিতিক। তৎসত্ত্বেও শুদ্ধ আকার নয়, আবার প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণও নয়। এই সৃষ্টি করার পথে শিল্পীকে স্বীকার করতে হয়েছে ছন্দ (গথিক শিল্প-পরম্পরা থেকে অনুরূপ দৃষ্টান্ত যথেষ্ট দেওয়া যায়)। ব্যতিক্রম থাকলেও সমকালীন শিল্পীরা এই সাদৃশ্যের জগৎকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে নি। বহুরকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও শিল্পীরা বস্তু-আশ্রিত উদ্দীপনাকেই একমাত্র সর্বপ্রধান অবলম্বন বলে স্বীকার করেছেন এবং এই বাস্তব উদ্দীপনারই চরম পরিণতি ঘটেছে তথাকথিত বিমূর্ত জ্যামিতিক আকারে। ক্রমে সমাজসচেতন শিল্পীরা বিশেষ রকমের সামাজিক উপাদান শিল্পে প্রবর্তিত করবার চেষ্টা করেছেন এবং বিমূর্ত আকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অভিজ্ঞতার সাহায্যে স্বভাবানুগত ভাবকে কিছুটা বিমূর্ত-ধর্মী করতে সক্ষম হয়েছেন। এই সব রচনার সঙ্গে ভারতীয় চিত্র বা মূর্তির তুলনা করলে সাদৃশ্য বলতে আমি কী বুঝেছি সেটি আর একটু স্পষ্ট হবে।

এ পর্যন্ত আমি শিল্পের ভাষা সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি সেক্ষেত্রে বর্ণ সম্বন্ধে কিছুই প্রায় বলা হয় নি। এ যেন অন্ধকারে হাতড়ে খুঁজে বেড়ানো। চোখের সামনে আলো যদি থাকতো তাহলে হয়ত এইভাবে আলোচনা করতাম না। ব্যক্তিগত এই কথাটি বলার উদ্দেশ্য হল এই যে প্রত্যেক শিল্পীর সৃষ্টিতে এবং সমালোচকের বিচারে এইরকম একপেশে ভাব থেকে যেতে বাধ্য। কারণ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছুটা ব্যক্তিগত রুচি, মেজাজ এবং অবস্থার প্রভাব রয়েছে। নৈর্ব্যক্তিক সৃষ্টি হয় না এবং সমালোচনাও করা যায় না। এইজন্য রংএর কথা অন্তরালে রয়ে গিয়েছিল, এইবার বিষয়টিকে সামনে উপস্থিত করা গেল।

যার দৃষ্টিশক্তি আছে তাকে আলো কী, একথা বলবার প্রয়োজন হয় না। আলো যেমন আছে তার সঙ্গে রংও আছে। রং আছে পাতায়, ফুলে, প্রজাপতিতে, জলে, স্থলে, আকাশে। মোট কথা, দৃশ্যের জগতে রং আর আলো যুগপৎ মিলেমিশে আছে। মূর্তিকার আলোর সাহায্যে সৃষ্টি করে আয়তনযুক্ত আকার। বর্ণ তার পক্ষে

আনুষঙ্গিক হতে পারে, কিন্তু আবশ্যিক নয়। অপরদিকে চিত্রকল্পের পক্ষে বর্ণ আবশ্যিক। কালোর উপর সাদা অথবা সাদার উপর কালো বর্ণে এই চরম সীমা লঙ্ঘন করা অসম্ভব।

কর্ষ-শক্তি বাঁধা পড়ে ছন্দে, ছন্দ প্রকাশ পায় রেখাতে। এই রেখাকে প্রবর্তিত করার জন্যই চিত্রে প্রবর্তিত হয়েছে কালো, লাল ইত্যাদি রং। এইভাবে আলো এবং রং-এর সাথে যে অঙ্গাঙ্গি যোগ সেটা বিচ্ছিন্ন হয়েছে প্রাচ্যশিল্পে। প্রাচ্যশিল্পে আলোছায়ার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে রং-কে দেখা হয় নি। সেক্ষেত্রে আছে উজ্জ্বলতা এবং গাঢ়তা। এ ক্ষেত্রে সাদা আলোর প্রতীক, কালো ছায়ার প্রতীক। অর্থাৎ, প্রাচ্যশিল্পের বর্ণ একরকমের প্রতীক, কিন্তু প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ বা অনুসরণ নয়।

রেনেসাঁস-যুগে আলোছায়ার চর্চা প্রধান হয়ে দেখা দেয়। আলোছায়ার দ্বন্দ্বে ঘনত্বযুক্ত আকার সৃষ্টি করাই রেনেসাঁস-শিল্পীদের বিশেষ অবদান। পার্সপেক্‌টিভ কথাটির সঙ্গে এখন প্রায় সকলেই পরিচিত। পার্সপেক্‌টিভ প্রাচ্যশিল্পে ছিল না, পাশ্চাত্য শিল্পীরাই এই বিষয়টির প্রবর্তক—একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। যখন আমরা পথ চলি তখন আশপাশের বস্তুর সঙ্গে একরকমের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এও একরকমের পার্সপেক্‌টিভ। এর নাম দেওয়া যেতে পারে জ্যামিতিক পার্সপেক্‌টিভ। অপরদিকে যখন দরজায় দাঁড়িয়ে সেই একই দৃশ্য দেখি তখন আমরা লক্ষ করি কেমনভাবে সামনের দৃশ্য ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে দূরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এ হল আর একরকমের পার্সপেক্‌টিভ। যার নাম দেওয়া হয়েছে 'Aerial Perspective'। রেনেসাঁস-শিল্পীরা এই 'Aerial Perspective'-এর প্রবর্তক?

এখন সহজেই আমরা অনুমান করতে পারি পাশ্চাত্য শিল্পীরা কেন আলোছায়ার মধ্যে বস্তুকে দেখেছিলেন। তাঁদের কাছে রং একটা স্থির বস্তু নয়। প্রত্যেক রং ক্রমবিবর্তনের পথে আলো ও অন্ধকারে লীন হয়ে যাচ্ছে। এইটে তাঁদের লক্ষ করবার বিষয় ছিল। এই পথ ধরেই পাশ্চাত্য শিল্পে বাস্তব অনুকরণের স্পৃহা জেগেছে। যেমন স্বভাবের চরম পরিণতি হল উনবিংশ শতাব্দীর অ্যাকাডেমিক শিল্পে। এই আলোছায়ার খেলা নিয়ে শিল্পীরা এমনই মত্ত হলেন, তাঁদের ভাস্কর্য হয়ে উঠল আলো ধরার ফাঁদ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অঙ্কে দেখা দিল Impressionism আন্দোলন। নতুন আদর্শের শিল্পীরা আলো-ছায়ার পরিবর্তে অনুসরণ করবার চেষ্টা করলেন আলোর

জগৎ। তাই আয়তন-যুক্ত আকার গৌণ হয়ে উঠল। বিভিন্ন সময়ের আলোতে একই জিনিসের কিরকম আবেদনের পরিবর্তন ঘটে সেটাই তাঁরা গভীর মননশীলতার সাহায্যে অনুসন্ধান ক'রে চললেন। ইস্পাতের টানের মতো শক্তিশালী এক আলোর জগৎ তাঁরা আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন। মোট কথা, ছায়া থেকে আলো মুক্তি পেল। কিন্তু এর পরে আর বেশিদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি শিল্পীদের পক্ষে। কারণ কতকগুলি অত্যাবশ্যক ভাষাগত উপাদান তাঁরা প্রবর্তন করতে সক্ষম হলেন না। এই সময় প্যারিসের শিল্পীসমাজে দেখা দিল জাপানি উড্‌কাট প্রিণ্টের প্রভাব। আলোছায়ার সংঘাত-বর্জিত বর্ণের যে একটি নিজস্ব অস্তিত্ব আছে কালো-সাদার সাহায্যে তা প্রকাশ করা সম্ভব। বোধ হয় এই কথাটির ইঙ্গিত পেলেন প্যারিসের শিল্পীরা জাপানি কাঠ খোদাইয়ের ছাপা ছবির দৃষ্টান্ত দেখে। এইবার শিল্পীরা অগ্রসর হলেন শুদ্ধ বর্ণের জগৎ আবিষ্কার করতে। ইয়োরোপের মিউজিয়ামে প্রাচ্যশিল্পের নিদর্শনগুলি তাঁরা অভিনিবেশ সহকারে দেখলেন এবং নিজেদের রচনাতে প্রবর্তনের চেষ্টা করলেন। আলোছায়ার খেলা, Aerial Perspective-এর যুগ শেষ হল।

নিগ্রো ইত্যাদি আদিম শিল্পের প্রভাবে বিমূর্তবাদের আবির্ভাব সম্বন্ধে ইতিপূর্বে প্রয়োজনীয় তথ্য আমি উপস্থিত করেছি। বর্ণপ্রয়োগের সঙ্গে এই আদর্শের সম্বন্ধ একটু বিচার করা যেতে পারে। বিমূর্তবাদের প্রধান অবদান হল গতানুগতিক শিল্পাদর্শের মূলে কুঠারাঘাত। এইভাবে আকার-প্রকারের সঙ্গে বর্ণের সম্বন্ধ রীতিমতো বদলে গেল। রাধা দুধ দুইছেন পেছন ফিরে আর তাঁর মুখ ফিরে তাকাচ্ছে দর্শকের দিকে (রাজপুত চিত্র)—এইরকম অদ্ভুত অ্যানাটমি রেনেসাঁস-পরবর্তী শিল্পীরা কল্পনা করে নি। কিন্তু বিমূর্তবাদ অনুরূপ কল্পনাকে সহজেই স্বীকার করল। ঠিক সেইভাবে বর্ণ-প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তারা বিমূর্তগুণ স্বীকার করল। অর্থাৎ বস্তুর সঙ্গে বর্ণের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ সেটিকে তারা বদলে দিতে চেষ্টা করল। এরই অপর নাম হল Symbolic Colour। মোট কথা, সকল দিক দিয়েই বিমূর্তবাদ হল সর্বজনস্বীকৃত। যদিও বিমূর্তবাদ প্রতিষ্ঠিত হল প্রাচ্যশিল্পের প্রভাবে, তৎপ্রসঙ্গ ক্রমে বলা প্রয়োজন। এই মুহূর্তে বিজ্ঞান কখনোই বলবে না যে জ্যামিতিক আকারের দ্বারাই এই সৌর জগৎ নির্মিত হয়েছে। কাজেই বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেখলেও আমরা বলব জ্যামিতিক আকার নিরাভরণ প্রকৃতির একটা রূপমাত্র, তার বেশি কিছু নয়। প্রাচ্য মতে এই আদর্শে খুব বড় রকমের কোনো মূল্য নেই। সন্নিকর্ষ, ছন্দ এইগুলি

প্রাচ্যশিল্পে বিমূর্তগুন বলা হয় এবং সাদৃশ্যের দ্বারা এই বিমূর্তগুণগুলি প্রকাশিত হয়। সাদৃশ্য কথাটির যথাযথ উল্লেখ পাশ্চাত্য শিল্পের আলোচনায় বিশেষ কোথাও লক্ষ করি নি এবং যদিও কোথাও এর উল্লেখ থেকে থাকে তবে সাদৃশ্যকে বিমূর্তের স্থান দেওয়া হয়েছে, এ কথা বলা যায় না। এই কারণে সাদৃশ্য সম্বন্ধে একটু উল্লেখ করা দরকার। প্রসঙ্গক্রমে পূর্বে আমি বলেছি যে বিমূর্ত এবং বাস্তব উভয়ের সংযোগে যে রূপ আত্মপ্রকাশ করে তারই অপর নাম সাদৃশ্য। সংক্ষেপে, কোনো শিল্প-রূপই সম্পূর্ণ শুদ্ধ বাস্তব হতে পারে না। ইয়োরোপ বিমূর্ত বলতে বস্তুরূপে বিশ্লেষণ করেছে, এবং কতকগুলো মৌল আকারকে বিমূর্ত বলে স্বীকার করেছে। সমগ্রভাবে দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণমূলক। প্রাচ্যে বিমূর্ত বলতে বিশেষ উপলব্ধিকে বুঝেছে। এ হল নতুন রকমের অভিজ্ঞতা বা নতুনের চেতনা।

জীবনদর্শনের সঙ্গে এই ধারণার সম্বন্ধ যতটা, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের সঙ্গে ততটা নয়। চীনা নন্দনশাস্ত্রে 'চী' এবং ভারতীয় 'সাদৃশ্য' উভয়েরই লক্ষ এক। ভারতীয় শিল্প-আলোচনার ক্ষেত্রে সাদৃশ্য বলতে অনেকেই মরালগ্রীবা, কর-পল্লব, পদ্মপলাশলোচন ইত্যাদি শব্দগুলিকে সাদৃশ্য বলে মনে করেছে। এইগুলি ঠিক সাদৃশ্য নয়। সাদৃশ্যের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। এগুলিকে রূপ সাদৃশ্য বলাই সংগত। ভাবে ও রূপে যে অখণ্ড উপলব্ধি, সেটিকেই সাদৃশ্য বলা সংগত— সৌরজাগতিক অভিজ্ঞতা উপলব্ধির এক অভিনব প্রকাশ।

পাশ্চাত্য দেশে বা ইয়োরোপে শিল্পীদের মধ্যে এই অভিজ্ঞতা ছিল না এমন কথা নয়। বৈজ্ঞানিক প্রভাবে এই পথ ছেড়ে শিল্পীরা বিশ্লেষণের পথে আবিষ্কার করলেন জ্যামিতিক বিমূর্ততা। এই নতুনতর বিমূর্তবাদ সম্বন্ধে এই মুহূর্তে কিঞ্চিৎ সন্দেহ জেগেছে। এই জন্যই তাদের অতি-আধুনিক রচনার মধ্যে সাদৃশ্যের ইঙ্গিত লক্ষ করতে অসুবিধে হয় না। কেবলমাত্র বিমূর্ত আকার নির্মাণের দ্বারা বিচারবুদ্ধির চর্চা হতে পারে, কিন্তু শিল্পীর দায়িত্ব এই পথে সার্থক হয় না। এই জাতীয় কথা সম্প্রতিকালের কোনো কোনো লেখকের পুস্তকে লক্ষ করেছি। মোট কথা, বিমূর্ত এবং বাস্তব উভয় উপাদানেরই প্রয়োজন, এই বিষয়ে এখন বোধ হয় আর কোনো মতভেদ নেই।

এ পর্যন্ত নানাভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের যে তুলনা করেছি তাতে প্রাচ্য-শিল্প পাশ্চাত্য শিল্পের চেয়ে বড় কি ছোট সেকথা আমি মনে রাখি নি। এক জায়গায় বলেছি যে ধূমকেতুর মতো অতীতের আদর্শ ঘুরে ঘুরে আসে; সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে

যায় না। প্রয়োজনের দ্বারা চালিত বহু সামাজিক আদর্শ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন এবং শক্তিহীন হয়ে যেতে পারে। আমার এই কথা প্রমাণ করার জন্যই এই আলোচনার প্রয়োজন হল।

এপর্যন্ত পাশ্চাত্য শিল্পে প্রাচ্যের প্রভাব সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি। কিন্তু প্রাচ্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কোনো আলোচনাই করা হয় নি। এই আলোচনার মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের প্রভাব অনুমান করা যাবে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই ইউরোপীয় চিত্র-ভাস্কর্যের সঙ্গে এশিয়াবাসীর চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত অনুকরণের পথে পাশ্চাত্য শিল্পকে আয়ত্ত করার চেষ্টা হয়। তারপর প্রতিক্রিয়ার যুগ দেখা দেয়। ক্রমে ইয়োরোপের আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার খবর পৌছায় এদেশে। মুষ্টিমেয় শিল্পী এই নতুন ভাবধারা আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন। এরপর শিল্প ও সাহিত্যের আরো ছোটখাটো পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। কিন্তু এ হল ইতিহাস মাত্র। আমার এই আলোচনা শুরু করছি ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষার যে নতুন পর্যায় তারই অন্যতম প্রক্ষেপ শিল্পশিক্ষা। ইতিপূর্বে পাশ্চাত্য শিল্পের নতুন আন্দোলন সম্বন্ধে সাধারণভাবে শিল্পী ও শিল্প-রসিকরা সচেতন হয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর এই নতুন আদর্শকে গ্রহণ করার সুযোগ ঘটল। শিল্পশিক্ষার পুরাতন পদ্ধতির বিশেষ কোনো পরিবর্তন যদিও ঘটল না, কিন্তু নতুন শিক্ষা নতুন আদর্শে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হল। এই নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাবে আধুনিক শিল্পের আকার-প্রকার, আঙ্গিক, এবং নানা তথ্য আহরণ করবার সুযোগ পেলেন শিল্পীরা।

এই মুহূর্তে ভারতের প্রধান শহরগুলিতে যেসব শিল্পী কাজ করছেন, তাঁদের মধ্যে সহজেই লক্ষ করা যায়, ইয়োরোপ ও আমেরিকার সকল রকমের শিল্পরীতির প্রভাব। নতুন শিল্পীসমাজের সঙ্গে দেখা দিয়েছে ডিলার, বিচারবুদ্ধিপুষ্ট সমালোচক। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বাৎসরিক প্রদর্শনী, ব্যক্তিগত শিল্পীদের ছোট ছোট অসংখ্য প্রদর্শনী, সরকারীভাবে শিল্পবস্তু কেনবার ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও বিদেশে থাকার ব্যবস্থা—সংক্ষেপে, অতি দ্রুতভাবে সমকক্ষ ক'রে গড়ে তোলার চেষ্টার অভাব নেই। পরিকল্পনা ব্যবস্থা ইয়োরোপ-আমেরিকার মতো পরিপাটি না হলেও যতটা

অগ্রসর হয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। ইংরাজ আমলে প্রদর্শনী এবং বৃত্তি ইত্যাদির কিছু ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তার প্রভাব তৎকালীন শিল্পীসমাজে যৎসামান্য। যান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার সাহায্যে শিল্পের উন্নতি কতটা ঘটে সে বিষয়ে পৃথিবীব্যাপী সন্দেহ জেগেছে। বিধি-ব্যবস্থার সাহায্যে অবশ্যই শিল্পবস্তুকে জনপ্রিয় করা যায়। এবং শিল্পীদের অন্নবস্ত্রের সমস্যারও সমাধান অবশ্যই হয়। কেবলমাত্র অনুকরণের সাহায্যে বিশেষ কোনো লাভও যে হয় না, তা আমরা উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস থেকে জেনেছি। বর্তমানেও যে সেই সমস্যা সম্পূর্ণ দূর হয়েছে এমন বলতে পারি না। কেবল পার্থক্য এই. ইয়োরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ হওয়ার কারণে ভারতীয় শিল্পীরা নিজেদের অবস্থা আগের চেয়েও সহজে অনুভব করতে পারছে। আজকের সর্বত্রই আন্তর্জাতিকতার যেমন প্রয়োজন আছে, জাতীয়তার তেমনই প্রয়োজন। জাতীয়তার পরিবেশ আছে বলেই ফরাসি থেকে মাকিন এবং মার্কিন থেকে জাপানি শিল্পের রং-রেখা, ঘনত্ববোধ এবং চিত্র-নির্মাণরীতির মধ্যেও ইতরবিশেষ ঘটেছে। আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের রচনাতে এই স্বকীয়তা কতটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সে-বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলতে হলে যে পরিমাণ অনুসন্ধান দরকার আমার পক্ষে সে অনুসন্ধান করা সম্ভব হয় নি। এই কারণে এ-বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত মত আমার পক্ষে দেওয়া সংগত নয়।

রুশ বিপ্লবের খবর প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমাদের দেশে পৌঁছেছিল ধনী-দরিদ্রের সংঘর্ষ, পুঁজিবাদী সভ্যতা ইত্যাদি দলগত বাঁধা বুলিগুলি লেনিন, কার্ল মার্কস ইত্যাদির নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজে দেখা দিয়েছিল সর্বপ্রথম। সে সময় রুশ বিপ্লব এবং নতুন সমাজ সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা পৃথিবী জুড়ে চলেছে। কাজেই সে-বিষয়ে নির্ভরযোগ্য খবর এবং শিক্ষাব্যবস্থা, শিল্পসাহিত্য সম্বন্ধে নতুন আদর্শবাদীদের মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দেশে ভালভাবে পৌঁছাতে পারে নি। ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে সমাজবাদের প্রভাব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের ঘটনা।

এবার সোজাসুজি সমকালীন সমাজবাদী শিল্পীদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা গেল। পূর্বেই বলেছি যে হাতুড়ি ও কাস্তে, এই প্রতীককে কেন্দ্র করেই কমিউনিস্ট রাশিয়ায় শিল্প গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশের শিল্প-আলোচনাতে

এই প্রতীকটি স্মরণ রাখা দরকার। সমাজবাদী শিল্প অনেক পরিমাণে তথ্যনির্ভর। এবং তথ্য সংগ্রহ করবার দু'টি উপায়। একটি পুস্তক-পত্রিকার সাহায্যে, অপরটি সমাজের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পথে। আমাদের দেশে যারা কমিউনিস্ট শিল্পী নামে পরিচিত তাঁদের লেখাপড়া এবং তর্ক করবার শক্তি যথেষ্ট। কিন্তু যে-সমাজের দুঃখবেদনা প্রকাশ করতে তাঁরা চাইছেন সেই সমাজের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় কতটা? যতদূর আমি জানি, এইসব শিল্পীরা সকলেই শহরবাসী। গ্রামের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। কাজেই তাঁদের পুস্তক-পত্রিকার আশ্রয়েই শিল্পের বিষয় ও বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়। ভারতের অসংখ্য পল্লীর অভ্যন্তরে যে জীবনপ্রবাহ চলেছে তার সঙ্গে শহরবাসী কমিউনিস্ট শিল্পীদের অন্তরের যোগ কতটা, আমি বলতে পারি না। তবে তাঁদের কার্যকলাপ দেখে মনে হয় এ-দিকটা তাঁরা ভাল ক'রে দেখেন নি বা অনুভব করেন নি।

এই প্রসঙ্গে তান্ত্রিক আর্টের নবপর্যায় সম্বন্ধে উল্লেখ করতে হয়। আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গরূপে তন্ত্রমন্ত্রের প্রচার যেমন প্রাচীন তেমনই তার প্রভাব ভারতের ধর্ম ও সমাজজীবনেও দেখা যায়। তন্ত্রসাধনার সাথে যুক্ত কতকগুলি প্রতীক এবং কতকগুলি প্রতিমা রূপ পাওয়া যায়। বিমূর্তগুণসম্পন্ন তন্ত্র-শিল্পের আবেদন সহজেই আধুনিক মনোভাবাপন্ন শিল্পীদের আকৃষ্ট করেছে। সেই সঙ্গে ভারতের সমাজেও বিশিষ্ট আবেদন যাঁরা অনুভব করেছেন তাঁরাই এই শিল্পরীতির বিচার-বিশ্লেষণ করে কিছু আহরণ করার চেষ্টা করেন। নৈষ্ঠিক কমিউনিস্ট যাঁরা, তাঁরা নিশ্চয় এই ধর্মাবৃত আধ্যাত্মিকবাদী শিল্পকে বুর্জোয়া সমাজের সৃষ্টি বলে বর্জন করবেন। তাই যাঁরা 'কমিউনিস্ট' না হয়েও সমাজের অন্তরে প্রবেশ করতে চান, আজ তাঁরাই এই শিল্পের ধারক ও বাহক। যে-রূপ যে-প্রতীক ধ্যানের বস্তু সেই রূপ ও সেই প্রতীক বাস্তব উদ্দীপনার পথে উপলব্ধি করা কতটা সম্ভব, সেকথা যাঁরা এই পথের পথিক তাঁরাই বলতে পারবেন। তবে এইসব শিল্পীরা যে সমাজ-সচেতন মন নিয়েই শিল্পসৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমাজের আশ্রয় ছাড়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয় না। কিন্তু যদি অন্নবস্ত্রের সমস্যা না থাকে তবে মানুষ সমাজের বাইরে যেতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিল্পীরা অনেক পরিমাণে সমাজের বাইরে থাকতে পেরেছেন। যেমন চীন, জাপানের জেন-ধর্মাবলম্বী শিল্পীরা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁদের সমাজ আশ্রয় দিয়েছে। কাজেই এই শ্রেণীর শিল্পীদেরও সম্পূর্ণ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বলা চলে না। জীবনের গভীর তাৎপর্য

উপলব্ধি করার সুযোগ এইভাবে তাঁরা পেয়েছিলেন। প্রশ্ন হল, সমাজের অন্তর ও বাহির দুই দিকের অস্তিত্ব স্বীকার করবেন, না কেবল বহিরাঙ্গনেই আমরা সন্তুষ্ট থাকব?

স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে যে শিল্প-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল সে-আন্দোলনের পরিণাম কি হল জানতে পারলে সাম্প্রতিক শিল্পের মূল্যবিচার আর একটু সহজ হতো। যে-বাস্তববাদ ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত আর্ট স্কুলগুলিতে প্রবর্তিত হয়েছিল, তার কোনো বিবর্তন ঘটে নি এবং বিবর্তনের সম্ভাবনাও নেই। যেটুকু বিবর্তন সম্ভব হয়েছে তা সাম্প্রতিক শিল্পীদের প্রভাবে। এরপর ভারত-শিল্পের নবজাগরণের যুগ। এই যুগের যাঁরা পথিকৃৎ তাঁদের সকলেরই নাম আজ সুপরিচিত। এই যুগে দু'টি বিরুদ্ধ মনোভাব আমরা লক্ষ করি। অবনীন্দ্রনাথের 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ শিল্পসৃষ্টির উপযুক্ত স্বাধীন পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেছেন। শিল্প যে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে পারে না, এই হল তাঁর মূল বক্তব্য। অপরদিকে দেখি তাঁর প্রধান অনুবর্তীদের মধ্যে একজন বলেছেন, 'অবনীন্দ্রনাথ যা করেছেন তারপর নতুন ক'রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আর কোনো প্রয়োজন নেই।' (অসিতকুমারের 'রবিতীর্থ' পুস্তকের শেষ অংশ দ্রষ্টব্য)। দুর্ভাগ্যক্রমে অবনীন্দ্রনাথ অপেক্ষা অসিতকুমারের এই উক্তি জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে গ্রহণ করলেন অবনীন্দ্র-পন্থী বহু শিল্পী। আশ্চর্যের বিষয় এই, যাঁরা নিজেদের ভারতীয় শিল্পী বলে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন, তাঁরা উপযুক্ত অভিনিবেশ সহকারে ভারতীয় শিল্প দেখলেন না। কাজেই তৈরি হল আর একটি আবর্ত, যেমন ঘটেছিল ইংরাজি আর্ট স্কুলের প্রভাবে। সাম্প্রতিক কালে শিল্পীদের অনেকেই ভারতীয় শিল্প দেখেছেন এবং বোঝবার চেষ্টাও তাঁদের করতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। কিন্তু ভারতীয় শিল্প থেকে বিশেষ কোনো উপাদান তাঁরা সাম্প্রতিক কালের উপযুক্ত ক'রে আয়ত্ত করেছেন কিনা বলা কঠিন। সকল দিক দিয়ে আলোচনা করলে আমরা লক্ষ করব সাম্প্রতিক কালের ভারতীয় শিল্প একরকমের অ্যাকাডেমিক আর্ট। কারণ তাঁরা হলেন বিশেষ প্রথার অনুগামী। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতীয় সাহিত্যের যে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে, তুলনায় ভারতের শিল্প অনুরূপ বিস্ময়কর কোনো পরিবর্তন আনতে পারে নি। একই প্রভাবের কেন এই বিপরীত পরিণাম? সাহিত্যের পাঠক যেমন অধিক তেমনি তারা ছড়িয়ে রয়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। আধুনিক ভারতীয় শিল্প কোনোদিনই সাহিত্যের মতো জনপ্রিয় হয় নি। ভারতীয়

শিল্প আজও প্রধানত শহরের ধনী বা বর্ধিষ্ণু সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বৃহৎ সমাজ আধুনিক শিল্পের খবর কতটুকু জানে? সাহিত্যের ভাষা শিক্ষিত ভারত-বাসীকে আয়ত্ত করতে হয়েছে প্রয়োজনের দাবিতে। কাজেই শব্দাশ্রিত ভাষার গতিপ্রকৃতির কিছু খবর তাঁরা জানেন। কিন্তু শিল্পের ভাষা শিক্ষিত সমাজের না জানলেও চলে। ডাক্তার, উকিল, কলেজের অধ্যাপক, স্কুলের শিক্ষকদের শিল্পের ভাষাজ্ঞান নেই বললেও চলে।

সাহিত্যে যেমন শ্রেণীভাগের একটা চেষ্টা সভ্যজগতে সর্বত্র আমরা দেখতে পাই, তেমনি শিল্পেরও বিভিন্ন দিক থেকে শ্রেণীভুক্ত করার চেষ্টা দেখা যায়। এদিক দিয়ে চারু ও কারুকলার কথাই প্রধানত মনে পড়ে।

যদি ভাষার দিক দিয়ে অনুসন্ধান করি তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কিছুই নেই বলা চলে। একখানা অয়েল পেন্টিং হোক বা একটা ধাতু-পাত্রই হোক, উভয়ের নির্মাণগত উপাদানে কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। তবে পার্থক্যটা কোনদিক দিয়ে? এই পার্থক্য কি স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম? আমাদের সকল কর্মের সঙ্গে পরিশ্রম জড়িত রয়েছে। মানুষের নির্মিত সকল বস্তুকেই পরিশ্রমের অবদান বলে গ্রহণ করা যায়। তবে দেখতে হয় উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে। এক-এক উদ্দেশ্যে এক-এক জিনিস তৈরি হয়। এই দিক দিয়ে ভাবের তাগিদে যে-বস্তু তৈরি হয় সেটিকে আমরা বলি চারুকলা। অপরদিকে নিত্যপ্রয়োজনের তাগিদে যা তৈরি হয় তাকে আমরা সচরাচর বলে থাকি কারুকলা। মোটামুটি এই সংজ্ঞা অনুযায়ী চারুকলা-কারুকলা বিচার করেন শিল্প রসিক।

কথোপকথন প্রসঙ্গে রোদ্যাঁ আনাতোল ফ্রাঁসকে বলেছিলেন, একটা ডিকেন্টার এবং গথিক-ক্যাথিড্রালের মধ্যে তিনি কোনো পার্থক্য দেখেন না। অপরদিকে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভিনাস মূর্তি ও একখানা ভাল তলোয়ারের মধ্যে সৌন্দর্যগত কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য নেই, একথাও যেমন সত্য, তেমনি পার্থক্য আছে একথাও মিথ্যে নয়। ভাষাগত উপাদানের দিক দিয়ে উভয়কে অভিন্ন বলতে আমরা বাধ্য। নির্মিতির পরাকাষ্ঠার দিক দিয়েও উভয়কে একই পর্যায়ে রাখা চলে। সৌন্দর্য-তত্ত্ব ও দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রভাবেই চারু ও কারুকলার পার্থক্য প্রবল হয়ে উঠেছে। এ হল বিশ্লেষণধর্মী শিক্ষার অবদান। এই করণে সৌন্দর্য কী, মানুষের জীবনের সাথে

তার কি সম্পর্ক, এগুলিকে কেন্দ্র করেই চারু ও কারুকলার মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তৈরি হয়েছে। এবং এই ব্যবধানের কারণে শিল্পের দুই দিকেরই ক্ষতি হয়েছে। কারণ একে অন্যের পরিপূরক। জটিল তথ্যের মধ্যে প্রবেশ না ক'রে সোজা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌছব দেখা যাক। আওরঙ্গজেব-পরবর্তী চিত্র-কলার প্রাণশক্তি যখন ক্ষীণ হয়ে আসছে, সে সময় ভারতে কারুকলার নবযুগ দেখা যায়। জীবনে সকল-রকম প্রয়োজনের সঙ্গে কারুকর্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এই সময়ে আমরা লক্ষ করি। চিত্রে ভাব ও সৌন্দর্যের মলিনতা এবং কারুকর্মে তার উজ্জ্বল প্রকাশ সহজেই রসিক ব্যক্তি লক্ষ করবেন। অর্থাৎ শিল্পের বিশেষ এক অংশ মৃতকল্প হলেও জাতিগত ও কালগত সৌন্দর্যবোধ নিস্তেজ হয়ে যায় নি। অনুরূপ দৃষ্টান্ত আমরা Ming-যুগ থেকেও পেতে পারি।

এইবার টেক্‌নোলজিক-যুগের চারুকলা ও কারুকলা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার। তথাকথিত চারুশিল্পে গতিপ্রকৃতি, আঙ্গিক ইত্যাদি সম্বন্ধে মোটামুটি যা বলবার তা আমি বলেছি। এইবার সাম্প্রতিক কালের কারুকলার অবস্থা-ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

বস্ত্র, অলংকার, গৃহশয্যা, তৈজসপত্র, যানবাহন—এগুলি পূর্বের তুলনায় সম্পূর্ণ নিরাভরণ ও বাহুল্যবর্জিত। সোজা কথায় যাকে বলে ছিমছাম্। নিরাভরণ নিরলংকার কারুকলার সঙ্গে আগের দিনের কারুকলার তুলনা ক'রে আজও অনেকে মনে করেন যে আধুনিক কারুকলার মধ্যে আগের দিনের সৌন্দর্য নেই। সৌন্দর্যবোধ চলে গেছে, এই কথা ভেবে তাঁরা দুঃখ করেন।

আমার গুরুস্থানীয় কোনো শিল্পী অনুরূপ মনোভাব দীর্ঘকাল পর্যন্ত পোষণ করতেন। একদিন দেখি তাঁর হাতে একটি টিনের Container। তিনি আমাকে তাঁর হাতের টিনের কৌটোটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, দেখ কি চমৎকার এর প্রপোরশান। কি রকম রংয়ের Combination, কি রকম রংয়ের পরিমাণবোধ, হরফ সাজানোর কি কায়দা, সুন্দর জিনিস হিসেবে রাখতে ইচ্ছে করে। রোদ্যাঁ ও অবনীন্দ্রনাথ বোধ হয় একই কারণে ডিকেণ্টারের সঙ্গে ক্যাথিড্রাল ও ভিনাস মূর্তির সঙ্গে তলোয়ারের তুলনা ক'রে উভয়কে একই শ্রেণীভুক্ত করেছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে আজকের দিনের বহু জিনিস, ইলেকট্রিক-গ্যাজেট ইত্যাদির সঙ্গে সমান শ্রেণীভুক্ত ক'রে বিচার করা চলে আধুনিক বিমূর্তবাদী শিল্পকে।

মোটামুটি চারুকলার ও কারুকলার মধ্যে মিল কোথায় সে সম্বন্ধে যেটুকু ইঙ্গিতে

বলা হল, তার সাহায্যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের চারু ও কারুকলার মধ্যে মিল অনুসন্ধান করা যাবে বলে আমি মনে করি। সংক্ষেপে, এক-এক কালে চারু ও কারুকলার অন্তর্নিহিত নির্মিতির মধ্যে ঐক্য থাকতে বাধ্য। যখন এই ঐক্য থাকে না তখন চারুকলা ও কারুকলা উভয়ই ভীষণ অবস্থায় উপনীত হয়। চারু ও চারুকলার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের সাহায্যেই আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। এবার মিল কোথায় নেই, অনুসন্ধানের দরকার।

শিল্পের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী অস্তিত্ব সকল সময়েই স্বীকৃত। তবে কখনো কখনো অন্তর্মুখী গতির প্রাধান্য ঘটে, কখনো বহির্মুখী গতির প্রতি ঝোঁক পড়ে বেশি। অন্তর্মুখী গতির সাহায্যে চারুকলার বিচার করা সংগত। কারণ এই গতি কারুকলার ক্ষেত্রে দুর্লভ। যদি কোথাও সেরকম ব্যতিক্রম ঘটে থাকে তবে তাকে চারুকলার অন্তর্ভুক্ত করতে হয়, তা সে মৃৎপাত্রই হোক বা ইলেকট্রিক-যন্ত্রই হোক। মনে করা যাক অশোক-স্তম্ভের উপর স্থাপিত সিংহমূর্তির এবং আসিরিয়ায় তীর-বিদ্ধ সিংহের উৎকীর্ণ মূর্তি। অশোক-স্তম্ভের সিংহমূর্তির নির্মিতি নিখুঁত, কিন্তু সেটিকে কারুকলার অন্তর্ভুক্ত করতে আমার কোনো দ্বিধা হয় না। অপরদিকে আসিরিয়ার সিংহত্বে বাস্তবতার অভাব নেই, তৎসত্ত্বেও সে ক্ষেত্রে এমনকিছু প্রকাশিত হয়েছে যা রসসৌন্দর্যের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। মন্‌সুরের রচিত লিলিফুল এবং সোতাৎসুর ভুট্টাগাছ, উভয়ের মধ্যে একই পার্থক্য। মন্‌সুর অসাধারণ কারিগর। সোতাৎসু সৌন্দর্যবোধসম্পন্ন শিল্পী।

আসল কথা, 'চারু' ও 'কারু' কলাকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা চলে না; এই মাত্র বলা চলে যে সমাজের দাবিতে যে-শিল্প রূপ প্রকাশিত হয় তারই নাম দেওয়া যেতে পারে 'কারুকলা'। অপরদিকে সমকালীন সমাজের প্রভাব থেকে মুক্ত শিল্পসৃষ্টিকে আমরা বলে থাকি 'চারুকলা'। চারুকলার এই বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে শিল্পের সামজিক ব্যাখ্যার দ্বারা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না।

অনেকগুলি পাতা ভরে গেল, কিন্তু এ-পর্যন্ত ঠিক রসসৌন্দর্য সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা হল না। অবশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য যে উপাদানগুলি আবশ্যিক সে-কথাই এ-পর্যন্ত আলোচনা করেছি। তবে এইসব উপাদান বা ধ্যান-ধারণার উপলব্ধি এক পথে চলে না। মুহূর্তে মুহূর্তে শিল্পীদের শিল্পসৃষ্টির পথ বদলে যাচ্ছে। শিল্পের আঙ্গিক,

ভাষা, তথা সকল উপাদানগুলিও প্রবর্তিত হচ্ছে ভিন্ন-ভিন্নভাবে। এই জন্যই সৌন্দর্যের কোনো একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া যায় না বলেই এ পর্যন্ত সে-বিষয়ে কোনো উল্লেখ করি নি।

জীবনের পরম মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রায় সকল দার্শনিকই অল্প-বিস্তর সৌন্দর্যের আলোচনা করেছেন। এ হল একরকমের সৌন্দর্যের আধ্যাত্মিকতার কথা। সৌন্দর্য অন্তরের বস্তু, এই কথাটি উপরের উক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র। এই মুহূর্তে উদ্দীপনার বাইরে শিল্পসৌন্দর্যের অন্য কোনো অস্তিত্বকে অনেকেই স্বীকার করেন না। তৎসত্ত্বেও সৌন্দর্যসৃষ্টির পথে যেসব উপাদান অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত বলে আমি মনে করেছি সে-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করলাম। তবে সৌন্দর্যবোধ জাগিয়ে দেবার পাঠক্রম তৈরি করার চেষ্টা করি নি, কারণ সে-চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই মাত্র বলা চলে যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের উদ্দীপনা যার মনকে জাগিয়ে তোলে না তার কাছে 'সৌন্দর্য' কথাটি একেবারে অর্থহীন। সাংসারিক প্রয়োজনের বাইরে অন্য কিছু যে জানে না বা ভাবে না তার কাছে সত্যিই সৌন্দর্যের কোনো প্রয়োজন নেই। অতি সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে সৌন্দর্য উপভোগের ইচ্ছা যে থাকতে পারে তারই দৃষ্টান্ত দিয়ে এই আলোচনা শুরু করলাম। বলা বাহুল্য, পাণ্ডিত্য অপেক্ষা সহজ বুদ্ধিতে যা আমি বুঝছি সেটাই বোঝাবার চেষ্টা করছি।

জনৈক বয়স্কা মহিলা আমার বাড়ির কাজ করতেন। বিশেষ প্রয়োজনে তাঁকে আমি এক বন্ধুর বাড়িতে পাঠাই এবং যথাসত্বর কাজ সেরে ফিরতে বলি। কাজ সেরে মহিলাটি ফিরলেন বেশ বিলম্ব ক'রে। বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে তিনি কিছুটা চুপ ক'রে থেকে জবাব দিলেন, 'ও বাড়ির শব্জীবাগান খুব সুন্দর। সেই দেখতে দেরি হল।' পর মুহূর্তে বললেন, 'বাবু একটা লঙ্কাগাছ!' মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সংকোচের বাঁধ ভেঙে গেল। উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা ক'রে চললেন লঙ্কাগাছের।

ব্যাপারটা অতি সাধারণ। লঙ্কাগাছে কালো কালো লঙ্কা ধরেছে—এই দৃশ্য দেখে এই প্রৌঢ়া রমণী সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন। নিজের কর্তব্য, দায়িত্ব কিছুসময়ের জন্যে তিনি সম্পূর্ণ ভুলেছিলেন, লঙ্কাগাছের সৌন্দর্যে তিনি মাতোয়ারা। এই হল সৌন্দর্যের সম্মোহিনী শক্তি। নৃত্যে, সংগীতে, শিল্পে, কাব্যে, সাহিত্যে যেখানেই আমাদের মন অনুভবে আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকে সেখানেই আমরা তাকে সুন্দর বলে থাকি।

এইবার আর একটি প্রশ্নের মীমাংসা করতে হয়। যে-রমণী বগানে লঙ্কাগাছ দেখে

কয়েক মুহূর্তের জন্য নিজের দায়িত্ব ভুলে গিয়েছিলেন তিনি কি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর ছবি দেখে ঐ রকম মুগ্ধ হবেন ? নিঃসন্দেহে বলা চলে ঐ রকম হবে না। প্রকৃতির দৃশ্যে অনেকেরই মনে সৌন্দর্যবোধ জাগে, কিন্তু মানুষের সৃষ্টির সামনে সেই স্পর্শকাতর মন সম্পূর্ণ নিক্রিয় হয়ে থাকতে পারে।

শিল্পের ভাষার সঙ্গে যে-পরিমাণ জ্ঞানবুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার মিশ্রণ ঘটে সেই অভিজ্ঞতা ও সেই মননশীলতাও এই নারীর দ্বারা আয়ত্ত করা সম্ভব হয় নি। তৎ-সত্বেও এই শিশুসুলভ সহজ স্বচ্ছ আনন্দ উপভোগের শক্তি আছে বলে সৌন্দর্যের সরল আবেদন গ্রহন করা তাঁর পক্ষে সহজ। তাই এই শিশুসুলভ মন থেকে বেরিয়ে আসছে ছেলে-ভুলানো ছড়া, কাঁথা, পুতুল ইত্যাদি। কারণ ভাষার অনভিজ্ঞতা। আবেগবর্জিত ব্যক্তির পক্ষে শিল্পরস উপভোগ করা দুরূহ।

সাহিত্যে ভাষা, শিল্পে আঙ্গিক, সংগীতে স্বর-সপ্তক, তাল, মান, লয় ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট পঠনপাঠন থাকলেই যে শিল্পে সাহিত্যে সৌন্দর্যের আবেদন আমাদের মনকে অভিভূত করবে এটি নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না। এ জন্যে দরকার সংবেদনশীল মন।

মনের এই শিক্ষা সহজাত অথবা অনুশীলনের দ্বারা অর্জন করতে হয়।

প্রকৃতি-জাত উদ্দীপনা, ভাষা ও আঙ্গিক-সংক্রান্ত তথ্য ও ভাবাবেগের উপলব্ধি—এই তিনের সংযোগে যে-মন শিক্ষিত হয়েছে সে-ই শিল্পের তাৎপর্য কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবে। সংক্ষেপে, সৃষ্টি করার দক্ষতা ও শিল্পবস্তু উপভোগ করবার অভিজ্ঞতা দেখে-শুনে-ঠেকে শিখতে হয়।

বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় শিল্পশাস্ত্র-বিশারদরা ভারতীয় শিল্প-আলোচনা প্রসঙ্গে মারাত্মক ভুল করেছেন। কারণ তাঁদের শিল্প-বিচারের মাপকাঠি ছিল কতকগুলি প্রাচীন সংস্কার। সংস্কারের কঠিন আবরণের প্রভাবে শিল্পসৃষ্টি ও শিল্পদৃষ্টি কোনোটাই সার্থক হয় না। মোট কথা, কোনো একটা আপ্তবাক্যকে আঁকড়ে ধরে শিল্পের জগতে প্রবেশ করা চলে না।

John Ruskin-এর মতো অলৌকিক প্রতিভাবান শিল্প-সমালোচক সংস্কারের প্রভাবে কিরকম ভুল করেছিলেন তার প্রমাণ হিসেবে Whistler-এর বিচার উল্লেখ করা যেতে পারে। টলস্টয়ের 'What is Art' বইখানিরও উল্লেখ করতে পারি। টলস্টয় নিজে অসাধারন প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যবিদ্। সাহিত্যজগতে তাঁর এই স্থান অটুট আছে। কিন্তু তাঁর 'What is art'-গ্রন্থে এমন অনেক কথা আছে যে তা

মেনে নিতে পারা সকল সময় সম্ভব হয় না। সমকালীন সাহিত্যিকেরা সেই সময় টলস্টয়কে প্রশ্নও করেছিলেন। রাস্কিন ও টলস্টয় দু'জনেই সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে নৈতিক জীবনের মূল্যকে সর্বপ্রধান ক'রে দেখেছিলেন। নৈতিক জীবনের মূল্য, নীতি-দুর্নীতির কথা যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে কি সম্পূর্ণ পক্ষপাতিত্ব-বর্জিত সৌন্দর্য বিচার সম্ভব? আমরা কেউই সম্পূর্ণ পক্ষপাতিত্ব-দোষ থেকে মুক্ত নই। শিল্পী ও দর্শক উভয়ের মধ্যেই কিছু পরিমাণে এই ত্রুটি আছে। রসানুভূতি ও শিল্প-সৃষ্টির ক্ষমতা এই ত্রুটিকে প্রাধান্য দেয় না, এইটুকু বলা চলে।

বৈজ্ঞানিক সূত্র যেমন যে-ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যায় সৌন্দর্যদর্শনের সূত্র সেইভাবে বোঝানো যায় না। চৈনিক শাস্ত্র মতে 'চী' (Chi) তথা জীবনের প্রতিধ্বনি হল শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অন্তর্নিহিত সম্পদ। কেবল প্রতিভাবান শিল্পী এই গুণকে রূপায়িত করতে পারেন কাব্যে বা শিল্পে। চৈনিক মতে 'চী' তথা রস কোনো বিশিষ্ট স্বাদ বিতরণ করে না। পরিবর্তে তিক্ত কষায় মিষ্ট কটু যাবতীয় স্বাদের সংযোগে এমন একটি স্বাদ সাহিত্যে বা শিল্পে আমরা পাই যেটির আস্বাদ থেকেও যেন আস্বাদ নেই।

ভারতীয় অলংকারবিদ্‌রাও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। চৈনিক অলংকার-শাস্ত্রের অন্তরালে লাওৎসের প্রভাব অতি গভীর। লাওৎসের মতে শূন্য পূর্ণতাকে সৃষ্টি করেছে। এ-বিষয়ে ভারতীয় ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুদের থেকে চৈনিক মত ভিন্ন নয়।

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে দুটি অংশ—একদিকে শব্দ, অর্থ, ভাব, লাবণ্য এগুলির অনবদ্য সংযোগে তৈরি হয় কাব্যের সৌন্দর্য এবং অন্যদিকে সৌন্দর্যের পথে আমরা উপলব্ধি করি রস। সংযোগের অনবদ্যতা সাহিত্যের বা শিল্পের আবশ্যিক গুণ। সৌন্দর্য-বিশারদরা বলেছেন রসময় বাক্যই কাব্য, অর্থাৎ সৌন্দর্য-জগতে প্রবেশ করতে হলে শব্দ ও অর্থের অনবদ্য সংযোগ উপলব্ধি করতে হবে। চীন দেশের সৌন্দর্য-দর্শনে 'সৌন্দর্য' কথাটির উল্লেখ অপেক্ষা 'রস' কথাটিই আধিক্য পেয়েছে।

সৌন্দর্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে কিছুটা সাহিত্যের কথা বলতে হল, কারণ সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে তাবৎ শিল্পের সাদৃশ্য অনুসরণ করা যেতে পারে। কলার মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। ভাষার প্রভাবে এই যোগসূত্র বিভিন্ন আকার-প্রকার নিয়ে দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়। সৌন্দর্য-সৃষ্টির তাগিদে কি শিল্পীরা কাজ করে? সুন্দর-অসুন্দরের সমস্যা যদি অভিজ্ঞ শিল্পীদের সামনে উপস্থিত করা যায় তবে তাঁরা কীভাবে বিষয়টি দেখবেন?

যদি কোনো অভিজ্ঞ শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে তিনি ছবি মূর্তি ইত্যাদি রচনা করেন কিসের তাগিদে, তাহলে বিভিন্ন শিল্পীর মতামত একত্র করলে দেখা যাবে যে তাঁরা কেউই প্রত্যক্ষভাবে সৌন্দর্য-সৃষ্টি করার তাগিদে ছবি ও মূর্তি শুরু করবেন না। তীব্র আবেগের দ্বারা সৃষ্ট অন্তরের প্রতিমা-রূপকে তাঁরা প্রকাশ করতে চান। এই আবেগ যে কোনো উদ্দীপনার সাহায্যে বা বহুবিধ উদ্দীপনার সংযোগে উপলব্ধি করতে পারেন।

মানসপটে প্রতিফলিত যে প্রতিমা-রূপ (image), সেটি শিল্পীকে সৃষ্ট করার পথে এগিয়ে নিয়ে চলে। সুন্দর-অসুন্দরের সমস্যা সেখানে প্রধান নয়। প্রধান হল কী উপায়ে শিল্পী তাঁর মানস-প্রতিমাকে এবং সৃষ্টির তীব্র ইচ্ছাকে রূপায়িত করবেন, অর্থাৎ সৃষ্টির তীব্র ইচ্ছাই শিল্পীকে কর্মে নিযুক্ত করে। এর পরে শুরু হবে ভাষার সঙ্গে ভাবের সংযোগ এবং সে-সংযোগের পথে মানস-প্রতিমা অবিকৃত থাকে না।

এই মানস-প্রতিমার রূপান্তরের সংযোগ-স্থলেই সুন্দর-অসুন্দরের বিচার হয়ে থাকে। এই সংযোগ-স্থলকে লক্ষ করেই আমি নানাভাবে ভঙ্গি, কর্ষ (Tension), ছন্দ, আকার সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। যেসব দার্শনিক মনে করেন যে মানস-প্রতিমা যদি পূর্ণাঙ্গ, স্পষ্ট হয় তবে শিল্পীর শিল্পকর্ম যন্ত্রবৎ চালিত হতে পারে। এই অভিমত কোনো অভিজ্ঞ শিল্পী মেনে নিতে পারেন না, কারণ শিল্প-সৃষ্টির পথে মুহূর্তে মুহূর্তে যে-বিস্ময় অভিভূত করে এবং সৃষ্টির আবেগকে সজীব ক'রে রাখে সেটি কেবলমাত্র কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা সম্ভব হতো না।

কর্মরত শিল্পীর জীবনে এই যে বিস্ময়, এটির উপাদান নিহিত রয়েছে কর্ষ-শক্তি ও ছন্দের মধ্যে। এই শক্তিকেই শিল্পী সৃষ্টির প্রথমেই অনুভব করেন। শিল্পের এই দু'টি উপাদানকে সুন্দর-অসুন্দরের কোনো নির্ধারিত সিদ্ধান্তে ফেলা চলে না। ভাষার ক্রম-বিবর্তনের পথে মানস-রূপ ও বাস্তব-রূপের সংযোগে সুন্দর-অসুন্দরের আবির্ভাব। সংযোগের ইতরবিশেষের উপরই সুন্দর-অসুন্দরের বিচার হয়ে থাকে।

কর্ষ-শক্তি, ছন্দ, আকার—এগুলি শিল্পসাহিত্যের প্রাণশক্তিরূপে স্বীকার করলেও শিল্পসাহিত্যে বিষয়েরও মূল্য আছে। কারণ কোনো শক্তি বিষয় বা বস্তুর আশ্রয় ছাড়া প্রকাশিত হয় না। তাই এগুলিকে বলে বিমূর্ত গুণ। বিষয়ের আশ্রয়ে এই বিমূর্ত গুণ আত্মপ্রকাশ করে। বিশুদ্ধ ছন্দ অথবা শব্দের ঝংকারকেও শিল্পী বিষয়-রূপে গ্রহণ করতে পারেন। এই পরীক্ষা সম্প্রতি কালে কোনো কোনো শিল্পী করেছেন।

সেই চেষ্টা বৈজ্ঞানিক তথ্যমূলক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এবং রসসৌন্দর্যের প্রভাব থেকে এই শিল্পধারা কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন।

ভাব ও চিন্তা সজীব মানুষের ধর্ম এবং জীবনের উপলব্ধি প্রকাশ করার জন্যই যে শিল্পের পথ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এই পথ ধরেই যে মনুষ্যত্বের একটি বিশিষ্ট মূল্যবোধ জেগেছে, এ-বিষয়ে মতভেদ থাকবার কথা নয়। ইন্দ্রিয়-জাত সকল উদ্দীপনাকেই বিষয়-রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে যেগুলি আবেগকে শক্তিশালী ক'রে তোলে সেগুলি শিল্পীরা গ্রহণ ক'রে থাকেন। শৃঙ্গার, প্রেম, বাৎসল্য, এরূপ কতকগুলি ভাবকে ভারতীয় অলংকারবিদ্‌রা স্থায়ীভাব বলেছেন। সাহিত্যে বা শিল্পে, উভয় ক্ষেত্রেই এগুলিকে সক্রিয়ভাবে লক্ষ করি। যেসব শিল্পী এই স্থায়ীভাবের খবর রাখেন না তাঁদেরও রচনা এই শ্রেণীবিচারের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। তবে শ্রেষ্ঠ শিল্পে এগুলির মিশ্রণ ঘটে থাকে। আর একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে শৃঙ্গার সর্বাপেক্ষা স্থায়ীভাব। অর্থাৎ আদি রসের (sex) প্রভাব যেখানে সম্পূর্ণ বর্জিত, সেটি শিল্পীর ভাবোদ্যোতক বিষয় হয়ে উঠতে পারে না শিল্পের ক্ষেত্রে।

কারণ ইচ্ছা ছাড়া সৃষ্টি হয় না। এবং ইচ্ছা প্রাণশক্তিরই ক্রিয়া এবং প্রাণশক্তি ও আদিরস অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। শিল্পী জীবনের উপলব্ধিতে ক্রমেই আদিরসকে আধ্যাত্মিক বা বাস্তব যে কোনোভাবে চালিত ক'রে থাকেন। তবে সর্বপ্রধান প্রয়োজন সৌন্দর্যের প্রতিফলন, ছন্দের গতি ইত্যাদি।

ভারতের বুদ্ধমূর্তি বা তীর্থংকর মূর্তি সম্পূর্ণ কাম ভাব-বর্জিত, কিন্তু শৃঙ্গার ভাব-বর্জিত নয়। এই প্রসঙ্গে শৃঙ্গার ও কাম উভয়ের পার্থক্য সংক্ষেপে বিচার করা দরকার। ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন আদিরস সৌন্দর্যকে প্রতিফলিত করে। অপরদিকে কামজ ভাব আমাদের সহজাত সম্ভোগ-প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে।

সৌন্দর্যের মানদণ্ড কালে কালে বদলে যাচ্ছে। সেই বিবর্তনের ইতিহাসে একটি কথা লোপ পায় নি। সেই কথাটি হল প্রাণশক্তি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অথবা শিল্পসৌন্দর্য উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র এইখানে। গাছের কঠিন গুঁড়ি ভেদ ক'রে বর্ষার ফলার মতন লাল কচি পাতা বেরিয়ে আসছে। বলি কি সুন্দর, কি প্রাণশক্তি! মাটি ভেদ ক'রে সবুজ সতেজ ঘাস জন্মেছে। অনায়াসে পায়ে মাড়িয়ে পিষে দেওয়া যাবে, তবু ভাবের জগতে সেই সজীবতা অক্ষয় হয়ে থাকবে।

সর্বগ্রাসী অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, ভূমিকম্প, অর্থাৎ সকল প্রকারের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন আমাদের সর্বস্বান্ত ক'রে দিয়ে যায় তখন তা হল ভয়ংকর। তখন আর সুন্দরের

কথা মনে আসে না। কালক্রমে ক্ষয়ক্ষতির স্মৃতি ম্লান হয়ে আসে। মনে থাকে ভয়ংকরের স্মৃতি। সৃষ্টি-শক্তিসম্পন্ন শিল্পীর মনে জাগে সৃষ্টির প্রেরণা।

পূর্বেই বলেছি ছন্দ ইত্যাদি শিল্পসৃষ্টির আবশ্যিক উপাদান সুন্দরও নয় অসুন্দরও নয়। এই শক্তি যখন জীবনের মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই মনে জাগে শিল্পসৌন্দর্যের বোধ। সকল মানুষের যেমন দৈহিক শক্তি এক হয় না, তেমনি সকল শিল্পীর জীবনে প্রাণশক্তি সমান সতেজ হয় না। অদম্য সৃষ্টিক্ষমতারই অপর নাম প্রতিভা। প্রতিভার আগুন যার মধ্যে নেই সে রমণীয় বা কমনীয় সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু প্রাকৃতিক ঘূর্ণাবর্তের মতন ভাষা ও ছন্দকে চালিত করতে পারে না। শক্তি এবং যে পর্যন্ত না হৃদয়ের আবেগ অনুযায়ী ভাষা ও ছন্দ শিল্পী সৃষ্টি করতে পারে, সে পর্যন্ত সৌন্দর্য আমাদের সামনে অকুণ্ঠিতভাবে উপস্থিত হয় না। তাই বলতে হয় ভাষাকে নতুন ক'রে ভাবের উপযুক্ত করতে পারার উপরই নির্ভর করছে সৌন্দর্যসৃষ্টি।

দেবমূর্তি নির্মাণ সম্বন্ধে পুরাণকার বলেছেন, স্ফটিকপাত্রে স্থাপিত প্রদীপের আলো যেমন স্ফটিকপাত্র ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসে তেমনি দেবমূর্তির মধ্যে যে আত্মা-শক্তি আছে সেটি প্রকাশিত হয় অনুরূপভাবে। এই উপমা অনুসরণ করেই বলতে পারা যায় যে আঙ্গিকের দ্বারা আবেগ বিচ্ছুরিত হয় আধার ভেদ ক'রে। যে কোনো প্রাণশক্তি-সম্পন্ন বিষয় অবলম্বনেই সার্থক সৃষ্টি হতে পারে। তাই বলতে হয় ভাষার অনবদ্যতাই সৌন্দর্যের সর্বপ্রধান প্রতিনিধি। এই জন্যই আবেগের প্রকৃতি অনুযায়ী ভাষারও অদলবদল ঘটতে বাধ্য। জগৎ জুড়ে প্রাণশক্তি প্রকাশিত হচ্ছে নানাভাবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন আছে তেমনি পাঁকের গহ্বর থেকে পদ্মের কুঁড়ি বেরিয়ে আসছে আলোর দিকে। সেখানেও প্রাণশক্তির আবেদন কিছু কম নয়। এই যে প্রাণশক্তি ফুলের জগতে সেই শক্তি আমাদের বিপন্ন করবে না বলেই সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধ জাগে। কিন্তু ফুলের 'বিষয়'কে সৃষ্টিশক্তিতে ভাষার সাহায্যে নতুন ক'রে জাগিয়ে তোলা যেমন সহজ নয়, তেমনি শিল্পীর হাতে তৈরি ফুল সকলকে মোহিত করে না। কারণ এক্ষেত্রে আঙ্গিকের প্রভাবে রূপান্তরিত ফুল আর-এক জগতের বস্তু

ভেলভেটের বাক্সে পিন দিয়ে গাঁথা আর জীবন্ত প্রজাপতির মধ্যে যে তফাত প্রাণশক্তি-সম্পন্ন শিল্প ও নির্জীব শিল্পের মধ্যে সেই তফাত। তাই সিদ্ধান্ত করা চলে

যে প্রাণশক্তিই সৌন্দর্যের কারণ এবং ভাষা সেই শক্তির প্রকাশক এবং 'বিষয়' উভয়েরই যোগসূত্র।

রসসৌন্দর্য সম্বন্ধে আলোচনার প্রথমেই আমি বলেছি যে বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসা করা আমার পক্ষে হয়ত সম্ভব হবে না। আমার এই অক্ষমতার কারণ, হৃদয়াবেগের পথে যে-বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় সেটিকে অনুসন্ধান করেছি বিচার-বুদ্ধির পথে।

একথা সকলেই জানেন যে শিল্প, সাহিত্য, অভিনয় তথা তাবৎ শিল্প-ধারা ভিন্ন-ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, যদিও মূল উৎস এক। সকলেরই আদর্শ রসসৌন্দর্যের সৃষ্টি। ভিন্নতা ঘটেছে ভাষার প্রভাবে। শিল্পীর আয়ত্তে যেসব ভাষা ও আঙ্গিক রয়েছে সেগুলি সকল রকমের ভাবকে সকল সময় প্রকাশ করতে সক্ষম হয় না। বিষয়টির একটু তুলনামূলক আলোচনা করার প্রয়োজন আছে।

আমার তুলনার বিষয় হল শিল্প ও সাহিত্য। আশা করি, এ তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে রসসৌর্যের আরো কিছু নতুন তথ্য আহরণ করা যাবে।

শিল্প ও সাহিত্য উভয়ের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করেছি। বর্তমানে উভয়ের মধ্যে আয়তনের তারতম্য অনুসন্ধান আমাদের লক্ষ।

কবি বলেছেন, 'দেখেছি পথে যেতে, তুলনাহীনারে'। শিল্পী ইজিপ্টের কারিগরের গড়া Wheat grinder মূর্তিটি সামনে ধরে কবিকে বললেন এই দেখ আমার তুলনাহীনা। যুগ যুগ ধরে মানুষ এমন ক'রে শিলের উপর নোড়া রেখে পিষে আসছে। আজও গ্রাম্য জীবনে এই অংশটি সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায় নি, কিন্তু তারা কি এদের মতো 'তুলনাহীনা'!

শিল্পের জগতে এ রকম কত তুলনাহীনার সাক্ষাৎ আমরা পাই, যার সঙ্গে সাহিত্য-ধর্মী ভাবের সংস্রব কোথাও নেই। আছে কেবল নাম-রূপের পরিচয়-পত্র।

কবি কালিদাস ভাবের জগতে রেখে পার্বতীকে বর্ণনা করেছিলেন। কবির ইচ্ছা হল পার্বতীকে আকারের জগতে গতিভঙ্গির ছন্দে দেখতে। তিনি বর্ণনা করলেন পার্বতীর স্নান। স্নানের জল কিভাবে তার মাথা থেকে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে শব্দবিন্যাসে। ছন্দে তৈরি হল যেন বৃষ্টিধারার মধ্যে দণ্ডায়মান গুপ্ত-যুগের এক নারীমূর্তি।

কালিদাস যেমন ক'রে পার্বতীকে নির্মাণ করলেন তেমন ক'রে সাহিত্যিককে আকারনিষ্ঠ গুণাত্মক সৃষ্টি করতে হয়, নচেৎ সাহিত্যর ভাব স্থিতিস্থাপক হয়ে ওঠে না। সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে এই যোগাযোগ বারে বারে লক্ষ করা যায়।

মোট কথা, সাহিত্যিকের জীবনে শিল্পী-জনোচিত উপলব্ধির যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি শিল্পীর মধ্যে ভাবময় ধারণা থাকা দরকার। কিন্তু শিল্পের জগতে যেগুলি অতুলনীয় সৃষ্টি সেগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ।

এ পর্যন্ত শিল্পসৃষ্টির পথে নানা উপাদানের উল্লেখ করেছি। কিন্তু 'গুণ' এই শব্দটির প্রয়োগ ইতিপূর্বে কোথাও নেই। এই কথাটির কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। মানুষ-মাত্রেই ভাবের জগতে বিচরণ করে। চিন্তা থেকে ভাব, ভাব থেকে চিন্তা—এই ক্রিয়া চলেছে সর্বসাধারণের মনে।

শিল্পী-জীবনে ভাব ও চিন্তার এমন একটি সংহতি সহজেই সৃষ্টি হয়, যার প্রভাবে সাহিত্যিকের জীবনের ভাব তাকে বিভ্রান্ত করে না। শিল্পীর অভিজ্ঞতা এর থেকে পৃথক না হলেও একটি নতুন গুণ তার আকারনিষ্ঠ ভাবভঙ্গি-যুক্ত ছন্দোময় সৃষ্টির জন্য অবশ্যই ছিল।

এই আবশ্যিক বস্তুটির নাম 'গুণ'। কথায় বলে ত্রিগুণাত্মক জগৎ। (বলা প্রয়োজন এই শব্দটি চয়ন করে গেছেন ভারতীয় দার্শনিক ও অধ্যাত্মবাদীরা) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণের দ্বারা তাঁদের মতে সমস্ত জগৎ প্রভাবান্বিত। এই তিন গুণের সংঘাত ও সংযোগ অহরহ চলেছে প্রকৃতিতে এবং তারই চূড়ান্ত মীমাংসা হচ্ছে মানুষের জীবনে। এই সংযোগ ও সংঘাতের কারণেই শিল্প ও সাহিত্যের বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যময় হয়ে চলেছে আদিকাল থেকে।

প্রাণশক্তি, তেজ, ছন্দ—এইসব শব্দের সাহায্যে সৌন্দর্যসৃষ্টির মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা করেছি। অকস্মাৎ 'ত্রিগুণাত্মক জগৎ'—এই গুরুগম্ভীর দার্শনিক তত্ত্বটির উল্লেখ ক'রে সৌন্দর্য-বিচারের পথ যেন আরো সংকীর্ণ ক'রে তুললাম। কিন্তু উপায় নেই। কারণ ভারত-শিল্পের অনেকখানি অংশ রচিত হয়েছে এই ত্রিগুণাত্মক জগতের আদর্শকে লক্ষ্য ক'রে। আধ্যাত্মিকতার প্রতীকরূপে যেসব মূর্তি রচিত হয়েছে, সেইসব মূর্তির সঙ্গে জড়িত হয়েছে এই দার্শনিক তত্ত্ব।

জীবজন্তুর আকার-যুক্ত বাহন, হাতে আয়ুধ এবং শরীরের অবস্থান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমভঙ্গ। দেবতাদের বাহন 'তমঃ'-গুণ তথা তমঃ-শক্তির প্রতীক। আয়ুধ 'রজঃ'-শক্তি এবং সমগ্র মূর্তি রাজসিক গুণকে প্রকাশ করছে। এখানে সাধকের

উপলব্ধিকে কারিগর সৌন্দর্যমণ্ডিত ক'রে সৃষ্টি করেছে। শিল্পী বা কারিগরের প্রধান লক্ষ সৌন্দর্য-সৃষ্টি।

শাস্ত্রবাক্য না জানা থাকলে নির্মাণ-কৌশলের নিপুণতার সাহায্যেই এইসব মূর্তির শিল্পগত সার্থকতা এবং ব্যর্থতার বিচার করতে হয়। ভক্তের কাছে এই মূর্তি দেবতার আবির্ভাবের মতোই সত্য। মোট কথা, মন্ত্রকে জীবন্ত করে তোলার জন্যেই শিল্পীদের ধ্যানের পথে উপলব্ধি করতে হয়। ক্রমে সে-মন্ত্র প্রতিমা-রূপে প্রত্যক্ষ করতেন শিল্পী। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—এই শক্তিকেও ভারতীয় শিল্পীরা প্রকাশ করেছেন প্রতীকের সাহায্যে। এলিফেন্টা গুহার ত্রিমূর্তি, দক্ষিণ ভারতের নটরাজ—এই প্রতীকে আমরা যা লক্ষ করি সেটি অনেক পরিমাণে মন্ত্র-তন্ত্র বা দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রভাব থেকে মুক্ত এবং সৌন্দর্য বিচারের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সার্থক। কারণ, এখানে শিল্পী এই সৌরজাগতিক শক্তির সঙ্গে এক হতে পেরেছিলেন সহজেই।

গুণাত্মক জগৎকে বলা যায় psychological এবং কালচক্রের আদর্শকে বলা যায় elemental বা সৌরজাগতিক। তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যাবে এই দুই শক্তি অভিন্ন! সৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্রে এই দুই শক্তিরই অঙ্গাঙ্গি যোগ ঘটে থাকে। কেবল প্রবণতা-গতি ভিন্ন।

রামায়ণে রাবণ, মহাভারতে দুর্যোধন, জরাসন্ধ, শাম্ব এবং ত্রিপুরনগর-নির্মাতা ময়—এইসব চরিত্র রজো-তমো গুণের উপাদানে নির্মিত হয়েছে। কোনো শিল্পীর সাধ্য নেই যে এই অপূর্ব শক্তিশালী চরিত্র চিত্রে বা মূর্তিতে রূপায়িত করতে পারে। তাই সিদ্ধান্ত করা চলে যে মানসিক বা দৈহিক শক্তির সমন্বয় ও সংঘাত শব্দাশ্রিত বাক্যের দ্বারাই সম্ভব। অপর দিকে (এলোরা) কৈলাস মন্দিরে প্রবেশ করলে ভাবে ভঙ্গিতে নির্মিত যে-শক্তির সাক্ষাৎ আমরা পাই সে-শক্তি কবি, সাহিত্যিক উপস্থিত করতে পারেন না। সাহিত্য ও শিল্প উভয়ের মধ্যে সাধারণ গুণ ছন্দ। সাহিত্যে আছে প্রেরণা, উৎস মনোজগৎ—ক্রমে প্রধানত সেই শক্তি আশ্রয় করে রূপের জগতে। অথবা রূপের উদ্দীপনা থেকে ভাবময় অবস্থায় সাহিত্যিক উত্তীর্ণ হন। এ-বিষয়ে বক্তব্যটি স্পষ্ট করার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। লিওনার্ডো-অংকিত 'মোনালিসা' চিত্র জগৎ-বিখ্যাত। সেই ছবি দেখে কবি Walter Pater বলছেন :

She is older than the rocks among which she sits

Like the vampire,

She has been dead many times,
And learnt the secrects of the grave ;
And has been a diver in deep seas,
And keeps their fallen day about her ;
And trafficked for strange webs with—
Eastern Merchants ;
And, as Leda
Was the mother of Halen of Troy,
And as St. Anne
Was the mother of Mary ;
And all this has been to her but as the
sound of byres and flute
And lives,
Only in the delicacy
With which it has moulded the changing
And tinged the eye lids and the hands.

কবি মোনালিসা-র রূপে আকৃষ্ট হয়ে চিরন্তন নারীকে উপলব্ধি করলেন। Leonardo ও Mona Lisa-র মধ্যে যে আত্মিক সম্বন্ধ ঘটেছিল তারও ইঙ্গিত পাওয়া গেল। কেবল ছবিটিকে দেখা গেল না।

বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগৎ, উভয়ের মধ্যে যে টান সেটিকে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতাকেই বলা হয় প্রতিভা। এবং বলা বাহুল্য, কোনো বস্তুকে আশ্রয় না ক'রে কোনো গুণ তথা সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় না। জীবনের তাবৎ অভিজ্ঞতাই শিল্প-সাহিত্যের 'বিষয়'।

মানুষের ইতিহাসের আদিপর্ব থেকে বিচার করলে দেখা যায় একদিকে মানুষ জীবনধারণ করবার তাগিদে করেছে নানা প্রকার কর্ম, অন্যদিকে সে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত বস্তুর মধ্যে যে একটি শক্তি বা তেজের প্রভাব আছে তা উপলব্ধি করেছে। আকাশ, মাটি, জল, বাতাস, পাথর প্রভৃতি বস্তুর মধ্যে যে একটি প্রাণশক্তির অস্তিত্ব

রয়েছে এটি সম্বন্ধে মানুষ আদিম যুগ থেকে সচেতন। এই উপলব্ধিই তার সংস্কৃতির বনিয়াদ।

এই শক্তি বা তেজকে (energy) প্রথম প্রতীক-রূপে পাই প্রাচ্য ভূখণ্ডে। মেসোপটেমিয়া এবং ভারতে প্রতীক হিসাবে মাটি বা পাথরের লিঙ্গ পাওয়া যায়। এই লিঙ্গ-প্রতীকের উপলব্ধির মধ্যে সেই প্রাণশক্তির ভাবেরই প্রকাশ পাওয়া যায়।

চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে সর্বত্র এই একই ভাবের উপলব্ধি প্রকাশ লাভ করেছে।

পুরুষ ও প্রকৃতি, নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় দুটি ভিন্ন শক্তির মিশ্রণে যে নতুন প্রাণের সৃষ্টি হয় তারই উপলব্ধির প্রকাশ লিঙ্গের প্রতীকে ব্যক্ত হয়েছে।

ভারতের মাটিতে প্রাচীন সংস্কৃতির বনিয়াদ তৈরি হয়েছে, তাই ভারতের শিল্পের মূল শক্তি যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি।

যা ছিল প্রতীকরূপী লিঙ্গ হিসাবে সেটিই কালক্রমে নর নারীর আকারে পরিণত হল এবং ভারতের মূর্তিশিল্পে নতুন এক পরিণতি এল। যক্ষ-যক্ষী, মদন-রতি, বিষ্ণু-লক্ষ্মী, পার্বতী-পরমেশ্বর প্রভৃতি মূর্তির মধ্য দিয়ে সেই একই ভাব ব্যক্ত হয়েছে। অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে সেই বিপরীত দুই শক্তির ভাব রূপ পেয়েছে নর-নারীর আকারের মধ্য দিয়ে।

বৈদিক ধর্মের প্রভাবে ভারতের নীতিশাস্ত্র (ethics) জটিল দার্শনিক জিজ্ঞাসায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু আদিম বিশ্বাস সম্পূর্ণ লুপ্ত না হয়ে আর্যদের বিশ্বাসকে প্রভাবান্বিত করেছে। প্রাচীন বিশ্বাস ও দার্শনিক জিজ্ঞাসা এই দুই-এর সংমিশ্রণে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের (Trinity) এক নতুন উপলব্ধির ভাব উদ্ভূত হল। এক সময় মানুষ একেই জীবন সৃষ্টির মৌল শক্তিরূপে জেনেছিল, এবং এরই বিভিন্ন আয়তনে একে দেখা হল এবং জীবন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নতুন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হল। এই তত্ত্বটি ভারতীয় শিল্পীদের শিল্পদৃষ্টিকে নতুন পথে চালিত করেছে।

এইসঙ্গে আর-একটি কথা বলতে হয়। যেমন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ধারণা ভারতের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি তেমনি এতে একটি মনোবৈজ্ঞানিক (Psychological) ব্যাখ্যাও পাই—সেটি হল ত্রিগুণাত্মক জগতের ধারণা। প্রকৃতির আছে তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। এর দার্শনিক ব্যাখ্যা যাই থাক্ না কেন শিল্পের ইতিহাসে এই দার্শনিক তত্ত্ব ভারতের শিল্পকে চিরদিনের জন্য প্রভাবান্বিত করেছে। শিল্পীর কাছে এই তত্ত্বের অর্থ এই যে বিশ্বসংসারের একটিই বাঁধন। এই কারণে ইন্দ্রিয়জাত

সমস্ত অনুভূতির উপলব্ধি ভারত-শিল্পে যেভাবে একত্র করা হয়েছে তা অন্য দেশের শিল্পে বিরল।

ভারত-শিল্পের আলোচনাকালে দেবদেবীর মূর্তির বিষয়ই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। এগুলি বিশেষ সুপরিচিত। কিন্তু এ ছাড়া আরো বহুবিধ রূপ ভারতীয় শিল্পীরা কল্পনা করেছেন। তার বৈশিষ্ট্য কী জানতে হলে ইতিপূর্বে যে দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক চিন্তার কথা উল্লেখ করেছি সে-বিষয়ে লক্ষ করা দরকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ কতকগুলি জীবজন্তুর বিষয় উল্লেখ করা যায়। মেসোপটেমিয়ায় যে-সমস্ত মূর্তি পাওয়া গেছে, মহেঞ্জোদড়োর সীল-এ উৎকীর্ণ জীবজন্তুর চিত্র তার থেকে পৃথক নয়। ক্রমে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে জীবজন্তুর আকৃতি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে এলেও ভারতীয় শিল্পে জীবজন্তুর একটি বিশিষ্ট স্থান রয়ে গেছে। প্রথমে দেখা যায় জীবজন্তুগুলির একটি স্বাধীন সত্তা ছিল। ক্রমে এইসব জীবজন্তু (যথা—হাতি, বানর, কচ্ছপ, সাপ ইত্যাদি) হিন্দু দেবদেবীর বাহন হিসাবে দেখা দিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তার স্বতন্ত্র সত্তা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল না। শাক্ত ধর্মের প্রভাবে জীবজন্তুর একটি বিশিষ্ট স্থান শিল্পে রয়ে গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাবলীপুরমের বানর-দম্পতি, হরিণ, দক্ষিণভারতের মন্দিরের নন্দীর ষাঁড়, গণপতির ইঁদুর প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। এই সকল মূর্তিতেও সেই প্রাণশক্তির প্রবাহের উপলব্ধিটি লোপ পায় নি এবং মহেঞ্জোদড়ো থেকে শুরু করলে বিবর্তনের ধারাটি সহজেই অনুসরণ করা যায়। এইসব মূর্তিতে যদিও ভারতের দার্শনিক তত্ত্ব প্রবেশ করে নি, তথাপি ভারতের নৈতিক বিশ্বাসের প্রভাব অবশ্যই রয়েছে।

ভারতের জীবনাদর্শে মুক্তিকামী মানুষের সাক্ষাৎ অনেকরূপে পাওয়া গেছে। এই সব মুক্তিকামী মানবের জীবনাদর্শে উপলব্ধি প্রকাশের প্রবণতা থেকেই ধ্যানীমূর্তি ভারত-শিল্পে আত্মপ্রকাশ করেছে। মহেঞ্জোদড়ো থেকে এই ধারা অনুসরণ করা যাবে। এ ছাড়া আরো দুটি অপেক্ষাকৃত স্বল্পপ্রসিদ্ধ মূর্তির কথা এখানে উল্লেখ করা যাক। মহাবলীপুরমের অর্জুন ও বেলগোলার তীর্থংকর মূর্তি। বেলগোলার এই বিরাট আকারের নগ্ন মূর্তিটি সম্বন্ধে উল্লেখ ভারত-শিল্পের ইতিহাসে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। নগ্ন নরনারীর দেহ পৃথিবীর সমস্ত শিল্পীই অল্পবিস্তর নির্মাণ করেছেন। কিন্তু দৈহিক নগ্নতা সত্ত্বেও সে-সকল মূর্তি বেলগোলার এই মূর্তির মতো নিরাসক্ত, নির্বিকার নয়।

এই সকল মূর্তি যে-সকল কারিগর তৈরি করেছিলেন তাঁরা তীর্থংকরের নিরাসক্ত

ভাবটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কেবলমাত্র তাল-মান (Anatomy ইত্যাদি) জানা থাকলেই যে অনুরূপ মূর্তি নির্মাণ করা যায় না সেকথা শিল্পী মাত্রই অনুভব করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে সারনাথের বুদ্ধমূর্তিতে যে রাজকীয় আভিজাত্যের ভাব আছে সেই ভাব সমগ্রভাবে জৈন শিল্পে বিরল। মহা-বলীপুরমের অর্জুন বা অনুরাধাপুরমের ধ্যানী বুদ্ধমূর্তিতে অসাধারণত্ব আছে, কিন্তু রাজকীয় আভিজাত্যের ভাব নেই।

এ পর্যন্ত ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসের কতকগুলি উপলব্ধির প্রভাব সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, এই উপলব্ধি রূপ পেয়েছে যে সমস্ত কারিগরদের প্রতিভায় তাদের সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন। কারণ কারিগরদের প্রভাব ছাড়া কেবল উপলব্ধি দিয়ে শিল্প সৃষ্টি হতে পারে না।

ভারতের কারিগর সমাজের কাছে কতখানি মানসম্মান পেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কোনো তথ্য উপস্থিত করতে না পারলেও একথা বলা যায়, তাঁরা সুখে দুঃখে শিল্পকর্ম করবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। কঠোর অভ্যাসের পথে শিল্পের আঙ্গিক তাঁদের আয়ত্ত করতে হয়েছে। সমকালীন শিল্পীদের মতো ব্যক্তিগত রুচি ও মেজাজ অনুযায়ী শিল্পচর্চা করবার অধিকার তাঁদের ছিল না ঠিকই, কিন্তু একথা সত্যি নয় যে পৃষ্ঠপোষকরা তাঁদের যন্ত্রের মতো চালিত করেছিলেন। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই সামাজিক কাঠামো শিল্পীদের শিল্প-ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচারী হতে দেয় নি এবং শিল্পকর্ম কখনোই সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি। দাসপ্রথার যুগে নারী-সংসর্গের অভাব তাদের হয় নি এবং হব্যগব্য তাদের ভাগ্যে জুটত কিনা জানা নেই, তবে প্রচুর পরিমাণে মদ্যমাংস তাদের নিত্য খাদ্য-পানীয়ের তালিকায় থাকত। কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানধারণার শক্তিও শিল্পীদের অর্জন করতে হতো। কারণ ধ্যানের পথেই শিল্পরূপ আত্মপ্রকাশ করে, এই ধারণা সে-যুগেও যেমন কারিগর সমাজে বদ্ধমূল ছিল আজও তেমনি তা একেবারে মুছে যায় নি। পৃষ্ঠপোষকরা যতই প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী হোন না কেন, শিল্পীর ধ্যানধারণালব্ধ শিল্পরূপকে বিপথে চালিত করবার অধিকার তাঁদের ছিল না। আজকের মতো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ আদায় করবার দাবিও পৃষ্ঠপোষকরা কখনো করতেন না। অবসরের দিক দিয়ে শিল্পীদের ছিল অবাধ স্বাধীনতা, তবে এর অপব্যবহার যে হতো না তা নয়। কারিগররা আগাম নিয়ে কাজ শেষ করত না। এর দৃষ্টান্ত 'জাতকে' পাওয়া যায়। ভারত-শিল্প সম্পর্কে প্রকাশিত পুস্তকগুলি পাঠ করলে সহজেই মনে হয় যে ভারত-শিল্পে লোকায়ত চিত্রে

(Secular Art) এর প্রকাশ নেই। উপযুক্ত গবেষণার অভাবেই এই ধারণা রসিক-সমাজে দেখা দিয়েছে। এ ধারণা সত্য নয় যে ভারতীয় কারিগররা জীবনকে উপভোগ করে নি এবং দেবদেবীর প্রতীকমূলক মূর্তি গড়ার মধ্যেই প্রতিভা বা সৃজনীশক্তি সীমাবদ্ধ ছিল।

জীবনের প্রত্যক্ষ উদ্দীপনা যে কতখানি শিল্পীরা উপলব্ধি করেছিলেন এবং কীভাবে তার প্রকাশ করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ভরহুত, সাঁচী, খণ্ডগিরি, মহাবলীপুরমের উৎকীর্ণ মূর্তিতে, গুপ্তযুগের চিত্রে, রাজপুত চিত্রকলায়। তন্ত্রসাধন-পদ্ধতি ভারতের শিল্পক্ষেত্রে অনেক নতুন উপাদান যুগিয়েছে। এইসবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, নারীশক্তি সম্বন্ধে নতুন চেতনা এবং শিল্পের মাধ্যমে সে-শক্তিকে দেখাবার প্রচেষ্টা। তন্ত্রসাধানার এই প্রভাবে ভারতীয় শিল্পে নারীমূর্তির যে বিশিষ্টতা আত্মপ্রকাশ করেছে তা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তুলনা ক'রে বিচার করা এখনো ভালোভাবে হয় নি। তন্ত্রের প্রভাবেই ভারত-শিল্পে নতুন উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল। অপরদিকে ছিল ভক্তি-যোগ ও ভাগবত পুরাণের প্রভাব। উভয়ের সংযোগে ভারত-শিল্পে লোকায়ত উপাদান (Secular element) আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে অখণ্ড শক্তির যে চেতনা প্রাচীনকাল থেকে দেখা গিয়েছিল তা কোনোদিনই শিল্পীর শিল্প-নির্মাণ-কালে ম্লান হয় নি।

যৌন জীবনকে নিয়ে চিত্র বা মূর্তি নির্মাণের প্রচেষ্টা পৃথিবীর সর্বত্রই হয়েছে! ভারত-শিল্পের ইতিহাসে যৌন জীবনকে নিয়ে সর্বসাধারণের জন্য যে রকম বিরাট আকারের যে-মূর্তি নির্মিত হয়েছে তার তুলনা কোথাও পাওয়া যায় না। এই মূর্তিগুলির তাৎপর্য সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত আছে। এ ক্ষেত্রে এই মাত্র বলা যায় যে সামাজিক জীবনের একটি বিশেষ দিক অকুণ্ঠিত ভাবে শিল্পীরা রচনা করেছিলেন।

সূর্য তেজের প্রতীক। প্রাণের অস্তিত্ব নির্ভর করে এই তেজের সঙ্গে। এই বিমূর্ত ক'রে তোলার পথে শিল্পীরা নতুন ক'রে সেই অতি পুরাতন শক্তিসাধানার সংস্কারটি অনুসরণ করেছিলেন, তাই ভারতীয় যৌন-সম্পর্কিত মূর্তি দৈবক্রমেও বাস্তব অভিজ্ঞতার স্তরে পৌছায় নি।

যে সর্বব্যাপী অখণ্ড শক্তির উপলব্ধি ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, আমরা

দেখেছি, অনুরূপ চেতনা চীনের শিল্প- সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করেছে। এই প্রভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করতে হলে চারটি সাধন-পদ্ধতির কথা উল্লেখ করতে হয়। যথা—তাও, কনফুসিয়াস্, বৌদ্ধ এবং জেন্ (Zen) সাধন-পদ্ধতি।

তাও সাধন-পদ্ধতির ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন। অবশ্য ঋষি লাওৎসের প্রভাবেই তাও সাধন-পদ্ধতি ও দর্শন দানা বেঁধেছিল। নির্গুণ ব্রহ্মের মতো অখণ্ড শূন্যতা থেকেই সকল কিছুর উদ্ভব এবং সেই শূন্যতাতেই তার লয়। এই হল সংক্ষেপে তাও-ধর্মের মূল কথা। লাওৎসে বলেছিলেন :

Know the white,
Keep to the black,
And be the Pattern of the world.
To be the Pattern of the world is
To move constantly in the Path of Virtue
Without erring a single step,
And to return again to the Infinite.

—*The Tao and its Virtue,* Lao Tzu, translated and annotated by John C. H. Wu.

তাও ধর্মে প্রাকৃতিক রূপকেই নৈতিক প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। পাহাড়, পাথর, জল, গাছ, জীবজন্তু—এগুলি থেকেই মানুষ নিজের জীবনকে সার্থকতার পথে চালিত করবে, এই ছিল ঋষি লাওৎসের শিক্ষা। লাওৎসের শিক্ষা ও তাও-ধর্মের প্রভাবেই চীনদেশে দৃশ্যচিত্রের পরম্পরা গড়ে ওঠে। অপরদিকে তাও-ধর্ম অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী ছিল বলেই কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার রূপ এই ধর্মের প্রভাবে চীনশিল্পে দেখা দিয়েছে। তবে দৃশ্যচিত্রের পরম্পরাই সর্বপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী থেকেছে। প্রকৃতির উপর হস্তক্ষেপ করা মানুষের পক্ষে অপরাধ, এইজন্য মানুষের আকারের কোনো প্রতীক নির্মাণের চেষ্টা ভারতের মতো সেদেশে হয় নি।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যে মানুষ দ্রষ্টা অথবা এই জগতের সঙ্গে লীন হয়ে শূন্যের উপলব্ধি তার কাম্য—এই ভাবটি প্রকাশ করার জন্যই দৃশ্যচিত্রে প্রবর্তিত হয়েছে মানুষের রূপ। প্রকৃতিকে অবিকৃত রেখে সমাজ সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারে না, এই কারণে লাওৎসে, তাও-ধর্ম, সমাজ গড়ে তুলতে চায় নি এবং সমাজ গড়বার উপাদানও এই ধর্মে পাওয়া যায় না। Individualistic তাও-ধর্মের লক্ষ্য ছিল

ব্যক্তিজীবনের পরম পরিণতি এবং এই পরিণতির উপায় হল শূন্যের উপলব্ধি। এ এক রকমের নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা।

চীনদেশে সামাজিকতা ও সামাজিক জীবনযাত্রার একটি বিশেষ রকমের আইন ও শৃঙ্খলা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন ঋষি কন্‌ফুসিয়াস্।

কন্‌ফুসিয়াসের প্রভাবে চীনদেশে পরিবারকে কেন্দ্র ক'রে যে সমাজ গড়ে ওঠে সেটি অটুট থেকেছে বর্তমান যুগের কমিউনিজ্‌ম প্রবর্তনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। কনফুসিয়াস্-ধর্মে পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্ম স্বীকৃত হয়েছিল এবং পিতামাতাকে পরম পূজনীয় বলে দেখা ছিল সকল মানুষের অবশ্যকর্তব্য। সম্রাটকে সর্বশক্তিমান বলে দেখার চেষ্টাও কন্‌ফুসিয়াস্ ধর্মেরই প্রভাবে সম্ভব হয়েছিল।

পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম, পিতামাতা ও রাজাকে পূজার আসনে স্থান দেওয়ার ফলে প্রতিকৃতি পরম্পরা গড়ে ওঠে।

বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে দেশে মূর্তি ও প্রতীকধর্মী চিত্র অঙ্কনের পরম্পরা দেখা দেয়। এই পরম্পরা ভারতীয় পরম্পরা থেকে অভিন্ন বলা চলে। কাজেই এই পরম্পরাকে চৈনিক প্রতিভার বিশিষ্ট অবদান বলা সংগত নয়। ক্রমে যখন তাও-ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংযোগে জেন্ বুদ্ধিজ্‌মের সাধন-পদ্ধতি গড়ে উঠল, তখন থেকে চীনদেশে চিত্রশিল্পের একটি নতুন অধ্যায় শুরু হল। এই নতুন অধ্যায়ের সম্যক্ পরিচয় পেতে হলে পূর্ববর্ণিত ধর্ম বা চৈনিক শিক্ষার একটি তুলনামূলক আলোচনা সংক্ষেপে ক'রে নিতে হয়। এই তুলনার পথে আমরা লক্ষ করব যে তাও-ধর্ম চীনশিল্প-পরম্পরাকে দিয়েছে নীতিবাদ, বস্তুরূপকে প্রতীকের মর্যাদা দান এবং বিশেষ রকমের বিমূর্ত উপলব্ধিকে নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী প্রকাশের স্বাধীনতা।

কন্‌ফুসিয়াসের প্রভাবে চীনশিল্পে দেখা দিয়েছে সম্ভ্রান্ত বিদগ্ধ-জনোচিত মনোভাব (অ্যারিস্টোক্রেটিক্ এলিমেণ্ট)—যা-কিছু অশিক্ষিত অমার্জিত সেগুলিকে যতদূর সম্ভব শিল্পের মধ্যে স্থান না দেওয়া, কঠোর পরম্পরা-আশ্রিত আঙ্গিক। জেন্ সাধন-প্রভাব দেখা দিল ধ্যান ও জ্ঞানের সমন্বয়ে এবং শিল্পরূপ হয়ে উঠল ধ্যানের অন্যতম অবলম্বন এবং চিত্রলিখন হল সাধনের একটি পথ।

প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধের আদর্শ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে কোনো বড় রকমের মতভেদ ঘটে নি। অবশ্য প্রকৃতির সঙ্গে এই একাত্মবোধের আদর্শটির কোনো বৈপরীত্য ঘটে নি।

ভারতীয় শিল্প যেমন সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকেছে চীনের শিল্প-পরম্পরা তেমন ঘনিষ্ঠভাবে জনসাধারণের সঙ্গে যুক্ত থাকে নি। অর্থাৎ চীনশিল্প জনতার শিল্প নয়। জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মূলে ছিল কনফুসিয়াস ধর্মের প্রভাব। সম্ভ্রান্ত বিদগ্ধ সমাজ, জ্ঞানী, ধ্যানী এঁরাই ছিলেন শিল্পের প্রধান ধারক।

জনসাধারণের জন্য শিল্পসৃষ্টি করার প্রয়াস চীনদেশে না থাকলেও সে দেশের জনসাধারণের মধ্যে যে একটি বিশেষ রকমের শিল্পবোধ অটুট থেকেছে তার মূলে আছে লেখন-শিল্প, অর্থাৎ ক্যালিগ্রাফি (Calligraphy)। ক্যালিগ্রাফি থেকেই চীনের চিত্রকলার উদ্ভব। হস্তাক্ষরের সঙ্গে মার্জিত বা অমার্জিত মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ চিরকালই সে দেশে স্বীকৃত। এইজন্য ভালো হস্তাক্ষর অভ্যাস করেছেন সম্রাট, সেনাপতি, দার্শনিক, কবি প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের মানুষ। চীনচীত্রে বিমূর্ত লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করেছে বিশেষভাবে ক্যালিগ্রাফির প্রভাবে। অপর দিকে লেখার প্রভাবেই কাব্য এবং চিত্র উভয়ের মধ্যে একটি বিশেষ রকমের সংযোগই চীন শিল্প-প্রতিভার একটি বিশিষ্ট অবদান।

জাপানের সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে চীন ও ভারতীয় প্রভাবের কথাই প্রধানত উল্লেখ করা হয়। অবশ্য এই প্রভাবের ক্রিয়া যেমন বিস্তৃত তেমন গভীর। তবে জাপানের শিল্পপ্রতিভার যথার্থ মূল্য বিচার করতে হলে সে দেশের মাটির সঙ্গে যুক্ত সিন্টোধর্মের কথা উল্লেখ করতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সিন্টোধর্মের উপযুক্ত পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তন্ত্রসাধনার মতো এই সিন্টো সাধন পদ্ধতি যতদূর সম্ভব গোপন রাখবার চেষ্টা করেছেন এই ধর্মাবলম্বী সাধকরা।

আয়না তথা প্রতিবিম্ব, তরবারি ও রত্ন—এই তিনটি বস্তু হল সিন্টোধর্মের প্রতীক। নিরবচ্ছিন্ন কালপ্রবাহকে একটি মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করা জাপানের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। চেরী ফুলের মতো ফুটে উঠে মুহূর্তের মধ্যে ঝরে যেতে তাদের আপত্তি নেই। চীনবাসীদের মতো শীতে ফোটা প্লাম্ ফুলের দীর্ঘায়ু ও প্রবীণতা জাপানিরা কামনা করে না। এইখানে চীন ও জাপানের সংস্কৃতির মধ্যে একটা বড় রকমের পার্থক্য।

যৌবনের প্রাণশক্তি এবং ইন্দ্রিয়-জাত উদ্দীপনাকে উপভোগ করাবার তীব্র ক্ষমতা জাপানি চিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা জাপানি স্ক্রোলে (গুটোনো

ছবি) যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তার তুলনা চীনচিত্রের পরম্পরায় দৈবাৎ পাওয়া যায়। আবেগ ও দৈহিক শক্তি প্রকাশের দিক দিয়ে এইসব চিত্র অতুলনীয়। তরবারির প্রতীক এবং ক্ষাত্রবীর্যের চেতনার প্রতীকরূপে এইসব ছবিকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

চীন ও জাপান উভয় দেশেই ফুলের ছবি আঁকবার পরম্পরা গড়ে উঠেছিল। পূর্বেই বলেছি প্রত্যেক প্রকৃতির রূপের সঙ্গে নৈতিক বা দার্শনিক আদর্শ মিলিয়ে প্রতীকের রূপ দেওয়া হয়েছে এইসব চিত্রে। জাপানের ফুলের ছবিতে প্রতীকের ভাব অপেক্ষা তীব্র উদ্দীপনার লক্ষণ সুস্পষ্ট।

এই প্রসঙ্গে ওকাকুরা রচিত 'Book of Tea' নামক গ্রন্থ থেকে একটি কাহিনী নিজের ভাষায় উপস্থিত করলাম। কাহিনীটি ছিল এই রকম : একজনের বাগানে মর্নিং গ্লোরি ফুটেছে জেনে জাপানের সম্রাট সেই সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য গৃহস্বামীকে খবর পাঠালেন। গৃহস্বামী যথাসময় তাঁকে সাদরে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এলেন। রাজা বাগানে ঢুকে দেখলেন বাগান শূন্য, কোথাও মর্নিং গ্লোরির চিহ্নমাত্র নেই। গৃহস্বামী রাজাকে এই শুকনো বাগানের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলেন। সেখানে রাজা গিয়ে দেখলেন একটি পাত্রে একটিমাত্র মর্নিং গ্লোরি। মর্নিং গ্লোরি ফুলের সৌন্দর্য তীব্রতর করে তোলবার জন্য গৃহস্বামী তাঁর বাগানের সমস্ত গাছ তুলে ফেলেছিলেন।

সৌন্দর্যকে উপভোগ করবার এই মমত্বহীনতা সমগ্র প্রাচ্যে ছাড়া আর কোথাও আমরা দেখি না। আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য ভারতবাসী মমত্বহীন হয়েছে, জ্ঞানের জন্য ধ্যানের জন্য চীনের অধিবাসীরা সংসার ছেড়ে গুহাবাসী হয়েছে, কিন্তু সৌন্দর্যের জন্য মমত্বহীন হতে পেরেছে কেবল জাপানের অধিবাসী।

এশিয়ার শিল্প সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা গেল তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আমরা পৌছাতে পারি যে, বিভিন্ন অস্তিত্বের অনুসন্ধান করাই সকল সংস্কৃতির প্রচেষ্টা ছিল। এরই নাম দেওয়া যেতে পারে tension বা কর্ষণশক্তির উপলব্ধি। চীন ও জাপানে উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও লক্ষ এক। বিভিন্ন ধর্মসংস্কার অপেক্ষা tension সম্বন্ধে এই উপলব্ধি প্রাচ্যশিল্পের আঙ্গিককে নিয়ন্ত্রিত করেছে—কোনো কারণেই এটি শিল্পকলার পরম্পরা থেকে বিপর্যস্ত বা বিচ্ছিন্ন হয় নি।

পরিশেষে আমরা ক্যামেরা ও কমপিউটার যুগের সভ্যতা বিষয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করে নিতে পারি। ক্যামেরা, কম্পিউটারের যুগে তুলি-বাটালির ব্যবহার থাকবে কিনা, এ প্রশ্নের একটা জবাব দেবার সময় এসেছে। প্রতি মুহূর্তেই আমরা লক্ষ করছি যে ক্যামেরা, কম্পিউটারের প্রভাব শিল্পীদের কাছ থেকে অনেক কাজ ছিনিয়ে নিয়েছে।

প্রথমেই ধরা যাক সিনেমা বা টেলিভিশনের কথা। অভিনয়, সংগীত, দেশ-বিদেশের নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য যুগপৎ আমরা এই দুই যন্ত্রের সাহায্যে উপভোগ করি। ধনী দরিদ্র, নিরক্ষর-পণ্ডিত সকলেই এক সময় একই স্থানে বসে যন্ত্রযুগের এই নতুন খেলা উপভোগ করে। কিছুকাল পূর্বেও শিল্পীরা তথ্য-নির্ভর বিষয়ে চিত্র ক'রে উপার্জন করতেন। আজ এই কাজ প্রায় সম্পূর্ণভাবে ক্যামেরার আয়ত্তে এসেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধে অনেক শিল্পী নিযুক্ত হয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি আঁকবার জন্যে। নেভিনসন ম্যুরহেড বোন ইত্যাদি শিল্পীরা রণাঙ্গনের যেসব ছবি করেছিলেন, সেই-গুলি যতই সুন্দর হোক, সেইসব ছবিকে যুদ্ধের যথার্থ বর্ণনা বলে গ্রহণ করা চলে না। কিন্তু ক্যামেরা এইসব কাজ অতি সুষ্ঠুভাবে করতে সক্ষম। সংক্ষেপে, document-এর জন্য এখন আর শিল্পীদের প্রয়োজন হবে না। বাস্তব জগতের যথাযথ তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্যামেরাই যথেষ্ট।

এবার কম্পিউটার যন্ত্রের কথা। কম্পিউটারের দ্বারা স্থাপত্য থেকে শুরু ক'রে সকল রকমের নকশার কাজ নিখুঁতভাবে করা সম্ভব। যেখানেই গণিত-সুলভ মাপ-জোক, সেখানেই কম্পিউটারের আধিপত্য। ইমারত থেকে শুরু ক'রে টেবিল, চেয়ার, বাসনপত্র—সংক্ষেপে জীবনধারণের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু—সবই কম্পিউটার নিখুঁত হিসাবে নকশা ক'রে দিচ্ছে।

বলা বাহুল্য, ক্যামেরা বা কম্পিউটার মানুষের সাহায্য ব্যতীত কিছুই করতে পারছে না। মানুষ যন্ত্রের চালক। চালক যদি না থাকে তাহলে ক্যামেরা, কম্পিউ-টার-এর দ্বারা আর কোনো কাজ হবে না। সোজা কথায় মানুষ যা চাইবে, যন্ত্রও তাই করবে। চালকের যেমন মতিগতি ও সৌন্দর্যবোধ, তেমনি সে চালিত করবে যন্ত্রকে। এই জন্যই প্রথম শ্রেণীর সিনেমা বা প্রথম শ্রেণীর নকশা চালকের প্রতিভার ওপরেই নির্ভর করছে। যেমন মানুষকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না তেমনি মানুষের প্রতিভাকেও অস্বীকার করা যায় না। যন্ত্র নতুন একটি উপায় মাত্র।

এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আজকের দিনে ক্যামেরা হাতে

একজন নিজের খুশি মতো ফটো তুলতে পারে। কিন্তু একটি সিনেমা তৈরি করতে হলে বহু লোকের সহযোগিতার (team work) প্রয়োজন।

কম্পিউটারেরও কাজ চলে সহযোগিতার পথে। একজন ইঞ্জিনিয়ার, প্রয়োগবিদ্যা-বিশারদ এবং একজন শিল্পী এই তিনজন মিলে নকশার কাজ করে। ক্রমে ক্যামেরা ও কম্পিউটারের যুক্ত শক্তিতে আরো নতুন রকম কিছু হবার খুবই সম্ভাবনা। হয়ত এরকম কাজ কিছু শুরু হয়েছে, যা আমি জানি না। যন্ত্রের সাহায্য নিতে হলে যন্ত্রের যুক্তি আমরা গ্রহণ করতে বাধ্য। যুক্তির পথ অনুসরণ করতে গিয়ে অধুনিক সিনেমা ও কম্পিউটারের প্রভাব সমাজে দেখা দিয়েছে। সিনেমার প্রভাব রুচির ক্ষেত্রে যত স্পষ্ট ব্যবহারিক জীবনে ততটা স্পষ্ট নয়। কিন্তু অপরদিকে কম্পিউটার আমাদের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করতে শুরু করেছে। এখন আর আমরা উনবিংশ শতাব্দীর কারুকার্যখচিত আসবাবপত্র চাই না। আমরা চাই বাহুল্যবর্জিত ছিমছাম ধরনের (functional) ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র।

আমাদের দেশের আধুনিক শিল্পীদের দিকে এবার লক্ষ দেওয়া যাক। এই মুহূর্তে বড় বড় শহরে যেসব শিল্পী বসবাস করেন এবং শিল্পকর্ম করেন, তাঁরাই রসিক-সমাজে প্রগতিবাদী শিল্পী বলে পরিচিত। সিনেমায় যখন কোনো ছবি তৈরি হয়, তখন পরিচালকদের জানা থাকে যে এই ছবি ঠিক কাদের জন্য, সমাজের কোন স্তরে ছবির এই আবেদন পৌছবে। অপরদিকে কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে যত নক্শা তৈরি হয়, সেগুলিরও একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। কেবল প্রগতিবাদী শিল্পীদের ছবির নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই। সেইজন্যই আজকের দিনের ছবির প্রধান স্থান museum, সরকারী গ্যালারি, বড় বড় কারখানা ইত্যাদি। সমাজের যে সংকীর্ণস্থান আধুনিক শিল্পীরা অধিকার ক'রে আছেন সেটিও critic এবং dealer-দের সহযোগিতায় সম্ভব হয়েছে। নানা স্থানে, নানা সময়ে প্রদর্শনীগুলির জনপ্রিয়তাও আজ খুব বেশি নয়। প্রদর্শনীর কিছু অংশ ঘরে বসে টেলিভিশনের সাহায্যে দেখা যেতে পারে এবং বাকি অংশ দৈনিকপত্রের সাহায্যে জেনে নেওয়া যায়।

শিল্পীদের ব্যক্তিগত মতামত, তাঁদের আদর্শ-উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রেডিওতে কখনো কখনো খবর পাওয়া যায়। রেডিওর পরিচালকরা এইসব খবর আরো সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন, কিন্তু সে হল অন্য কথা।

প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী বলতে আজ আমরা এই শ্রেণীর শিল্পীদেরই বুঝি। সমাজের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক ক্ষীণ হলেও, বিদগ্ধ সমাজে এইসব শিল্পীদের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি

যথেষ্ট। ক্যামেরা, কম্পিউটারের যুগে এই শ্রেণীর শিল্পীদের উপযোগিতা কতটা থাকবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করতে না পারলেও মনে হয় যে এই শ্রেণীর অনেক শিল্পীকেই ক্যামেরা, কম্পিউটারের চাহিদার সঙ্গে হাত মেলাতে হবে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর নানাস্থানে চিত্রকররা ছোট ছোট film করতে শুরু করেছেন এবং কম্পিউ-টারের সঙ্গে designer নামে পরিচিত শিল্পীদের যোগাযোগও ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে এবং আরো ঘনিষ্ঠ হবে। এই যোগাযোগের পথে শিল্পীদের প্রতিভা যে সম্পূর্ণ নষ্ট হবে তাও নয়।

কিন্তু যাঁরা critic, dealer, museum-এর director ইত্যাদির আশ্রিত শিল্পী—প্রত্যক্ষভাবে যাঁদের যন্ত্রযুগের শিল্পের সঙ্গে কোনো যোগ নেই, যাঁরা কোনো প্রকার কারুকর্ম করতে অনিচ্ছুক—সেইসব শিল্পীরা সমাজের কোন কোঠায় স্থান পাবেন সে বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা ক'রে নেওয়া দরকার।

রসিক-সমাজে প্রগতিবাদী নামে পরিচিত এই যেসব শিল্পী, তাঁদের মধ্যে কিছু-সংখ্যক শিল্পী আছেন যাঁরা বিজ্ঞান-পূর্ব পরম্পরার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। কারণ, যন্ত্রযুগে অতীতের পরম্পরার বিশেষ কোনো উপযোগিতা নেই। অন্তত এই রকম মনোভাব যাঁরা পোষণ করেন, তাঁদের দিকে লক্ষ রেখেই পরের আলোচনা শুরু করছি।

সমকালীন সমাজ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যন্ত্র তৈরি হয়েছে যুক্তির সাহায্যে এবং সেই যন্ত্র চালিত হচ্ছে যুক্তির পথে। বিচার-বিশ্লেষণ-যুক্তির দ্বারা যেসব শিল্পীর মন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন, তাঁরাই পরম্পরাকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে চান। কিন্তু তাঁরা একটু যুক্তি প্রয়োগ করলেই বুঝতে পারবেন যে তাঁরাও বৈজ্ঞানিক পরম্পরার অধীন। তবে কি আপত্তি অতীতের পরম্পরা নিয়েই? মানুষের অধিকার বলে যে কথা ইতিহাসে অনেকবার মাথা তুলেছে আজও নতুন ক'রে সেই কথাটি প্রধান হয়ে উঠেছে। জ্ঞানীগুণী সকলেই বলছেন—যন্ত্রযুগ মানুষকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। মানুষের অধিকার থেকে যতটা আমরা বঞ্চিত, ততটাই আমরা যন্ত্রের দাস। তথাকথিত প্রগতিবাদী শিল্প আত্ম-বিস্মৃত যন্ত্রবৎ মানুষের সৃষ্টি—তাই এই শিল্পের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, তাই এই শিল্প ক্রমেই যন্ত্রের প্রতিধ্বনিমাত্র হয়ে উঠছে। সভ্যতার ইতিহাস একান্তভাবে বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা চালিত হয় নি, সেক্ষেত্রে আছে মানবীয় চেতনার অবদান। এই মানবীয় চেতনাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন যাঁরা তাঁরাই সংস্কৃতির স্রষ্টা। সংস্কৃতি পরম্পরা নমনীয়, যুক্তিবাদী

সভ্যতার পরম্পরা কঠিন। কঠিনে-কোমলে চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব এই মুহূর্তে আমরা লক্ষ করছি।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতা যখন প্রায় কঠিনতার চরম সীমায় এসে পৌঁছেছে সেই সময় অতি পুরাতন একটি সত্যের জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা জন্মেছে—মানুষ আবার চাইছে মানুষের অধিকার। বিজ্ঞানের এত ঐশ্বর্য, সংসারে এত সুখ, —তবু শান্তি নেই কোথাও। এই যে দারুণ অবস্থায় মানুষ এসে পৌঁছেছে, তার জন্য আমরা বিজ্ঞানকে দায়ী করতে পারি না। একান্তে বসে বিজ্ঞানীরা সাধনা করেছেন। সেই সাধনার দ্বারা তাঁরা অর্জন করেছিলেন কতকগুলি সত্য। সেই সত্যকে মতে রূপান্তরিত ক'রে সমাজপতিরা গড়ে তুলেছেন সভ্যতার এই কঠিন আবরণ। এই আবরণের প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত হতে চলেছে আধুনিক সমাজ।

সমাজ অনুভব করছে যে মানুষের অধিকার থেকে তারা ক্রমেই বঞ্চিত হচ্ছে। অবশ্য মানুষের অধিকারের নামে অনেক অবিচার অত্যাচার হয়েছে। তৎসত্ত্বেও এই অমূল্য শব্দটি বারে বারে উচ্চারিত হয়েছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্প সাহিত্য এবং যাবতীয় সংস্কৃতি এই একই কথাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে। আজও শিল্পীদের দায়িত্ব হল এই মহৎ বাণীকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করা এবং সেটিকে প্রকাশ করা। বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে আমরা জেনেছি যে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক আলো আছে, শব্দ আছে যার খবর পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় নি। এছাড়া আরো অনেক কথাই তাঁরা বলেন বা বলছেন যা সচরাচর আমরা বিশ্বাস করি না। সাধারণ বুদ্ধিতে এই সব কথাকে আমরা অযৌক্তিক বলে মনে করতে পারি, কিন্তু সেরকম মনোভাবকে ধৃষ্টতা বলাই সংগত। যদি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই সৌর-জগৎ আজও রহস্যাবৃত, তাহলে মনেরও এমন একটা জগৎ থাকতে পারে যা আজও আবিষ্কৃত হয় নি। এই আবিষ্কারের জন্য মতের অপেক্ষা মন্ত্র সাধনা অধিক শক্তিশালী। [মন্ত্র : —গুপ্তপরিভাষণ, মন্ত্রণা, নিভৃতে কর্তব্যাবধারণ (হরিচরণ)] মন্ত্র তথা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কোনো সংস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। মন্ত্রকে যখন সমাজ মতে রূপান্তরিত করে, তখনই দেখা দেয় সংস্কার (tradition)। আজ শিল্পকলা মতের দ্বারা চালিত। সেক্ষেত্রে মন্ত্রসাধকের সংখ্যা হয়ত মুষ্টিমেয়, হয়ত আরো কম।

ক্যামেরা, কম্পিউটারের দ্বারা যুক্তির পথে রুচির নতুন অধ্যায় শুরু হতে পারে, কোনো একটা মতামত জনপ্রিয় হতে পারে, কিন্তু উপলব্ধিজাত গূঢ় সত্য যন্ত্রের

জগতে নেই। এইখানে হল মানুষের অসাধারণত্ব। শিল্পী সেই অসাধারণ শক্তিকে গ্রহণ করতে এবং পালন করতে সক্ষম। এজন্য সমাজের দৃঢ় মুষ্টি কিঞ্চিৎ শিথিল করা যায়।

অবসরের অধিকার শিল্পীদের প্রাপ্য। আজ সেই অধিকার থেকে শিল্পীরা বহু পরিমাণে বঞ্চিত। প্রচুর ঐশ্বর্য অপেক্ষা মনের স্বাধীনতা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক বেশি অনুকূল। কিন্তু অবসর, নির্জনতা, একা থাকবার শক্তি আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। তাই নির্জনতাকে আমরা যতদূর সম্ভব দূরে ঠেলে রাখতে চাই। দৈনিকপত্র, রেডিও টেলিভিশনের সাহায্যে, নানা মতামতের দ্বারা নিজেদের মনুষ্যত্বকে আবৃত ক'রে রাখি। এই জন্যই উপলব্ধির জগৎকে আমরা যুক্তির দেওয়াল তুলে দূরে রাখতে চাই। এইটিই হল আজকের দিনের শিল্পীদের সমস্যা। তাঁরা মনুষ্যত্বের দাবি গ্রহণ করবেন, না যন্ত্রযুগের দাবিতেই তাঁরা তুষ্ট থাকবেন?

অধিকাংশ আধুনিক শিল্পী কতটা মতের দ্বারা প্রভাবান্বিত, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি পরিমাণে যন্ত্রকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছে তার প্রণাণ আমরা পাই আমাদের দেশের শিল্প-প্রদর্শনীগুলি দেখলে।

যুক্তি ও মত—উভয়ের সম্মিলিত শক্তি যতই প্রবল হোক না কেন, এই শক্তি সার্থক শিল্প-সৃষ্টির পক্ষে কতটা অনুকূল, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। এজন্য দরকার মন্ত্রের শক্তিতে নতুন উপলব্ধি। এই পথ পরম্পরার দ্বারা নির্মিত নয়। শিল্পীরা যদি মনুষ্যত্বের দাবি স্বীকার করেন, তবে তাঁদের এই পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

কারিগরের সঙ্গে যন্ত্রের সম্বন্ধ চিরদিনের। যন্ত্র তথা উপায় কখনো অতি জটিল, কখনো অতি সরল। ক্যামেরা, কম্পিউটার যেমন যন্ত্র, তুলি-বাটালিও তেমনি যন্ত্র। কেবল একটি জটিল, অন্যটি সরল। জটিল যন্ত্রের চাইতে সরল যন্ত্র ব্যবহার করাও সহজ। জটিলতা ও সরলতা—উভয়েরই শিল্পজগতে স্থান আছে। শিল্পের জগতে বহু অনবদ্য সৃষ্টি সরল পথে প্রকাশিত হয়েছে ও ভবিষ্যতেও হতে পারে। ভাবীকালের শিল্পীরা দুর্গম, জটিল পথ গ্রহণ করবেন অথবা সহজ পথে চলবেন, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না করতে পারলেও এইমাত্র বলা যেতে পারে যে মানুষের গভীর উপলব্ধি, মন্ত্রশক্তিতে অর্জিত জীবনের গভীরতত্ত্ব সহজ পথেই প্রকাশিত হবে। যন্ত্রের জটিলতাও সহজ হয়ে আসবে। এই জন্যই মনে হয় শিল্পে জটিল, আধুনিক যন্ত্রের যেমন স্থান আছে, তেমনি সহজ পথেও শিল্প সৃষ্টি বন্ধ হবে না।

নানা কারণে আধুনিক সমাজ যে বেশ জটিল হয়ে উঠেছে, তা সকলেই স্বীকার করেন। তবে জটিলতার কারণ সম্বন্ধে মতভেদ যথেষ্ট আছে। যুক্তিপ্রধান সমাজ বা শিল্প জটিলতার পক্ষপাতী। এই কারণে সহজ জিনিসকে আমরা স্বীকার করতে চাই না। সকল সময়ে আমরা যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করি আমাদের কর্মনীতিকে। শিল্পের ক্ষেত্রে আজ যে এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এত যন্ত্রের বন্দনা—তারও মূলে আছে ওই একই মনোভাব।

যে বিচার নিয়ে এ আলোচনা শুরু করেছিলাম, দেখছি সেটা খুব বড় সমস্যা নয়। সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহজ পথ থাকার প্রয়োজন আছে। শিল্পে সাহিত্যে অভিজ্ঞতা সরল পথে প্রকাশ পেতে চায়। অবশ্য করণ-কৌশলের বাধা সেখানে অনিবার্য। তাই মনে হয় শিল্পে-সাহিত্যে নতুন উপলব্ধি আমাদের দেখিয়ে দেবে কোন পথ ভাবী-কালের শিল্পীদের উপযুক্ত। এক সময় কলম ছিল, ফাউন্টেন পেন এল, এল ডট্ পেন, ফেল্ট পেন, টাইপ রাইটার, টেপ-রেকর্ডার—কতরকম জিনিস এল সাহিত্যিকদের সামনে। এইসব উপকরণে সাহিত্যের রূপ বদলে যায় নি। ভাষার ক্ষেত্রে এইসব উপকরণের কোনো প্রভাব নেই। সাহিত্যের তুলনায় শিল্পের ক্ষেত্রে উপকরণের প্রভাব কিছু বেশি। এইজন্যই সেখানে উপকরণের বাছাই অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। এবং নতুন উপকরণের প্রভাবে শিল্প-রূপের আকারপ্রকারও অল্পবিস্তর বদলে যায়। যেমন বদলে যাচ্ছে ক্যামেরা, কম্পিউটারের প্রভাবে। বহু উপকরণ নতুনত্বের দাবিতে শিল্পজগতে প্রবেশ ক'রে আবার অল্পকালের মধ্যে অন্তর্ধানও করে।

ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে নতুন উপকরণ যেমন যুগান্তর এনেছে, চিত্রের ক্ষেত্রে তেমন পরিবর্তন নতুন উপকরন ঘটাতে পারে নি। কারণ চিত্র-নির্মাণের কালে নতুন হাতিয়ারের প্রভাব অত গভীর নয়, যতটা ইমারত-নির্মাণের ক্ষেত্রে। এইজন্যই বহু পুরাতন হাতিয়ার অনায়াসে নতুন যুগের শিল্পীদের হাত থেকে চলে যায় নি। নির্মাণ-দক্ষতা অথবা সৃষ্টি-ক্ষমতা, পর্যবেক্ষণ অথবা অভিজ্ঞতা—শিল্পীদের সামনে চিরদিন এই দুই পথ খোলা আছে। কোন শিল্পী কোন পথ গ্রহণ করবেন, তারই ওপর চূড়ান্ত মীমাংসা নির্ভর করছে।

যে সমস্যা নিয়ে এ আলোচনা শুরু করেছিলাম, আলোচনার শেষে দেখছি সে সমস্যার বিশেষ কোনো ভিত্তি নেই।

আর একটি কথা পাঠককে জানানো দরকার। ক্যামেরা বা কম্পিউটার সম্বন্ধে আমি বিশেষজ্ঞ নই। পুস্তক-পত্রিকার সাহায্যে কিছু তথ্য আহরণ করার চেষ্টা

করেছি। এইজন্য এই আলোচনা যতটা বিস্তৃত করা যেত, ততটা করা গেল না। সৌভাগ্যক্রমে কম্পিউটার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ সুজিত বসু মহাশয়ের সাহায্য না পেলে কম্পিউটার সম্বন্ধে আমি কিছুই আলোচনা করতে সাহস পেতাম না।

—

গ্রন্থপরিচয়

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত লেখকের একমাত্র রচনা 'আধুনিক শিল্পশিক্ষা' (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৭৯, পৃষ্ঠা ১০ + ১৫০, মূল্য ৬·০০ টাকা)। বিভিন্ন সময়ে লিখিত নানা প্রবন্ধ, আলোচনা ও রচনা বিশ্বভারতী পত্রিকা, এক্ষণ, দেশ, সপ্তাহ, বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি ইত্যাদি সাময়িক পত্রে ও কিছু স্মারক-গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। বর্তমান গ্রন্থভুক্ত রচনা-চতুষ্টয়ের প্রকাশন-ইতিহাস নিম্নরূপ :

১	**চিত্রকর** শ্রুতলিপি : রমিতা ঘোষ	এক্ষণ, ১৩শ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, শারদীয় ১৩৮৪
২	**কত্তামশাই** শ্রুতলিপি : রুচিরা মুখোপাধ্যায়	এক্ষণ, ১০ম বর্ষ, ১-৩ সংখ্যা, শারদীয় ১৩৭৯
৩	**কীর্তিকর** শ্রুতলিপি : ইলা রায়চৌধুরী (সরকার)	জয়শ্রী, বার্ষিক সংখ্যা, ৩৯ বর্ষ, বৈশাখ ১৩৮১
৪	**শিল্প-জিজ্ঞাসা** শ্রুতলিপি : শ্রাবণী রায়চৌধুরী	এক্ষণ, ১২শ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, ১৩৮৩ ; ১২শ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, শারদীয় ১৩৮৩

সংকলিত রচনাগুলি ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭-এর মধ্যে লিখিত। পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে বর্তমানে সংশোধিত ও সংযোজিত হয়ে মুদ্রিত হয়েছে। বিশেষত 'শিল্প-জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধটির শেষাংশে কমপিউটার-প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন।

গ্রন্থভুক্ত ছবিগুলির অধিকাংশই এক্ষণ-পত্রিকায় মূল রচনার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। অতিরিক্ত কয়েকটি ছবি প্রথম মুদ্রিত হল।

'কত্তামশাই' রচনাটি প্রথম প্রকাশের সময় সত্যজিৎ রায়-অংকিত শিল্পীর একটি প্রতিকৃতি [স্কেচ] এবং একটি পত্রের [সত্যজিৎ রায়-কে লিখিত] প্রতিলিপি এক্ষণ-পত্রে মুদ্রিত হয়। সে-দু'টি বর্তমান সংকলনে বর্জিত হয়েছে।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত লেখকের নানা নিবন্ধের অপর একটি সংকলন 'চিত্রকথা' বর্তমান প্রকাশকের উদ্যোগে প্রকাশিতব্য।

—
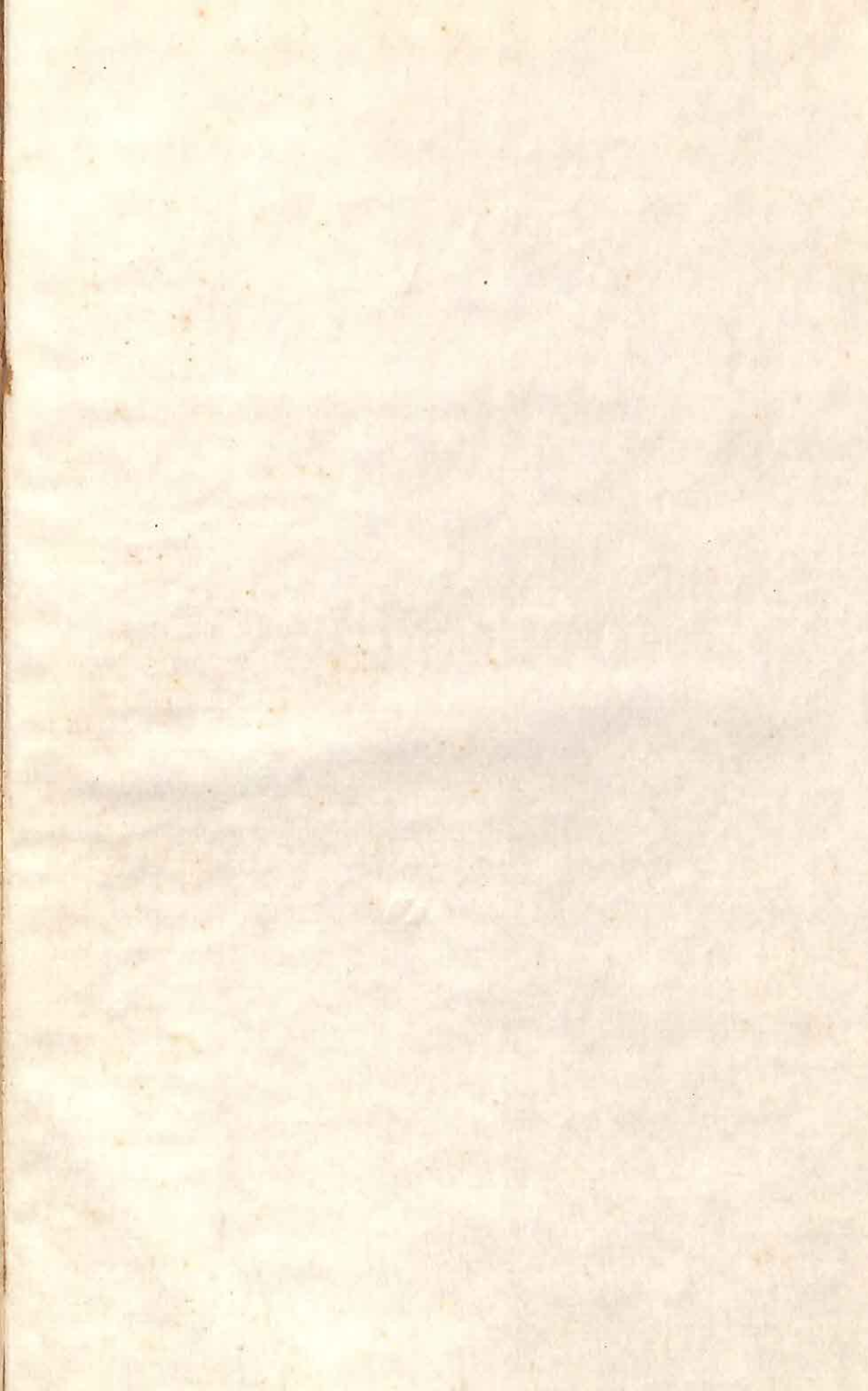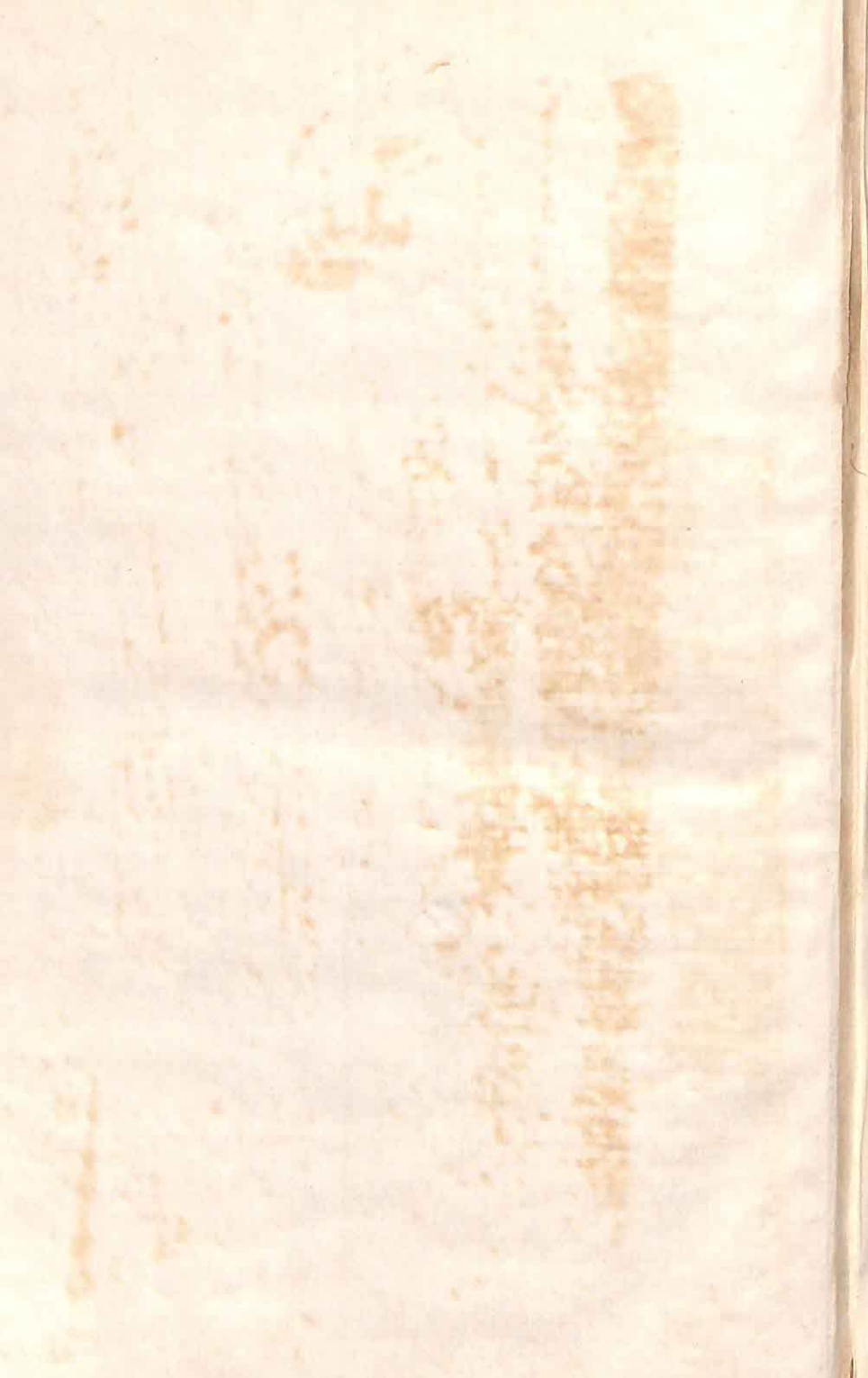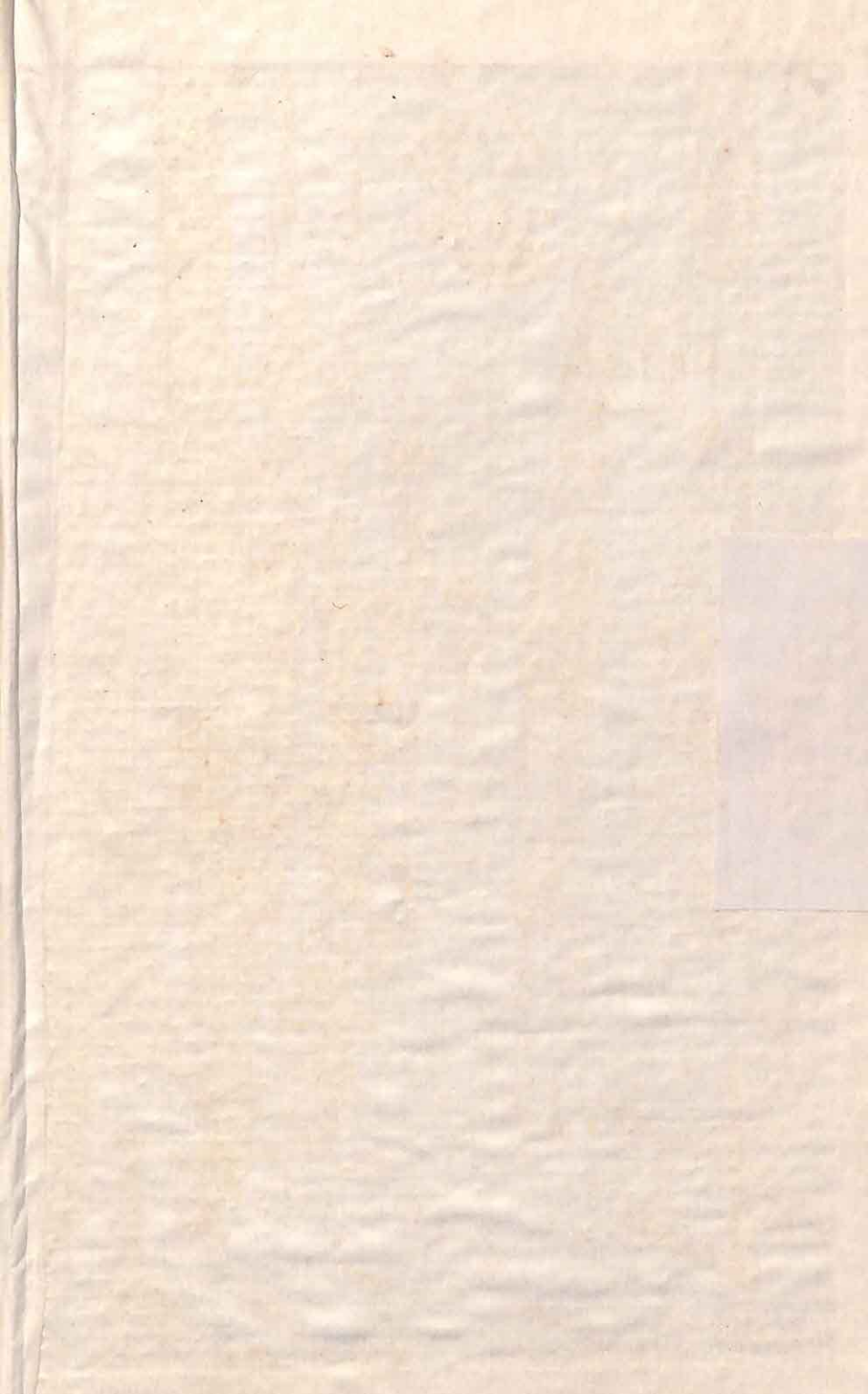
শিল্পীর আত্মোপলব্ধি ও শিল্পজিজ্ঞাসা – উভয় দিক থেকেই এ বই একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে গণ্য হবার যোগ্য। দীর্ঘদিনের শিল্পভাবনা আত্মস্মৃতি-মূলক কাহিনীর রূপ নিয়েছে কোথাও, আবার কোথাও তা তত্ত্ব ও ইতিহাসের উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্প ছাড়া যেহেতু শিল্পীর আর আলাদা জীবন নেই—তাই শৈশব থেকে পরিণত জীবন পর্যন্ত শিল্পী বিনোদবিহারীর অন্তরঙ্গ সৃজনীপ্রতিভার ধারাবাহিক পরিচয় তাঁরই লেখনীতে অনন্য এক মূর্তি পরিগ্রহ করেছে এই রচনাবলিতে। সেই সঙ্গে আছে তাঁর আঁকা সাম্প্রতিক কিছু স্কেচ। প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই 'চিত্রকর' একালের পাঠকসমাজের কাছে একটি ক্লাসিক হিসেবে গৃহীত হয়ে গেছে।